জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

পিতৃদেবের শ্রীচরণে

১৩৪৩

১

ঘড়ির ঘণ্টা সশব্দে বাজিয়া উঠিল। অরুণ বিছানাতে চোখ বুজিয়া নিদ্রাজাগরণের স্বপ্নাবেশময় আবছায়ায় অলস সুখে শুইয়াছিল; কি এক সুখস্বপ্ন-শেষে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। স্বপ্নটি কি তাহার ঠিক মনে পড়িতেছিল না, স্মৃতির পটে অতি হাল্কা রঙীন ছোপ, বালুকাতটে সমুদ্রতরঙ্গের ফেনিল লিপির মত ক্ষণিকের মধ্যে মিলাইয়া যায়—এক গানের মধুর সুর, অজানা পুষ্পদলের মৃদু গন্ধোচ্ছ্বাস, এক কিশোরীর স্নিগ্ধ মুখ, কখনও হাস্যে কখনও কৌতুকে ভরা। সুখস্বপ্ন-স্মৃতিকে সে জীবন্ত করিয়া তুলিতে চাহিতেছিল।

ঘড়ির এলার্ম-ধ্বনিতে অরুণ চমকিয়া উঠিল, স্বপ্নস্মৃতিজাল ছিন্ন হইয়া গেল। ঘড়ির দিকে কটাক্ষপাত করিয়া তরল অন্ধকারময় ঘরের দিকে চাহিল। ভোরের বাতাসে বড় খাটের পায়ের দিকে ডানপাশে পূর্ব্বের জানালা খুলিয়া গিয়াছে, পঙ্খের কাজ-করা পুরাতন বিবর্ণ দেওয়ালে ঊষার পাণ্ডুর আলো বড় করুণ দেখাইতেছে, সুবৃহৎ গৃহ আলোছায়াময়।

এলার্ম বাজিতে লাগিল। স্কুলের অনেক পড়া মুখস্থ করিতে হইবে। আজ আবার ইতিহাসের মাসিক পরীক্ষা, দিল্লীর বাদশাহগণের নাম, ভারতের গভর্ণর-জেনারেলগণের নাম ও শাসনকাল, নানা সন তারিখ

মুখস্থ করিতে হইবে; তার পর সংস্কৃতক্রিয়ার ধাতুরূপ, য়্যালজ্যাব্রার ফর্মূলা, কবি শেলির একটি কবিতা। যাক, এখনও পাঁচটা বাজে নাই, আরও পনের মিনিট সে বিছানাতে শুইয়া থাকিতে পারে। কাল রাত সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত জাগিয়া পড়িয়াছে, স্কুলের বই নয়, ডেভিড কপারফিল্ড নামে এক গল্পের বই তাহার কাকার লাইব্রেরী হইতে আনিয়াছিল। কাকা কিন্তু রাত বারোটার মধ্যেও ফেরেন নাই। বড় করুণ ডেভিডের জীবন, কিন্তু সে বড় বোকা, য়্যাগনেস যে তাহাকে ভালবাসে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না, ডোরাকে বিবাহ করিয়া সে কি সুখী হইবে? বোকারা জীবনে ত অসুখী হইবে। আচ্ছা, য়্যাগনেস কাহাকে বিবাহ করিবে? সে বড় ভাল মেয়ে। চার্লস ডিকেন্স লেখেন ভাল।

ঘড়ির শব্দ ধীরে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। পূবদিকের বাগান পাখীর গানে ভরিয়া উঠিল। অরুণের আর ঘুম আসিল না। চোখ মেলিয়া সে শুইয়া রহিল। নানা কারুকার্য্যময় বৃহৎ খাট, ঘরের এক-তৃতীয়াংশ জুড়িয়া তাহার মায়ের বিবাহের খাট, মেহগনী পালিশ প্রায় কালো হইয়া গিয়াছে।

খাটের মাথায় দক্ষিণ দেওয়ালে অরুণের মাতার বৃহৎ অয়েল-পেন্টিং; মায়ের মৃত্যুর পর তাহার পিতা এক ফরাসী চিত্রকর দিয়া ফটো হইতে এই ছবি আঁকাইয়াছিলেন। এ ঘরে পিতার বৃহৎ ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট রাখিবার আর স্থান নাই, আর তাহার ছোটবোন প্রতিমা তাহার ঘরে একটি ফটো রাখিতে চায়; স্বর্গগত জনকজননীর ছবি আসবাবপত্র জিনিষ দুই ভাইবোনে ভাগ করিয়া লইয়াছে!

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে অন্ধকারময় স্নিগ্ধ স্তব্ধতায় অরুণের ছেলেবেলার কথা ভাবিতে ইচ্ছা করে, স্বপ্নছবির পর স্বপ্নছবি।

সোনালী শস্যভরা অবারিত মাঠের মধ্য দিয়া নদীর রজতধারা আঁকিয়া-বাঁকিয়া সুনীল প্রান্তরে গিয়া মিশিয়াছে, তাহার তীরে তাহাদের বাংলো-বাড়ি ছবির মত; সেখানে বাবা ও মায়ের সঙ্গে সে ও টুলি কি সুখে আনন্দে দিন কাটাইয়াছে—নদীতে সাঁতারকাটা, বাগানে ফলপাড়া, বাবার সঙ্গে বজরাতে 'টুরে' যাওয়া, আমগাছে বাঁধা দোলনাতে দোলা, সেই বুড়ো বটগাছের তলায় চড়ুইভাতি, সন্ধ্যায় মায়ের গল্প বলা—তখন তাহারা ডেপুটি সাহেবের ছেলেমেয়ে, কত যত্ন, কত আদর।

মা কি সুন্দরী দেখিতেছিলেন, তেমনি সুন্দর রাঁধিতে পারিতেন। ফরাসী চিত্রকর অরুণের করমর্দ্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কি হে, ঠিক হয়েছে তোমার মা'র ছবি? সে উত্তর দিয়াছিল, আমার মা এর চেয়ে অনেক সুন্দরী ছিলেন, সে তুমি আঁকতে পারবে না। সে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য অয়েল-পেন্টিঙে কেমন করিয়া আসিবে! এ-দৃষ্টিতে সে স্নেহ-মমতা কই?

দরজায় করাঘাত হইল। অরু, উঠেছিস—ওঠ, অরু—উঠেছিস অরু? ঠাকুমার গলা। ঠাকুমাকে সে বলিয়াছিল, ভোরে জাগাইয়া দিতে। দরজা ধাক্কা দিয়া খুলিয়া জল-ছড়া দিয়া ঠাকুমা চলিয়া গেলেন। অরুণকে এবার উঠিতেই হইল।

সিঁড়ির উত্তরে প্রতিমার ও দক্ষিণে অরুণের ঘর, মধ্যে ঘোরান-সিঁড়ি পূজার দালানের পাশ দিয়া দুই মহল বিভাগ করিয়া ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। দুই মহলওয়ালা বৃহৎ বাড়ি প্ল্যান করিয়া তৈরি নয়, গত নব্বই বৎসর ধরিয়া ঘোষ-বংশের নানা কর্ত্তার খুশীমত গড়িয়া উঠিয়াছে—ছোট-বড় ঘর, নানা বারান্দা, আঁকাবাঁকা অন্ধকার করিডর, অন্ধ কুঠরী, বাড়িটি বিচিত্র গোলকধাঁধা।

হাত-মুখ ধুইয়া অরুণ সিঁড়ির ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতিমার ঘরের দরজা বন্ধ, কোন সাড়াশব্দ নাই। প্রতিমা ভোরে উঠিয়া গান গায়, গলা সাধে। আজ কোন অসুখ করিল কি? কাল রাতে সে ভাল করিয়া খায় নাই। মাঝে মাঝে প্রতিমার জন্য তাহার বড় ভাবনা হয়, বড় রোগা সে।

তেতলার ছাদে সিঁড়ির পাশে এক ছোট ঘর ভাঙ্গা চেয়ার ঝাড়লণ্ঠন ছেঁড়াসতরঞ্চি কার্পেট ইত্যাদি সভা সাজাইবার নানা বহুব্যবহৃত দ্রব্যে পূর্ণ ছিল, সেই ঘর সাফ করিয়া অরুণ তাহার পড়িবার ঘর করিয়াছে। এ-বৎসর তাহার ম্যাটি ক পরীক্ষা।

অরুণ পড়ার ঘরে গেল না, এক তলায় নামিল; বড় লাইব্রেরী-ঘরের পাশ দিয়া পূর্ব্বদিকের বাগানে বাহির হইয়া গেল। ক্লাসের পড়া ভাল করিয়া হয় নাই, তবু পড়িতে বসিতে তাহার মন লাগিতেছিল না। আপন মনের চঞ্চলতা বিষণ্ণতা তাহার নিজের কাছে অদ্ভুত লাগে। কোন দিন সে নিবিষ্ট মনে সমস্ত সকাল পড়ে, কোন সকাল পড়ায় মন বসে না, বাগানে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতে, পুকুরের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বা প্রতিমার সহিত খুনসুটি করিতে বড় ভাল লাগে।

কলিকাতায় কোন বাড়িতে এত বড় বাগান ও পুকুর নাই বলিলেই হয়। বাগানের প্রতি বৃক্ষ রোপণের ইতিহাস অরুণ তাহার ঠাকুমার নিকট শুনিয়াছে। তাহার প্রপিতামহী যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এখন তাহার অর্দ্ধেক বুজান হইয়া গিয়াছে। তাহার কোন পূর্ব্বপুরুষ মালদহ হইতে কোন আমগাছের কলম আনিয়া পুঁতিয়াছিলেন, হট্‌হাউস তৈরী করিয়া নানা জাতীয় ফার্ণ, ইংরেজী ফুলের গাছ করিয়াছিলেন, সে-সব গল্প তাহার জানা। এখন সে-হট্‌হাউস ভাঙিয়া

গিয়াছে, পরীওয়ালা ফোয়ারাগুলির জলধারা নিঃশেষিত, ইতালীয় মার্ব্বেলের অর্দ্ধভগ্ন নগ্না নারীমূর্ত্তিগুলি জঙ্গলে লজ্জায় লুকাইয়া।

ফাল্গুনের প্রভাত স্নিগ্ধসুন্দর, তালপুকুরের স্থির জলে নবীন রৌদ্রালোক কচি শিশুর হাসির মত; নারিকেল গাছগুলির শ্যামমসৃণ পাতা ঝিকমিক করিতেছে; এক মর্ম্মরের পরী-শিশুর ভগ্ন হস্তে মাকড়সার জাল বোনা, তাহার উপর শিশিরবিন্দু মুক্তার মত; নব বসন্তের তৃণপুষ্পশোভিত পৃথিবীর অপূর্ব্ব গন্ধোচ্ছ্বাস বর্ণোৎসব অরুণকে যেন অভিভূত করিল। তাহার অন্তর কি অজানা বিষাদে এ-প্রভাতে আরও উদাস হইয়া গেল।

অরুণ যখন তেতালায় পড়িবার ঘরে আসিল, প্রভাত আতপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে প্রখর সূর্য্যালোক। টেবিলের উপর চাকর যদু গরম দুধের বাটি, রুটি ও মোহনভোগ রাখিয়া দিয়াছে। দুধ ও একখানি বাসি রুটি খাইয়া অরুণ আওরঙ্গজেবের পর দিল্লীর বাদশাহগণের নাম মুখস্থ করিতে বসিল।

স্কুলের বই-খাতা লইয়া প্রতিমা তাহার ঘরে আসিল।

—দাদা, অ-দাদা, আমার অঙ্কগুলো করে দাও, তা না হ'লে সুধাদি আমায় আজ খেয়ে ফেলবেন।

—সুধাদির তুই প্রিয়া ছাত্রী, সুধাদি তোমায় খেয়ে ফেলবেন!

—সত্যি।

—হ্যাঁরে টুলি, আজ তোর গলা শুনলুম না?

—বা, গলা কি রকম ধরেছে দেখছ না!

—সর্দ্দি করেছে ত, রাতে কেশেছিলে—শোন্, আমার ঘরে পাথরের টেবিলে সেই পুরনো ফ্রেঞ্চ ঘড়িটার পাশে এক লাল রঙের শিশি আছে,- চল্, আমিই যাই।

—বাবা, তোমার ডাক্তারি আর করতে হবে না, আমি ওষুধ খেয়েছি।

অরুণ স্নেহসিক্ত নয়নে প্রতিমার মুখের দিকে চাহিল। কেন- তাহাকে সে এত ভালবাসে, তাহার জন্য মনে বড় ভয় হয়,- বড় রোগা সে।

—আচ্ছা, দাদা, বল ত, থার্ড ক্লাসে কখনও এত শক্ত অঙ্ক দেয়, সুধাদি কেবল হেড-মিষ্ট্রেসের কাছে নাম কিনতে চান।

—বেশী জ্যাঠামি করিস না, অঙ্ক পার না, সুধাদির দোষ, ওষুধ খেয়েছিস আজ সকালে?

—খেয়েছি গো, অঙ্কগুলো কষে দাও।

অঙ্ক কষিতে কষিতে অরুণ বলিতে লাগিল—টুলি, অজয়ের বোনেরা তোর স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছে?

—হ্যাঁ, হয়েছেই ত!

উচ্চস্বরে প্রতিমা হাসিয়া উঠিল। হাসিলে তাহার গালে সুন্দর টোল্ পড়ে।

—উমা কি তোর সঙ্গে পড়ে?

—বা! উমাদি আমার সঙ্গে পড়ে! উমাদি ত সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, আমার সঙ্গে খুব ভাব, জান—সুন্দর গান গায়।

—তোর চেয়ে ভাল?

—অত জানি না বাপু।

—আর শীলা?

—শীলার বোধ হয় ফিফ্‌থ্‌ ক্লাস।

—হুঁ, দেখ দেখি, রেজাল্ট মিলল কিনা!

—মিলেছে। আর এইটা। জান দাদা, একটা ভাল গান শিখেছি, তোমার রবিবাবুর নতুন টাটকা গান, সুরটা কিন্তু আমার তেমন ভাল লাগল না, তবে কথা চমৎকার, তোমার খুব ভাল লাগবে।

—রোস, অঙ্কটা শেষ করি।

—আজ আমি গাইতে পারব না কিন্তু, যা গলাব্যথা।

—ব্যথা! তা ত বলিস্ নি এতক্ষণ, আজ আর স্কুলে যায় না, আমি ঠাকুমাকে ব'লে দিচ্ছি।

—না, না, আজ স্কুলে যেতে হবে, আজ বড় মজা আছে, শোন, দাদা, আস্তে গাই।

প্রতিমা ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল—

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে

মোরে আরও আরও—আরও দাও প্রাণ

অর্দ্ধেক গাহিয়া সে থামিয়া গেল। আর তাহার কথা মনে পড়িতেছে না।

—অদ্ভুত তোমার স্মরণশক্তি।

—আচ্ছা দাদা আজ উমাদির কাছ থেকে লিখে নিয়ে আসব। থাক, ওই দুটো অঙ্কতেই হবে। মেনি থ্যাঙ্কস্, তোমার পড়ার অনেক ক্ষতি হ'ল।

প্রতিমা চলিয়া গেল। অরুণের আর পড়া বিশেষ কিছুই হইল না। গানের সুর তাহাকে উন্মনা করিয়া দিল। উমা নিশ্চয়ই এ গান খুব চমৎকার গায়।

২

অরুণ যখন স্কুলের গলির মোড়ে, স্কুলের ঘণ্টা বাজিতেছে।

প্রথম ঘণ্টা, ইংরেজী, 'নাকুর' ক্লাস। 'নাকু' একটু দেরি করিয়াই আসেন, আর দেরি হইলেও অরুণকে তিনি কিছুই বলিবেন না।

বস্তুতঃ, এই নম্র স্বল্পভাষী সুদর্শন ছাত্রটিকে সকল মাষ্টারই ভালবাসেন; বোধ হয় তাহার বংশের আভিজাতিক গৌরবের জন্য একটু সম্মানও করেন। সহপাঠীদিগের মধ্যেও অরুণ প্রিয়। বন্ধু তাহার খুব বেশী নাই, সে বড় লাজুক; কিন্তু যে-কয়জন বন্ধু আছে তাহারা তাহাকে সত্যি ভালবাসে, আপন সুখ-দুঃখের কথা বলে। কাহারও সহিত ঝগড়া মারামারি করিতে তাহার কেমন লজ্জা হয়, অন্য ছাত্ররাও তাহার সহিত অভদ্রাচরণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে।

স্কুলের গেটে পৌছিতেই জয়ন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার সঙ্গ লইল।

অরুণ বলিল—ঘণ্টা বেজে গেছে!

জয়ন্ত গানের সুরে বলিয়া উঠিল—আমার ভাগ্যে ত বকুনি আছে।

তারপর অরুণের হাত ধরিয়া বলিল—চল অরু, শেষ বেঞ্চিতে আমার পাশে বসবে, তোমার সঙ্গে ভয়ঙ্কর দরকার।

—কি নতুন কবিতা লেখা হ'ল?

—না, কবিতা নয়, সে ভীষণ ব্যাপার।

জয়ন্ত চৌধুরীকে ক্লাসে সবাই 'কবি' বলিয়া ডাকে। সে লম্বা চুল রাখিয়া কোঁকড়ায়, ঢিলে পাঞ্জাবী পরিয়া গায়ের চাদর লুটাইয়া চলে, পায়ে

জরির নাগরা। লম্বা, শ্যামবর্ণ, চোখে উদাস স্বপ্নভরা দৃষ্টি রচনা করিবার প্রয়াস, মন বড় কোমল, বেদনাপ্রবণ।

অরুণ ক্লাসে ঢুকিয়া দেখিল, মাষ্টার মহাশয় আসেন নাই। ভূদো বৃন্দাবনকে লইয়া খুব হৈ রৈ চলিতেছে। বৃন্দাবন গুপ্ত ছেলেটি যেমন মোটা তেমনই কালো, লম্বা হইলেও বেঁটে দেখায়, পায়ে কালো বুট, খাকি হাফপ্যাণ্ট ও সবুজ রঙের বুক-কাটা কোট পরিয়া সে স্কুলে আসে, 'বাস্কেট বল' খেলার বলের মত দেখায়, ছোটবেলা হইতে কলিকাতায় থাকিলেও রাগাইয়া দিলে তাহার পৈতৃক গ্রামের ভাষা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে হাফপ্যাণ্ট পরার রেওয়াজ তখনও হয় নাই। নাম, চেহারা, বেশ ও ভাষা, ব্যঙ্গ করিবার এতগুলি বিষয়। ছেলেরা ছাড়িবে কেন? অরুণ দেখিল, ক্লাসের মধ্যে বৃন্দাবন পৈতৃক গ্রাম্য ভাষায় তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে আর কেহ সুর করিয়া বলিতেছে, আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব। কেহ বলিতেছে, ওহে হাফপ্যাণ্ট-পরা ধেনু, মোদের ক্লাসে চরতে এল কেনু?

সুহাস সেন ক্লাসের আর্টিষ্ট। পিছনের বেঞ্চে বসিয়া সে মাষ্টার ও ছাত্রদের নানা ব্যঙ্গচিত্র আঁকে। তাহারই আঁকা বৃন্দাবনের একটি সরস চিত্র হাতে হাতে ঘুরিতেছে।

চালিয়াৎ চট্টো জুতা মসমস করিতে করিতে প্রবেশ করিল। ছেলেটির নাম অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, লম্বা, ফর্সা, নিখুঁত ভাঁজ-করা সুট পরিয়া হাতে বইখাতা-ভরা চামড়ার ব্যাগ লইয়া আসে, কোটের বুক-পকেটে রঙীন রুমালে এসেন্সের গন্ধ, নাকী চশমার কালো চওড়া ফিতা কানের পিছনে দোলে। তাহার বাবা ইংরেজী সওদাগর আপিসের বড়বাবু না সেজবাবু, ইহা লইয়া ছেলেদের মধ্যে তর্ক হয়। চালিয়াৎ চট্টো ইংরেজীতে কথা বলে। সে ক্লাসে প্রবেশ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, হোয়াট ইজদি ম্যাটার?

ছেলের দল হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল, চালিয়াৎ চট্টো বড় কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে, বস্তু কি? কোথায় হে বাণেশ্বর তর্কচঞ্চু—

অরবিন্দ আসাতে বৃন্দাবন একটু রেহাই পাইল। সে গজগজ করিয়া দ্বিজেনের পাশে বসিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র ক্লাসের 'ভাল' ছেলে', প্রায় সব বিষয়ে প্রথম হয়।

অরুণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বন্ধু অজয় আসিয়াছে কিনা। অজয় তাহার সীটে বসিয়া কি লিখিতেছে, নিশ্চয় কোন স্কুলকে ম্যাচ চ্যালেঞ্জ করিয়া চিঠি। অরুণ নিশ্চিন্ত হইল। যতীনকে ডাকিয়া তাহারা পাশাপাশি বসিল।

যতীনকে তাহার বড় ভাল লাগে। খুব গরীবের ছেলে হইবে, ফ্রী পড়ে। পায়ে কাদাভরা চটি, ময়লা কাপড় ও ছেঁড়া শার্ট-পরা শীর্ণ দেহ, কিন্তু মুখখানি বুদ্ধিতে ভরা, টানা কালো চোখ দুটিতে তীক্ষ্ণধী। সেও অরুণের মত স্বল্পভাষী, শান্ত; কাহারও সহিত মিশিতে চায় না। সে যে দরিদ্র এই হীনতাবোধ তাহার চিত্তকে সর্ব্বদা বেদনা-প্রবণ করিয়াছে।

যতীনের সহিত অরুণের বেশভূষায় অত্যন্ত পার্থক্য। অরুণ ময়লা কাপড় পরিতে পারে না, ময়লা জামা গায়ে দিলে তাহার গা ঘিন-ঘিন করে, সহজ সৌন্দর্য্য ও শুচিতার বোধ তাহার জন্মগত। কিন্তু চেহারায় ও মানস প্রকৃতিতে যতীনের সহিত তাহার যোগ রহিয়াছে। তাহার দেহ যতীনের মতই কৃশ, ভঙ্গুরতার ভাবময়; পাণ্ডুর মুখশ্রী কখনও বেদনায় করুণ, কখনও বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। যতীন অরুণের সহিতও বেশী কথা কয় না, কিন্তু কয়েকটি কথাতেই তাহাদের চিত্তের কোন গভীর গোপন যোগ স্থাপিত হইয়া যায়।

ইংরেজী মাষ্টার-মহাশয়ের চোগাচাপকান-পরা দীর্ঘ মূর্ত্তি বারান্দায় দেখা যাইতেই ক্লাস নিস্তব্ধ হইয়া গেল। লম্বা রোগা কালো চেহারা,

লম্বা মুখের উপর খাঁড়ার মত নাক, অজীর্ণতাশীর্ণ জলজলে চোখ; অতি গম্ভীর প্রকৃতির লোক; কেহ কখনও তাঁহাকে ক্লাসে হাসিতে দেখে নাই। বেশের রুক্ষতায়, দেহের দৈর্ঘ্যে, শীর্ণচক্ষুর সুতীব্র দীপ্তিতে সর্ব্বক্ষণ ভয়াবহ শুব্ধতা সৃষ্টি করিয়া তিনি কিশোর-মনে ভয়ের শাসন স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ছেলেরা পিছনে তাঁহাকে নাকু বলে, কিন্তু তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করে। আতঙ্কিত কিশোর-চিত্তের কল্পনায় তিনি রুদ্রদেবতার রূপ।

চেয়ারে বসিয়া নাকু ক্লাসের দিকে চাহিলেন। সবাই ভীত মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পুত্তলিকার মত তাঁহার দিকে চাহিল। তাঁহার দীর্ঘ শীর্ণ তর্জ্জনী যাহার প্রতি নিক্ষেপ করিবেন, তাহাকে সোজা দাঁড়াইয়া আজিকার ইংরেজী-পাঠ রীডিং পড়িতে হইবে। তিনি কোন কথা বলিবেন না, শুধু তর্জ্জনীর ইঙ্গিত।

নাকুর তর্জ্জনী অরবিন্দের প্রতি পড়িল। চালিয়াৎ চট্টোকে পড়িতে হইবে, ক্লাসের সবাই খুশী।

ড্রিল-সার্জ্জেণ্ট যেরূপ গম্ভীর তীক্ষ্নস্বরে হুকুম দিয়া শিক্ষানবীশ সৈনিকদের কুচকাওয়াজ শেখায়, সেইরূপ অর্ডারের মত নাকুর এক-একটি ইংরেজী কথা বাহির হয়, ছেলেদের বুক দুরদুর করে—সোজা, সোজা দাঁড়াও, সোজা বই।

অরবিন্দ কম্পিত হস্তে চশমার ফিতা ঠিক করিয়া লম্বা টানা সুরে পড়িতে লাগিল; ক্লাসের সকলে চুপ। যখন এক প্যারাগ্রাফ পড়া শেষ হইল, অরবিন্দ নূতন প্যারাগ্রাফ পড়িতে যাইবে, অর্ডার আসিল,—থাম। একি গান? গানের সুর! প্রোজ, প্রোজ!

অরুণ অজ্ঞাতভাবে হাসিয়া উঠিল। রুক্ষ শীর্ণ তর্জ্জনী অরুণের বেঞ্চের দিকে পড়িল। অরুণের বুক কাঁপিয়া উঠিল, রীডিং সে বেশ

পড়িতে পারিবে, কিন্তু শক্ত কথার অর্থগুলি দেখিয়া আসে নাই। সহসা তাহার পাশ হইতে যতীন দাঁড়াইয়া উঠিল। বাঁচা গেল। যতীন বেশ ইংরেজী পড়ে।

অরবিন্দ বসিতে যাইতেছিল, অর্ডার হইল, দাঁড়িয়ে শোন। তর্জ্জনী বেঞ্চির পর বেঞ্চি ঘুরিতে লাগিল। ক্লাস যখন শেষ হইল, সকলে ঘামিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় ঘণ্টা সংস্কৃত, হেড্ পণ্ডিতের ক্লাস। সকলে পঞ্চতন্ত্র খুলিল।

যজ্ঞেশ্বর তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত, ভাটপাড়ার এক প্রাচীন পণ্ডিত বংশের। এ-যুগে টোল করিয়া চলে না, স্কুল-মাষ্টারি লইতে হইয়াছে। তাঁহার প্রতি সমাজের অবিচারের জন্য তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই কুপিত; চারিদিকে আধুনিক অনাচার-ম্লেচ্ছাচারের জন্য তিনি অত্যন্ত বিরক্ত। তাঁহার প্রগাঢ় সংস্কৃত বিদ্যাতেও আর্থিক উন্নতি খুব বেশী হইল না, সুতরাং ছাত্ররা মন দিয়া সংস্কৃত না-পড়িলে তিনি ক্ষুণ্ণ হন না। তবে পাস করিবার মত পড়িলেই হইল।

পায়ে তালতলার চটি, মোটা থান কাপড় পরা, গায়ে গলাবন্ধ জামার উপর চাদর, মাথায় শিখা, চোখে ষ্টিল্-ফ্রেমের চশমা। পণ্ডিত-মহাশয়কে ছাত্ররা পছন্দ করে।

পণ্ডিত-মহাশয় ক্লাসে প্রবেশ করিলে, ছাত্ররা দেখে, পণ্ডিতমহাশয়ের শিখা উর্দ্ধে বাঁধা না অধোতে। আর পণ্ডিত-মহাশয় দেখেন তাঁহার পুত্র বাণেশ্বর ক্লাসে আসিয়াছে কি না। পণ্ডিত-মহাশয়ের শিখা যদি উর্দ্ধেতে থাকে তাহা হইলে তাঁহার মেজাজ ভাল নাই, আর যদি নিম্নে থাকে, তাহা হইলে, হয়ত অর্দ্ধঘণ্টা ছুটিও দিতে পারেন।

ছাত্ররা দেখিল, শিখা উঁচু করিয়া বাঁধা; সকলে প্রমাদ গণিল। বাণেশ্বরের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। পিতা প্রথমেই তাহাকে পাঠ

জিজ্ঞাসা করিবেন। সেজন্য সে ভীত নয়, কিন্তু তাহাকে যখন তিনি বাড়ীর ডাকনাম ধরিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকেন, তাহার ভয়ঙ্কর রাগ হয়। নামটিও মধুর নয়—হাঁদা!

পণ্ডিত-মহাশয় পুত্রকে রেহাই দিলেন। অরবিন্দকে ডাকিলেন ওহে সাহেব!

পণ্ডিত-মহাশয় নিজ পুত্রকে যেমন ডাকনামে ডাকেন, তেমনই ক্লাসের আর সকলকেও একটা নাম তৈরী করিয়া ডাকেন।

সাহেব সমাসটি ঠিক বলিল। তার পর 'মাকা-লফলে'র আহ্বান হইল। কাশীপ্রসাদ মল্লিকের নাম মাকাল-ফল। পাড়ার মল্লিকদের বাড়ীর ছেলে। মোটা, গোলগাল মুখ, ফুটফুটে দেখিতে; সব সময়ে হাসিখুশী ভাব; পায়ে পাম্পস্থ, কোঁচান দেশী ধুতি ও রঙীন সিল্কের পাঞ্জাবী পরিয়া আসে। মাকাল-ফল বড় মুস্কিলে পড়িল, সব সময় সুপারি চিবাইয়া সে একটু তোতলা হইয়া গিয়াছে, দীর্ঘ সমাসযুক্ত সংস্কৃত ভাষা তাহার জিহ্বার উচ্চারণের জন্য নয়। সে দাঁড়াইলে পণ্ডিত-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—পড়া তৈরি হয়েছে?

কাশীপ্রসাদ অম্লানবদনে উত্তর দিল—স্যর, ভাল হয় নি।

পণ্ডিত-মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, আচ্ছা বোস্, কেন স্কুলে আসিস? বাবার আফিসে বেরুতে আরম্ভ কর্। বিন্দে!

বৃন্দাবন বুটের শব্দ করিয়া দাঁড়াইয়া গড়গড় পড়িতে আরম্ভ করিল।

পণ্ডিত মহাশয় আবার মাথা নাড়িয়া বলিলেন—আস্তে আস্তে, দেবভাষা ম্লেচ্ছের মত পড়িস্ না।

এ-ঘণ্টাতেও অরুণকে কিছু পড়িতে হইল না।

তৃতীয় ঘণ্টা অঙ্কের। অঙ্কের মাষ্টার গোপালবাবু ক্ষীণজীবী, অতি ভালমানুষ। তিনি ক্লাসে ঢুকিয়াই বোর্ডে দুইটি অঙ্ক লেখেন, ছেলেদের

নিজ নিজ খাতায় অঙ্ক দুইটি কষিতে বলিয়া নিজে একটি বই বা খাতা লইয়া চেয়ারে বসেন। অনেকে অঙ্ক কষে, অনেকে অঙ্কগুলি খাতায় টুকিয়া বসিয়া গল্প করে। তবে কেহ গোলমাল করে না। মাষ্টার-মহাশয়ের সঙ্গে ছেলেদের যেন বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি ছাত্রদের জ্বালাইবেন না, ছাত্ররাও যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে। তাঁহার চাকরি যেন বজায় থাকে। উৎসাহী ভাল ছেলেরা অঙ্ক কষিয়া তাঁহার কাছে লইয়া যায়। আর ক্লাসে মাকাল-ফলের স্থপারির কৌটা, স্থহাস সেনের নাকু বা পণ্ডিত-মহাশয়ের সরস রেখাচিত্র বেঞ্চি হইতে বেঞ্চে চালিত হয়।

কিছুক্ষণ পরে গোপালবাবু নিজে উঠিয়া বোর্ডে অঙ্ক কষেন ও ছেলেদের খাতায় টুকিতে বলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি। বলেন—বাপু, পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ ক'রো না। অধিকাংশ ছেলেই টুকিয়া লয়। অঙ্ককষা শেষ হইলে অনেক সময় তিনি ঘণ্টা বাজিবার আগেই চলিয়া যান। ছেলেরা কোন গোলমাল করে না, তবে ভূদো বিন্দেকে চিমটি-কাটা চলে।

টিফিনের সময় অরুণ অজয়কে খুঁজিতে বাহির হইল।

অজয়ের সহিত তাহার গভীর বন্ধুত্ব। ছয় মাস হইল অজয় স্কুলে আসিয়াছে। ইহার মধ্যে তাহাদের কিরূপে এরূপ ভাব হইল, ভাবিলে অরুণ অনেক সময় আশ্চর্য্য হয়।

অজয় অরুণের চেয়েও লম্বা, তরুণ শালবৃক্ষের মত স্থঠাম দৃঢ় দেহ বীর্য্যব্যঞ্জক সজীব স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি। মুখ তারুণ্যমণ্ডিত বটে, কিন্তু অরুণের মুখশ্রীর পাণ্ডুর ভাবপ্রবণতা, স্বপ্নময় উদাসতা নাই। তাহার দেহের মত তাহার মনও সরল, ঋজু। সে হৈ চৈ করিয়া কথা বলে, সারাক্ষণ চেঁচায়, হাসে, কিশোর প্রাণের উচ্ছ্বাসে ভরা। 'ফ্যাটি' বিন্দের

পেটে ঘুসি মারিতে, চালিয়াৎ চট্টোর চশমার ফিতা টানিয়া দিতে, ছেলেদের সহিত ঘুসোঘুসি করিতে, অত্যাচারিত দুর্ব্বল ছেলের জন্য লড়িতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ক্লাসের মধ্যে সে সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়, স্কুলের ফুটবল ক্লাবের ক্যাপ্টেন। স্কুলে বিদ্যাচর্চ্চা অপেক্ষা খেলার মাঠে দেহচর্চ্চা করিতে বেশী ভালবাসে। তবে পড়াশুনাতেও অমনোযোগী নয়। এক শতের মধ্যে পঞ্চান্ন পাইবার মত পড়া পড়ে? তার বেশী পড়া, তার মতে পণ্ডশ্রম। সে কল্পনাপ্রিয় নয়, বলে, আমি রিয়ালিষ্ট। জয়ন্তের কবিতাকে সে বলে প্যানপ্যানানি, বাণেশ্বরের তর্ককে বলে জ্যাঠামি, তবে সুহাসের ব্যঙ্গচিত্রগুলিকে প্রশংসা করে।

অজয়কে নিভৃতে ডাকিয়া অরুণ বলিল—মামাবাবু কেমন আছেন

অজয় একটু গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল—বাবা, বাবা সেই রকমেই আছেন। কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি। তাছাড়া অন্য কোন নতুন উপসর্গ নেই। শোন, মা ব'লে দিয়েছেন, আজ বিকেলে তুমি যেও নিশ্চয়। দু-দিন যাও নি কেন, স্কুল থেকেই যেও, ওখানে চা খাবে।

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল—তুমি থাকবে ত?

অজয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আমার ফিরতে রাত হবে, আজ স্কুলের ম্যাচ, আমি ক্যাপ্টেন, আচ্ছা, এখুনি টীম তৈরী করতে হবে। যেও, না হলে মা ভাববেন।

মামীমা তাহাকে সত্যই অত্যন্ত স্নেহ করেন। কয়েক মাসের পরিচয়, কত আপন করিয়া লইয়াছেন, যেন জন্মজন্মান্তরের জানা।

অজয় চলিয়া গেল। জয়ন্ত আসিয়া তাহার হাত ধরিল, চোখ ছলছল করিতেছে। জয়ন্ত সামান্য আবেগেই কাঁদিয়া ফেলে।

অরুণ ধীরে বলিল—কি হয়েছে ভাই?

ভগ্নস্বরে জয়ন্ত বলিল—চল ক্লাসে, বলছি।

ক্লাস প্রায় শূন্য। দুই জনে এক কোণে বসিল।

জয়ন্ত কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—বাবা চলে গেছেন।

বিবর্ণ বিস্মিত মুখে অরুণ বলিল—তোমার বাবা, কি হ'ল হঠাৎ?

—তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন।

—ও, তাই বল' আমি ভাবছিলুম—

—কিন্তু আমাদের অবস্থাটা কি হ'ল!

—তোমার ত মা নেই।

—না, কিন্তু ছোট ভাই এক আছে।

—তোমাদের এক দোকান আছে না?

—হাঁ, ঘড়ির দোকান, রাধাবাজারে। বাবার মত অমন ঘড়ি নাকি কেউ সারাতে পারত না, ঘড়ি সেরে সেরে তাঁর চোখ খারাপ হয়ে গেছল। তিনি আর বড় মেশোমশাই দু-জনে দোকান করেছিলেন, দোকান ত মেশোমশাইকে দিয়ে গেছেন।

—তোমরা ত একসঙ্গে থাকো।

—হ্যাঁ, বড় মাসীর সঙ্গে, বাবাই বেশীর ভাগ খরচ দিতেন। আমার জন্যে ভাবি না, কিন্তু মণ্টুর কি হবে, ছোট ছেলে সে—বাবা একটু ভাবলেন না।

—মাসী দেখবেন।

—হ্যাঁ মাসীর চার ছেলে চার মেয়ে—মাসী দেখবেন! শোন, তোমার ব্যারিষ্টার- কাকার সঙ্গে আমি পরামর্শ করতে চাই। দোকানে আমাদের অংশ কি, মণ্টু ত নাবালক, সব ঠিক করে নিতে হবে।

—আচ্ছা, আমি বলব।

—শীগ্‌গির একটা ব্যবস্থা করা চাই। মেশো কোন্ দিন বলবেন, চরে খাও গে।

—আচ্ছা, আমি নিশ্চয় বলব।

—বাবা বেশ, সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন।

টিফিনের শেষে দুই ঘণ্টা ইতিহাসের মাসিক পরীক্ষা হইল। প্রশ্নগুলি সহজই ছিল। কলিকাতা-স্থাপনের ইতিহাস, শেষ পানিপথ যুদ্ধ, মারাঠা শক্তি পতনের কারণ, ইত্যাদি। অরুণ উত্তরগুলির সঙ্গে নিজের নানা মন্তব্য জুড়িয়া দিল। ইতিহাসের শিক্ষক জগদীশবাবুর সে প্রিয় ছাত্র। সে নির্ভয়ে প্রশ্নের উত্তর লেখে। জগদীশবাবু নিজেও ছাত্র, এম-এ পাশ করিয়া ল' পড়িতেছেন। সেজন্য বোধ হয় কিশোর-মনের উচ্ছ্বাস স্নেহের চোখে দেখেন।

অরুণ লিখিল, শেষ পানিপথ-যুদ্ধে যদি আ'মদ শা দুরানীর পরাজয় হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস কি হইত কে জানে। হয়ত কি হইতে পারিত, এ প্রশ্নের সে নানা কাল্পনিক উত্তর লিখিল। আর এক প্রশ্নোত্তরে সে লিখিল, জব চার্ণক যদি কলিকাতায় কুঠিস্থাপন না-করিতেন তাহা হইলে পলাশীর যুদ্ধ হইত কি? ইতিহাস পড়িতে পড়িতে তাহার মনে এইরূপ নানা প্রশ্ন জাগে।

স্কুলের শেষে অরুণ অজয়কে খুঁজিয়া পাইল না। স্কুলের বই লইয়া একা অজয়দের বাড়ি যাইতে তাহার লজ্জা বোধ হইল। বইগুলি বাড়ীতে রাখিয়া ঠাকুমাকে বলিয়া যাইবে, ঠিক করিল। হয়ত, মামীমা রাতে খাইয়া যাইতে বলিবেন।

একা পথ দিয়া বাড়ি ফিরিতে প্রতিমার সকালে গাওয়া গানের সুর তাহার কানে বাজিতে লাগিল। গানের কথাগুলি প্রতিমাকে দিয়া লিখাইয়া লইতে হইবে।

৩

অরুণ যখন অজয়দের বাড়ীতে আসিয়া পৌছাইল, কলিকাতার সৌধাবলীর উপর অপরাহ্ণের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে।

ছাদ হইতে অরুণকে দেখিতে পাইয়া চন্দ্রা সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া আসিল, অরুণের হাত ধরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—বেশ, কাল আস নি কেন? কাল বড়দির জন্মদিন গেল।

অরুণ বিস্মিত হইয়া বলিল—আমি কি জানতুম?

হাত নাড়িয়া চুল দোলাইয়া চন্দ্রা বলিল—তোমার কিছু মনে থাকে না। আমার লাট্টু এনেছ?

—ওই, আনতে ভুলে গেছি।

—বড় ভোলা মন বাপু তোমার।

—লাট্টু ত ছেলেরা খেলে, আচ্ছা খুকু তোর জন্যে বড় পুতুল এনে দেব, কেমন?

—না আমার পুতুল চাই না, আমার লাট্টু চাই, বা, ছেলেরা স্কিপ্-করে কেন?

চন্দ্রা অজয়ের ছোট বোন। আট বৎসর বয়স হইবে। খয়ের রঙের ফ্রকের ওপর ফুল-কাটা সাদা এ্যপ্রন; কচি আমপাতার মত শ্যামশ্রী; মুখখানি মঙ্গোলীয়, চাঁদের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে, স্কুলের মেয়েরা তাহাকে চাঁদামাছ বলিয়া ডাকে। তাহার দুই চোখে দুষ্টামি দেহে মনে চঞ্চল কৌতুক, গিরিঝর্ণার মত ছুটিয়া সিঁড়ি নামে, কলহাস্যে উচ্চস্বরে কথা বলে, নৃত্যের ভঙ্গীতে চলে।

চন্দ্রার সহিত দ্রুতপদে সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে অরুণ বলিল—মামীমা কোথায় ?

দুষ্টামিভরা চোখ নাচাইয়া চন্দ্রা উত্তর দিল—মা তোমার সঙ্গে আজ দেখাই করবেন না, খুঁজেই পাবে না মাকে।

—তুই বুঝি লুকিয়ে রেখেছিস, আচ্ছা, কোন্ রঙের লাট্টু তোর পছন্দ ? অরুণ পকেট হইতে তিনটি লাট্টু বাহির করিল।

চন্দ্রা লাফাইয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল—ও, কি দুষ্টু তুমি! থ্যাঙ্কস্ থ্যাঙ্কস্, আমি তিনটিই নিচ্ছি।

বিদ্যুদ্বেগে চন্দ্রা অন্তর্হিত হইল। অরুণ রান্নাঘরের দিকে চলিল। মামী এখন নিশ্চয় রান্নার তদারক করিতে গিয়াছেন। ভাঁড়ার-ঘরের সম্মুখে খোলা বারান্দায় আসিতে চলার গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। আলো-ছায়াময় ঘরের পটে এক কিশোরীমূর্ত্তি সন্ধ্যাকাশে তারার মত ফুটিয়া উঠিল। পদশব্দে উমা প্রবেশ-দ্বারের চৌকাটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতীর দাঁতের মত গৌরবর্ণ দেহে লাল-পাড় তসরের শাড়ী অপরাহ্লের আলোয় যেন আগুনের আভা।

অরুণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। সৌন্দর্য্য তাহাকে এমন করিয়া অভিভূত করে কেন!

উমা ধীরে বলিল—মা বাড়ী নেই। উমা বড় শান্ত সুরে কথা বলে, কণ্ঠে একটু আবেগ আনে না কেন!

লজ্জিত ভাবে অরুণ বলিল—ও, আমার আসতে দেরি হয়ে গেল।

—তাতে কি, এক ঘণ্টার মধ্যেই আসবেন, মাসীমার ওখানে গেছেন। বাবা তোমায় খুঁজছিলেন।

—শোন, কি খাবে ?

—আমি খেয়ে এসেছি, কিছু খাব না।

—তা হবে না, মা এসে আমায় বকবেন, তিনি নেই ব'লে—

গজদন্তশুভ্র আননে মৃদু হাস্য খেলিয়া গেল। উমার হাসি বড় সংযত, উচ্ছ্বসিত হইয়া একটু হাসে না কেন!

—সত্যি, আমার এখন ক্ষিদে নেই।

—বেশ, রাতে খেয়ে যেও।

—অজয় এসেছে?

—না, দাদা আসেন নি—বাবা ও দিকে ছাদে আছেন।

অরুণ একটু অগ্রসর হইয়া আবার নীরবে দাঁড়াইল। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণাভামণ্ডিত ঐ অলৌকিক সৌন্দর্য্যরূপ যেন সে দৃষ্টিচ্যুত করিতে চায় না। একটু ব্যথিত স্বরে সে বলিল—কাল তোমার জন্মদিন আমি জানতুম না।

—দাদা বুঝি বলতে ভুলে গেছল। কিন্তু সেদিন যে মা'র সঙ্গে তোমার অত হিসেব হচ্ছিল,—তোমার জন্মদিনের দশ দিন পরেই আমার জন্মদিন, সব ভুলে গেছলে—

—হাঁ, আজকাল কিছু মনে থাকে না।

—খুব পড়ছ বুঝি, দেখ অরুণ—

—এই বললে, আমি তোমার চেয়ে বড়, আমায় দাদা বলা উচিত।

—ভারি দশ দিনের বড়, তবু যদি এক মাস হ'ত।

উমা অরুণকে দাদা বলিতে কেমন সঙ্কোচ বোধ করে। তাহার অন্য বোনেরা, এমন কি মাসতুতো বোনেরাও, অরুণকে দাদা বলে, কিন্তু সে তেমন পারে না।

—আচ্ছা, আমি তোমাকে আমার নাম ধরে ডাকবার অনুমতি দিলুম, এটা তোমার পঞ্চদশ জন্মদিনে আমার উপহার জেনো।

—খুব কথার ভট্টচার্য্যি হয়েছ, না দিলেও আমি তোমায় ডাকতুম। কিন্তু অত গম্ভীর কেন!

—কি জান, উমা, মনটা তেমন ভাল নেই।

—মন খারাপ কি জন্যে? যত ঢং, অত রাজ্যের বই পড়লে মন কেন, মাথাই খারাপ হয়ে যায়। আমি মাকে বলে দেব, তোমায় আর বই দেবেন না।

—তুমিও কিছু কম বই পড় না।

—আমার তাতে মন খারাপ হয় না। যাও বাবা একা ছাদে আছেন, আমি যাচ্ছি।

অজয়ের পিতা শ্রীহেমচন্দ্র রায় মহাশয় ভারত গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানার এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। অসুস্থতার জন্য এক বৎসর হইল চিকিৎসা করাইতে কলিকাতায় ছুটি লইয়া আছেন। অরুণের মাতা তাঁহার জন্মগ্রামের মেয়ে ছিলেন, তাঁহাকে দাদা বলিতেন, ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধূলা করিয়াছেন। সেই সম্পর্কে অরুণ তাঁহাকে মামাবাবু বলে।

হেমবাবু যুবাবয়সে কলেজে পাঠের সময় ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে ও প্রভাবে আসেন। একবার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন। পরে হিন্দুসমাজে বিবাহ করিলেও ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক সংস্কার আধুনিক আদর্শ নিজ পরিবারে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে তাঁহার স্ত্রী স্বর্ণময়ী তাঁহার সাহায্যকারিণী। বিবাহের পর তিনি স্ত্রীকে মেম রাখিয়া ইংরেজী শিখাইয়াছিলেন, তাহা বৃথা হয় নাই। দিল্লী সিমলার উচ্চতম অফিসার-সমাজে তিনি নিঃসঙ্কোচে সসম্মানে মিশিতে পারিয়াছেন।

দেড় বৎসর পূর্ব্বে সিমলাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া হেমবাবুর জ্বর ও পেটের অসুখ হয়। দিল্লীতে নামিয়া পেটের অসুখ কমিল, কিন্তু জ্বর ছাড়িল

না। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে কিছু সুস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু জ্বর একেবারে ছাড়িতেছে না। ডাক্তারেরা আশ্বাস দেন, শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিবেন, আর একটু বল পাইলেই চেঞ্জে গেলে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন। বস্তুতঃ, রোগ যে কি, তাহা ঠিকরূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই।

শয়নগৃহের সম্মুখে ঢাকা বারান্দায় এক লম্বা চেয়ারে পিঠে বালিশ ঠেসান দিয়া হেমবাবু শুইয়াছিলেন। ফাল্গুনের শেষে বেশ গরম পড়িয়াছে, সন্ধ্যায় ঘরে থাকিতে আর ইচ্ছা করে না।

বারান্দার সামনে বড় খোলা ছাদ জুড়িয়া নানা ফুলের গাছ—জুঁই, বেল, গোলাপ, এ্যাষ্টর, ডালিয়া, ক্রিসেনথিমাম। কন্যাদের সহায়তা ও উৎসাহে বিছানাতে শুইয়া হেমবাবু এই সুন্দর রুফ-গার্ডেন তৈরী করিয়াছেন।

অরুণ বারান্দায় প্রবেশ করিতেই চন্দ্রা চেঁচাইয়া উঠিল—বাবা অরুণদা এসেছেন।

হেমবাবু একটু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—এস, অরুণ এস, ওরে শীলা, তোর অরুণদার জন্যে একটা চেয়ার দে—

অরুণ ধীরে বলিল—আমি এই মোড়াতে বসছি, কেমন আছেন মামাবাবু?

শীলা ফুলের টবে জল দিতেছিল। ঝাঁঝরি নামাইয়া পিতার নিকট ছুটিয়া আসিল। হাতে একটি ফুল।

—বাবা, দেখ, কি সুন্দর নীল ফুল, দেখ অরুণ-দা—কি নাম বল ত!

—কোন বিলিতি ফুল হবে।

শীলা একটি লম্বা নাম বলিল। সব ফুলের নাম তাহার মুখস্থ।

—অরুণদা, তোমার ত বাটন-হোল নেই।

—তোমার মাথায় গোঁজ, বেশ দেখাবে।

খোঁপাতে গুঁজিবার ইচ্ছা হইলেও, ফুলটি শীলা পিতার চেয়ারের পার্শ্বে ছোট মার্ব্বেল টেবিলের উপর ফুলদানির পুষ্পগুচ্ছে গুঁজিয়া দিল।

হেমবাবু অতি সৌখীন প্রকৃতির মানুষ। অসুস্থতায় তাঁহার শুচিতা ও সৌন্দর্য্যবোধ আরও সূক্ষ্ম প্রবল হইয়াছে। তাঁহার শয্যা, আসবাব, গৃহ সব সময়ে পরিষ্কার থাকা চাই। জানালায় রঙীন সিল্কের পর্দ্দা, নীল দেওয়ালে রাফায়েলের 'মাতৃমূর্ত্তি', মাইকেল এঞ্জেলোর 'আদামের জন্ম' কোরো-র 'ল্যাণ্ডস্কেপ' ইত্যাদি কয়েকখানি ছবি যথাযথ টাঙানো; চেয়ারে রঙীন রেশমের ঝালরওয়ালা বালিশ, টেবিলে সূচের সূক্ষ্ম কা করা সাদা আচ্ছাদন, চারিদিকে শোভন পরিচ্ছন্নতা। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র কন্যা সকলকে তাঁহার নিকট পরিষ্কার পরিচ্ছদে থাকিতে হয়, সকলে সুবেশে থাকে, সুচারু জীবন যাপন করে, ইহাই তাঁহার বাসনা। তাঁহার সম্মুখে ভৃত্যরাও ময়লা কাপড়ে আসিতে পারে না।

হেমবাবু স্নেহকণ্ঠে বলিলেন—ওরে অরুণকে কিছু খেতে দে।

—না, আমি এই খেয়ে আসছি।

—তা হোক, কিছু ফল খাও, উমা!

—না, মামাবাবু!

শীলা হাসিয়া বলিল—বাবা, অরুণদা কি লাজুক।

চন্দ্রা বড়দিদির নিকট ছুটিল, খাবার আনিতে।

উমা মিষ্টি ও ফল লইয়া আসিলে অরুণ আর আপত্তি করিল না।

হেমবাবু বলিলেন—তুমি খাও অরুণ।

রোগে ভুগিয়া তাঁহার অন্তর যেমন সকলের হৃদয়ের প্রেম পাইবার পিয়াসী হইয়াছে, তেমনি স্নেহে প্রেমে আপনাকে বিলাইয়া দিবার জন্য তিনি তৃষিত।

খাওয়া শেষ করিয়া অরুণ বলিল—খুকু কি নতুন গান শিখেছে? এবার অরুণের প্রতিশোধের পালা।

চন্দ্রা ছুটিয়া ঘর হইতে শীলার এস্রাজ লইয়া আসিল।

—ছোটদির এস্রাজ সেরে এসেছে বাবা।

—আচ্ছা, তোমার বড়দি'কে ডাক।

হেমবাবু নিজে সুকণ্ঠ গায়ক না হইলেও, অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয়। রোগশয্যায় সঙ্গীতানুরাগ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। দিল্লীতে তিনি মেয়েদের সঙ্গীতশিক্ষার জন্য ওস্তাদ রাখিয়া দিয়াছিলেন। সুস্থ বোধ করিলে কলিকাতাতেও মধ্যে মধ্যে ভাল গায়ক আহ্বান করিয়া জলসা হয়। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই কন্যাদের লইয়া পারিবারিক সঙ্গীত-সভা বসে।

উমার গলা ভাল, কিন্তু কলিকাতাতে আসার পর প্রায়ই তাহার সর্দ্দি-কাশি হয়, নিয়মিত ভাবে গান শিখিতে পারে না। শীলা গান ভাল গায় না, তবে সেতার এস্রাজ সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে সুনিপুণা। চন্দ্রা যে কোন দিন গায়িকা হইবে এ আশা তাঁহার পিতাও করেন না; তবে রুগ্ন পিতাকে সাধ্যমত গান গাহিয়া আনন্দ দিতে তাহার অত্যন্ত উৎসাহ। সে উৎসাহ কেহ দমন করিতে চায় না।

চন্দ্রার গান দিয়াই সে সন্ধ্যার জলসা আরম্ভ হইল। বড়দিদির সাহায্যে সে সুর-সমুদ্রে অকুতোভয়ে পাড়ি দিল।

শীলার এস্রাজ বাজান শেষ হইলে উমা বলিল—কোন গান করব, বাবা?

—আজ সকালে কি গানটা গুন-গুন করছিলে?

—ও, তিমির-দুয়ার খোল এস, এস নীরব চরণে—

—হাঁ!

—সে ত ভোরবেলার গান বাবা।

—ওই গানই ত রাতে বসে গাইবার গান মা, যখন আলো শেষ হ'ল, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, 'তিমির-দুয়ার খোল—'এ যে অন্ধকারে আলোর জন্য প্রার্থনা।

উমা ধীরে গান ধরিল,

'তিমির-দুয়ার খোলো—এসো, এসো, নীরব চরণে
জননী আমার, দাঁড়াও এই নবীন অরুণ-কিরণে।'

ধীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে; চারিদিকে মায়াময় আবছায়া; পশ্চিমাকাশে নারিকেল বৃক্ষগুলির অন্তরালে সূর্য্যাস্তের স্বর্ণদ্যুতি প্রকৃতি-লক্ষ্মীর ললাটে রক্তচন্দনের মত। হাস্নাহানার গন্ধভরা বাতাস মৃদু বহিতেছে।

অরুণ গান শুনিতে লাগিল।

উমা প্রতিমার মত অত চমৎকার গায় না। দু-জনের গান গাহিবার ভঙ্গীর কত প্রভেদ। প্রতিমা যদি এ গানটি গাহিত, মনে হইত নীড়ে-জাগা ভোরের পাখী সহজ উচ্ছ্বসিত আনন্দ স্বরে অরুণোদয়ের অভ্যর্থনা করিতেছে। উমা গাহিতেছে, যেন শ্রান্ত পথিক ক্লান্ত চরণে অন্ধকার রাত্রে পথহারা হইয়া আলোর জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করিতেছে। উমার কণ্ঠ এমন করুণ উদাস কেন?

উমা তাহার মাতার সুন্দর রং পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার মুখের সামঞ্জস্যপূর্ণ সুগঠিত রূপ পায় নাই। মুখখানি লম্বা, অনতিপক্ক পেঁয়ার ফলের মত; প্রশস্ত উন্নত ললাটে একটি টিপ জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে, যেন উষার গগনে শুকতারা; টানা ভ্রূর নীচে আয়ত নয়ন নীচু করিয়া বসান, সে নয়নে কখনও নিষ্কাশিত অসি-লতার দীপ্তি, কখনও আষাঢ়ের নবীন মেঘের ছায়াস্নিগ্ধতা; অপরিপুষ্ট অধর একটু শীর্ণ, সে শীর্ণতা রোগশয্যার সেবাক্লিষ্টতা, রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি; গণ্ড দুইটিতে কখনও উষার পাণ্ডুরতা, কখনও সন্ধ্যার রক্তিমা; প্রশস্ত চোয়াল হইতে কমনীয় চিবুকের রেখার

ছন্দ ঔদাস্তে ভরা ; যেন সমুদ্রের একটি তরঙ্গরেখা ললাটে উচ্ছ্বসিত, নয়নে আনত, কপোলে প্রবাহিত হইয়া চিবুকের দিগন্তে কোন্ অসীমে মিশিয়া গিয়াছে। স্বর্ণাভ প্রদোষান্ধকারের পট-ভূমিকায় গায়িকা কিশোরীর মূর্ত্তি।

তিন বোনের মধ্যে দেহরূপে কত প্রভেদ। শীলার মুখ উমার মত লম্বা নয়, গোল হইয়া আসিয়াছে, তারপর চন্দ্রার মুখ ত চাঁদামাছ। শীলার রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বয়সের তুলনায় স্থূলকায়, সহজেই আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, যেন এক সতেজ বনলতা নিজের চারিদিকে ভাবের কুঞ্জ রচনা করিতে চায়।

উমার দেহের গঠন পরিমিত, মুখে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য, ঠোঁটের টানে স্থিরসঙ্কল্প, কণ্ঠের স্বরে শাণিত ভাব, স্ত্রী ও ধীশক্তি অন্তরাবেগকে সংযত করিয়া তাহাকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে ; কিন্তু তাহার একটু ভাবে চ্ছ্বাস থাকিলে বুঝি ভাল হইত, মনে হয় তার হৃদয়ে কোথাও নিষ্ঠুরতা, শূন্যতা আছে।

উমার গান শুনিতে অরুণের বড় ইচ্ছা করে, কিন্তু উমা যখন গান গায় সে আনন্দ পায় না। প্রতিমার গান গাওয়ায় যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ সুর আছে, উমার কণ্ঠে সে সুর খুঁজিয়া পায় না।

হেমবাবুর রোগাতুর মুখের দিকে চাহিয়া, উমার দীর্ঘ নয়নপল্লবের দিকে তাকাইয়া সে অন্তরে কি বেদনা অনুভব করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল এই সুখ, এই সঙ্গীতের আনন্দ যেন কোন বিশুদ্ধ মহানন্দের ছায়ামাত্র, যে বেদনাহীন মহানন্দের একটুকু আভাস সে পাইতেছে, কল্পলোকের দিগন্তে সেই পূর্ণ আনন্দছটা ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আবার মিলাইয়া যায় কেন, ব্যথাভরা তৃষ্ণা রাখিয়া যায়।

সেই অলৌকিক সন্ধ্যায় অরুণের জীবনে প্রেম, বেদনা ও অসুস্থতা একসূত্রে তিনটি মুক্তার মত গাঁথা হইয়া গেল।

৪

রাত প্রায় নয়টার সময় অরুণ বাড়ি ফিরিল। ঘরের সম্মুখে বারান্দায় ঠাকুমা তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে খেয়ে এসেছিস?

অরুণ উত্তর দিল—হ্যাঁ, ঠাকুমা, আমি ত তোমায় বলেই গেলুম।

ঠাকুমার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করেন, মামী কি খাওয়ালেন। কিন্তু অরুণ খাদ্য দ্রব্যের সম্পূর্ণ তালিকা দিবে না, আর অত খাবারের নাম শুনিলে পরদিন তাহাকে কিছু বেশী রাঁধিতে হইবে।

—আজ আর বেশী রাত জেগে পড়িস্ নে, শুয়ে পড়।

অরুণ যে অজয়দের বাড়ী অত বেশী যায়, খায়, গল্প করে, ঠাকুমা তাহা মনে মনে পছন্দ করেন না। কোন বাধাও দিতে ইচ্ছা হয় না। এই মাতৃহীন বালকের অন্তরের স্নেহক্ষুধা তিনি ত মিটাইতে পারেন না। অরুণ যদি কোথাও গিয়া আনন্দ পায়, তাহাতে তিনি বারণ করিবেন কেমন করিয়া। প্রতিমার কিন্তু এ সব হাঙ্গাম নাই। সে বাড়ীতে বেশ থাকে। স্কুলের পড়া পড়ে, গান গায়, পাখীদের পালন করে, হেলা-ফেলা করিয়া কাটাইয়া দেয়; মাঝে মাঝে তাহার কোন সহপাঠিনীকে নিমন্ত্রণ করিয়া সখ করিয়া রাঁধিয়া খাওয়ায়! কাহারও বাড়ী যাইতে সে রাজী হয় না। পুরুষেরা চিরকালই বাহিরমুখো।

প্রতিমার ঘরে উঁকি মারিয়া ঠাকুমা নিজের ঘরে গেলেন। প্রদীপ নিবাইয়া বারান্দায় মাদুর পাতিয়া শুইলেন! সুন্দর চাঁদ উঠিয়াছে।

কৃশাঙ্গী, খর্ব্বাকৃতি, কাঁচাপাকা চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা বলিয়া বার্দ্ধক্যরেখাঙ্কিত মুখ শীর্ণ দেখায়। দেহের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, আঁটসাট গড়ন, মুখের স্নেহপ্রসন্নতা দেখিলে বোঝা যায়, ঠাকুমা এক সময়ে সুন্দরী ছিলেন। বস্তুতঃ অতি গরীব ঘরের মেয়ে হইলেও, অতুলনীয়া সুন্দরী ছিলেন বলিয়াই এই ধনী বনিয়াদী বংশে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ছোটবেলায় সবাই তাঁহাকে পুতুল বলিয়া ডাকিত। তাঁহার সমস্ত জীবন নিষ্ঠুর বিধাতার হস্তে পুতুলের খেলাই হইয়াছে। ছোট মেয়ে আপন পুতুলকে আদর করিয়া নানা রঙীন কাপড়ের টুক্‌রায় খুশীমত সাজায়, হৈ চৈ করিয়া তাহার বিবাহ দেয়, আবার রাগ হইলে সমস্ত সজ্জা ছিঁড়িয়া তাহাকে মাটিতে আছড়ায়। বিধাতাও একদিন তাঁহাকে বালিকাবয়সে বধূবেশে সাজাইয়া কোন সোনার সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। সে-কথা ঠাকুমার স্বপ্নের মত মনে হয়। সোনার স্বপ্ন মিলাইয়া গেল, যৌবনেই তাঁহাকে যোগিনী হইতে হইল। যে শ্রাবণ-রাত্রে দুই শিশুপুত্রকে বক্ষে চাপিয়া তিনি বিধবা হইয়াছিলেন, মনে হইয়াছিল সে অন্ধকার নিশীথের বুঝি অবসান হইবে না। সে রাত্রিও প্রভাত হইল। বড় সাধ করিয়া প্রথম পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। সে পুত্র, সে লক্ষ্মীস্বরূপিণী পুত্রবধূ আজ কোথায়! সব ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তারপর দুঃখ তাঁহার ললাটে যতই আঘাত করিয়াছে, তিনি মনের বল হারান নাই, কোথা হইতে নবশক্তি পাইয়াছেন। নিষ্ঠুর বিধাতা সংসারাঙ্গনে এ পুতুলটিকে বার বার আছড়াইয়াছেন, ভাঙ্গিতে নয়, আরও মজবুত করিতে। কোন অখ্যাত জন্মগ্রাম হইতে এক সরল শঙ্কিতা বালিকা যেদিন সালঙ্কৃতা গৃহবধূরূপে এই গৌরবময় বনিয়াদী পরিবারে আসিয়াছিল, ওই পূজার অঙ্গনে বরণডালার প্রদীপশিখায়

সেদিন এই বংশের মহিমা মর্য্যাদা রক্ষার ভার যে তাহারই হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল। অরুণ ও প্রতিমার জীবনে সেই মহিমার অক্ষুণ্ণ রূপ দেখিয়া না-যাইতে পারিলে ঠাকুমা শান্তিতে মরিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয় পুত্রের উপর তিনি কিছু আশা করেন না। বিলাত হইতে সে মদ্যপ, অনাচারী, হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী হইয়া আসিয়াছে। কেহ কেহ বলে, সে বিলাতে বিবাহ করিয়াও আসিয়াছে। ঠাকুমা তাহা বিশ্বাস করেন না, তবে তাহার বিবাহেরও কোন চেষ্টা করেন নাই। সে শুধু তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকুক।

অরুণ ও প্রতিমাকে তিনি জীবনের সমস্ত আশা ও স্নেহ দিয়া জড়াইয়াছেন। এ-বংশের আদর্শানুসারে তাহাদের মানুষ করিতে হইবে। তাহারা যখন পিতার মৃত্যুর পর ঠাকুমার সহিত বাস করিতে আসিল, তাহাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা লইয়া মাতা ও পুত্রে বিবাদ বাধিল। প্রতিমার বিলাত-ফেরৎ কাকা তাহাকে কোন মেম-সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিতে চাহিলেন, আর ঠাকুরমার ইচ্ছা, প্রতিমা সংসারের কাজকর্ম্ম করে, খুব-জোর কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শ্লোক শিক্ষা করে। এ-বংশের কোন মেয়ে কখনও গাড়ী করিয়া স্কুলে যায় নাই। শেষে রফা হইল, প্রতিমা কলিকাতার কোন বাঙালী মেয়েদের স্কুলে পড়িবে, বাড়ীর গাড়ী তাহাকে পৌছাইয়া দিয়া আসিবে। স্কুলে গিয়া প্রতিমা কোন দুরন্তপনা, বেহায়াপনা শিখে নাই, বেশ শান্ত, বাধ্য মেয়ে, তবে মাঝে মাঝে বড় একগুঁয়েমি করে।

অরুণের জন্য ঠাকুমার বড় ভাবনা। ঘরে তাহার মন নাই, তাহার বহু বন্ধু, তাহারা বনিয়াদী বংশের ছেলে বলিয়া মনে হয় না। তাহার শরীরও রোগা, টো-টো করিয়া ঘোরে, বাগানে একা বসিয়া থাকে, প্রতিমার মত আবদার করে না, মন খুলিয়া কথা বলে না,

তাহার মনে কিসের দুঃখ? তাহাকে তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

অরুণ বি-এ ক্লাসে উঠিলেই, সুন্দরী মেয়ে দেখিয়া ঠাকুমা তাহার বিবাহ দিবেন, গরীব বনিয়াদী ঘরের মেয়ে আনিবেন। তাহাকে বিলাত যাইতে দিবেন না।

ঠাকুমার চোখে জল আসিল। রেখাঙ্কিত কপোল অশ্রুতে ভিজিয়া গেল। মাদুর হইতে উঠিয়া তিনি ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিলেন।

ঠাকুমা চলিয়া গেলে অরুণ হাতমুখ ধুইয়া জামা বদ্‌লাইয়া খোলা জানালার কাছে এক চেয়ার টানিয়া বসিল। শুভ্র জ্যোৎস্না রাত্রি স্বপ্নের কুহেলিকা জড়ান।

স্কুলের বই পড়িতে ইচ্ছা করিল না। মন যেদিন বিষণ্ণ বা আনন্দ-পূর্ণ থাকে, সে ডায়েরী লেখে বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ খুলিয়া পড়ে। মামীমার নিকট হইতে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন পুস্তিকাগুলি লইয়া আসিয়াছে। উপদেশগুলি একটু সুর করিয়া মৃদুস্বরে পড়িতে বসিল, যেন মহান কবিতা। সব বুঝিতে পারিল না, গভীর ভাবগর্ভ কথাগুলির তরঙ্গাঘাতে তাহার অন্তরের কোন গোপন গুহার সুপ্ত জলে চঞ্চলতা জাগিল। উপদেশের শেষে প্রার্থনা সে ভক্তির সহিত পাঠ করিল, এ যেন তাহার অব্যক্ত আত্মার ভাষাহীন বেদনার বাণী।

ডায়েরি লেখা হইল না। শান্তিনিকেতন হইতে কয়েকটি অংশ ডায়েরিতে টুকিল।

"জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি এই তিন ধারা যেখানে একত্র সঙ্গত সেইখানেই আনন্দতীর্থ। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের যে পরিমাণে পূর্ণ মিলন সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ।"

তাহার নীচে অরুণ লিখিল—জ্ঞানের সাধনা করিতে হইবে সত্য কি জানিবার জন্য, শক্তির সাধনা করিতে হইবে মানবকল্যাণের জন্য, কিন্তু প্রেমের সাধনা কিসের জন্য? সৌন্দর্য্যের জন্য? বেদনার জন্য? কবি বলিতেছেন, জ্ঞান প্রেম ও শক্তির সমন্বয় করিতে হইবে তবে আনন্দ-তীর্থে পৌছান যায়।

এ বিষয় জয়ন্তর সঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে।

ডায়েরি বন্ধ করিয়া অরুণ প্রতিমার ঘরের দিকে চলিল। প্রতিমা নিশ্চয় ঘুমায় নাই। তাহার এত রাতজাগা উচিত নয়।

গৃহদ্বারের নিকট আসিয়া অরুণ শুনিতে পাইল, প্রতিমা একা ঘরে বসিয়া আপন মনে উচ্চস্বরে হাসিতেছে। মাথা খারাপ হইল না কি!

ঘরে ঢুকিয়া অরুণ দেখিল, প্রতিমা নিবিষ্ট মনে কি বই পড়িতেছে; ও, ডন্‌কুইক্‌সোট।

—দাদা, কি মজার বই, তুমি আমায় এত দিন দাও নি!

—টুলি, কি মজা? খুব চেঁচিয়ে হাসছিস ত!

—এই তোমার ডন্‌কুইক্‌সোট গো।

—ওতে হাসবার কি আছে?

—বা, হাসবার নেই? আচ্ছা, উইণ্ডমিলগুলোর সঙ্গে কি ব'লে যুদ্ধ করতে যায়? শোন, আমি একটা কবিতা লিখেছি, তোমার কবি-বন্ধু এমন লিখতে পারবে না, ছন্দ মিলেছে—

ডন্‌কুইক্‌সোটের লাগল চোট
রক্ত ঝরিল বক্ষে
অমন কাণ্ড হতেই হবে
দেখে না যারা চক্ষে

দু-চার লাইনে ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করিতে প্রতিমা সুনিপুণা।

অরুণ হাসিয়া বলিল—তুই গল্পটা কিছুই বুঝিস নি, ও কত বড় আইডিয়াল নিয়ে বাহির হয়েছে।

—মাথায় থাক অমন আইডিয়াল, ওর ত বই পড়ে পড়ে মাথা খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, তোমার বন্ধু কি সব বাজে কবিতা লেখেন, এই গল্পটা কবিতায় অনুবাদ করতে ব'লো।

—টুলি, যা বুঝিস না তাই নিয়ে ঠাট্টা করিস না।

—বা আমি ত সিরিয়সলি বলছি।

অরুণ ভাবিল, পৃথিবীর ডন্‌কুইক্‌সোটদের মেয়েরা কি চিরকাল পরিহাস করিবে, তাহাদের আদর্শ বুঝিয়া ভালবাসিবে না?

—দাদা, তুমি বড় গম্ভীর হয়ে যাও। কিন্তু তোমার কবিবন্ধুটিকে সাবধান ক'রে দিও। আমাদের স্কুলের গাড়ীর ঘোড়াটি ওই উইণ্ডমিলের চেয়েও সজীব ও বেগবান।

—কেন কি হয়েছে?

—কবিটি আর একটু হ'লে ঘোড়া-চাপা পড়তেন, একেবারে আকাশের দিকে চেয়ে হাঁটেন।

—যা, বাজে বকিস না, এখন বই বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়। বেশী পড়লে কি অবস্থা হয়, দেখছিস্ ত ডন্‌কুইক্‌সোট—

—সেটি তুমিও মনে রেখো। আমি বাপু গল্পটি শেষ না ক'রে শুচ্ছি নে।

—আচ্ছা, আর আধ ঘণ্টা।

—ও, ভুলেই গেছলুম, এই নাও দাদা সেই গানটা।

গানের কাগজখানি লইয়া অরুণ নিজের ঘরে গেল না। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাগানে বাহির হইয়া গেল। মুঞ্জরিত রক্তকরবীকুঞ্জের ছায়ায় ভগ্ন মর্ম্মরবেদিকায় ধীরে বসিল।

জ্যোৎস্না-নিশীথের নৈঃশব্দ দক্ষিণ সমীরণে ক্ষণে ক্ষণে মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছে। সুপ্তসৌধ মহানগরী যেন কোন্ সুদূরে। এই প্রাচীর পরিত্যক্ত উদ্যানে ঝরা-পাতার গন্ধময় রহস্যান্ধকারে, ঝুরিনামা বটগাছের পুঞ্জীভূত স্তব্ধতায় অরুণ তাহার জীবন-কল্লোলময় বেদনাপূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে একটি শান্তির আশ্রয় লাভ করে; এই নিভৃত নির্জ্জনতায় তরু-রেখাবেষ্টিত যে খণ্ডিত আকাশ দেখা যায়, সেই নীলকান্তপ্রভ সুনির্ম্মল আকাশটুকু তাহার নিজস্ব; এই আকাশের সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্তে চুনি-পান্না-গলানো আলো, চন্দ্রমার স্বপ্নময় শুভ্রতা, তারালোকের অসীমতা, নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় বন্যা ধারা, এ আলোক অন্ধকার কেবল মাত্র তাহারই। এ শ্যামল বিজনতায় আকাশটুকু তাহার একমাত্র সঙ্গী।

আজ কিন্তু সেই পরিচিত নীল যবনিকার নিঃসঙ্গতা রহিল না, নিভৃত আশ্রয়ে নানা গানের সুর ভিড় করিয়া আসিল।

৫

ট্রাম চলা বড় রাস্তা হইতে সরু-ফুটপাথওয়ালা পথ সোজা পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে; তাহার এক প্রশাখার মত গলিটি দক্ষিণ দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আবার পূর্ব্বদিকে আঁকিয়া-বাঁকিয়া বৃহৎ বাড়িগুলির সীমান্তে হারাইয়া গিয়াছে। অরুণদের বাড়ির সম্মুখে গলিটি সরু, সোজা, নিঝুম। উত্তরে ঘোষ-বংশের প্রাচীন প্রাসাদভূমির জীর্ণ হলদে দেওয়াল, দক্ষিণে মল্লিকদের বাগানের উচ্চ শুভ্র প্রাচীর ও কয়েকটি ক্ষুদ্র পুরাতন বাড়ি। আম, নিম, কদম্ব নানা বৃক্ষের শাখা গলির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। প্রভাতের রৌদ্র তির্য্যকভাবে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য গলিটিকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, মধ্যাহ্নে বৃক্ষশাখাগুলির সুস্নিগ্ধ ছায়াপাত হয়, রাত্রে জ্যোৎস্না মায়াজাল বোনে। এখানে কলিকাতার জনস্রোত অতি মন্দ; সকালে ছেলেরা হল্লা করিয়া স্কুলে যায়; দুপুরে কোন পথভ্রান্ত ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া চলে, 'চুড়ি চাই' 'ছাতা সারাবে গো', তাহাদের উদাস কণ্ঠের সুর করুণ প্রতিধ্বনির মত গলিটিতে ঘুরিয়া বেড়ায়; সন্ধ্যার পর সব নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত। কোন ভাড়াটে গাড়ী যখন ঝন্ ঝন্ শব্দে চলিয়া যায়, ঘোড়ার খুরের শব্দে সমস্ত পথ কাঁপিয়া উঠে। গভীর রাত্রে যখন ব্যারিষ্টার ঘোষের লম্বা বড় মোটরকার হেড লাইট জ্বালাইয়া প্রবেশ করে, মনে হয় কোন অতিকায় সরীসৃপ মাথায় মণি জ্বালাইয়া অন্ধ বিবরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এ গলিতে মোটরকার মানায় না। পূর্ব্বে যখন ঘোষেদের, মল্লিকদের বাবুরা জুড়ি গাড়ী হাঁকাইয়া বাহির হইতেন, পাড়ার গৃহিণীগণ

পাল্কী চড়িয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন, তখন গলিটি সজীব ছিল।

গলিতে ছয় ঋতুর লীলা করুণ সুন্দর। ফাল্গুনে ঝরা-পাতার পীত আবর্জ্জনায় বসন্ত-বাতাস হতাশ্বাসের মত বহিয়া যায়। গ্রীষ্মে আম্র-মুকুল বকুল ফুল ঝরিয়া পড়ে, রৌদ্রে পাথরগুলি ঝিকিমিকি করে। বর্ষায় সঘন অন্ধকারে গৈরিক স্রোত বন্যাজলের মত বেগে প্রবাহিত হয়, ছোট ছেলেমেয়েদের কাগজের নৌকা ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। কত বিগত আশ্বিনে এখানে পূজার বাজনা বাজিয়াছে, লোকে লোকারণ্য, কোন্ বাড়ির প্রতিমা আগে যাইবে, বলিয়া লাঠালাঠি হইয়াছে, এখন কেবল দুই পার্শ্বের বাগান হইতে উদাস স্মৃতির মত শেফালীর মৃদু গন্ধ আসে, অপরাজিতা লতার নীল ফুলগুলি হলদে দেওয়াল ভরিয়া গলির উপর ঝুলিয়া পড়ে।

খিলানওয়ালা বড় গেট পার হইয়া অরুণদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে বৃহৎ প্রাসাদের দ্বিতল অংশের আইয়োনিক থাম-গুলির সারি। ছাদওয়ালা ঝিলিমিলি-ঢাকা প্রশস্ত বারান্দার সম্মুখে আইয়োনিক থামগুলি যেমন মোটা তেমনই উঁচু, দুই কোণে ও মধ্যে এক জোড়া করিয়া।

দক্ষিণমুখী প্রাসাদের সম্মুখে ডিম্বাকৃতি ফোয়ারা ও বড় বড় কালো পাথর-গড়া কৃত্রিম পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা বিশেষ কিছু নাই; ফোয়ারার স্বচ্ছ জলে লাল নীল মাছ খেলা করে, এই মাছগুলি প্রতিমার প্রিয়; তাহাদের পরিচর্য্যার ভার সে লইয়াছে।

দুই মহলওয়ালা চক্-মিলান বাড়ি। ঢুকিয়াই চকবন্দী বৃহৎ অঙ্গন। প্রাচীনকালে এখানে কত যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, কবির লড়াই হইয়াছে, এখন শূন্য অঙ্গন দেখিলে বুকটা খচ্ খচ্ করে। সম্মুখে পূজার

দালান, মেঝের মার্ব্বেল পাথর অধিকাংশ ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এক কোণে কয়েকটি ভাঙ্গা চেয়ার ও বাক্স জড়ো করা, যেন গুদাম ঘর; শূন্য ঠাকুর-দালান দেখিলে মনে বেদনা হয়।

অঙ্গনের পূর্ব্বদিকে লাইব্রেরী-ঘর। সাহেবী দোকানে তৈরি নানা আসবাবে ভরা। আলমারিগুলিতে নানা পুরাতন গ্রন্থ—সেক্সপীয়রের অষ্টাদশ শতাব্দীর এক সংস্করণ, স্কটের ওয়েভারলি উপন্যাসাবলী, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ছাপা; ডিকেন্স, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের নানা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ, প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি; ফার্দ্দুসী, হাফেজ, নানা ফার্সী কবির গ্রন্থ। দেওয়াল জুড়িয়া অরুণের প্রপিতামহের অয়েল পেন্টিং—মাথায় কাজ-করা শামলা, গায়ে শালের চোগাচাপকান, বীর্য্যব্যঞ্জক মুখ, ওষ্ঠাধর পাতলা ও চাপা, টানা চোখ দুটি জ্বল জ্বল করিতেছে।

অঙ্গনের পশ্চিমে দপ্তরখানা। ময়লা ফরাসের ওপর সরকার-মহাশয় সকালে হিসাব লেখেন, দুপুরে গড়গড়া টানিতে টানিতে নিদ্রা যান। অঙ্গনে দুইটি বৈঠকখানা-ঘর। একটিতে তক্তার ওপর ফরাসপাতা, মোটা মোটা তাকিয়া সাজান। সে ঘরে কেহ বসে না। সরকার-মহাশয় রাত্রে নিদ্রা যান।

অপর বৈঠকখানায় চেয়ার-টেবিল সাজান। ষোড়শ লুই চেয়ার-গুলির বাঁকা পায়া নড়বড় করে, কার্পেটগুলির চিত্র মলিন। ইহাদের মধ্যে নূতন হালফ্যাসানের চেয়ারগুলি বড় বেমানান দেখায়। প্রয়োজন হইলে অরুণের সাহেব-কাকা এই ঘরে মাঝে মাঝে বসেন। তাঁহার ঘর বৈঠকখানা-ঘরগুলির উপর দোতলায়।

শিবপ্রসাদ দিনের বেলায় বাড়িতে অল্প সময়ই থাকেন। আইয়োনিক থামওয়ালা প্রশস্ত বারান্দায় যখন প্রভাতের রৌদ্র আসিয়া পড়ে, তাঁহার শোবার ঘরে জানালা বন্ধ থাকে। সকাল আটটার সময়

ছকু খানসামা চায়ের পেয়ালা ও দাড়ি কামাইবার গরম জল লইয়া শিবপ্রসাদের শয়নগৃহে প্রবেশ করে। নয়টার সময় স্নান করিয়া তিনি ব্রেকফাষ্ট খান। দপ্তরখানার উপর দোতলায় তাঁহার খাবার ঘর। মেহগ্নী কাঠের লম্বা বড় সাইডবোর্ড, দেওয়ালে অনেকগুলি বাঁধানো ছবি, ঘরটি সুসজ্জিত। ছবিগুলি তাঁহার ইউরোপের যৌবনের আনন্দ-স্মৃতি, অধিকাংশই উপহার—রেনোয়ার "স্নানরতা তরুণী", রসেটির "দান্তের স্বপ্ন," দেগার "নর্ত্তকী," নানা ছবি; ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনের খেলাধূলা, পিকনিক, নিশীথোৎসবের চিত্র, প্রাণোল্লাসপূর্ণ বিচিত্র বেশসজ্জিত নর-নারীদের ফটো।

সকাল সাড়ে দশটার সময় শিবপ্রসাদ বাহির হইয়া যান। ক্লাব হইতে ফিরিতে রাত এগারটা হয়। তারপর সাপার। ঠাণ্ডা মাংস ও সবজী খাওয়া উপলক্ষ্য মাত্র, মদ খাওয়াই উদ্দেশ্য। গভীর রাত্রে তাঁহার গ্রন্থপাঠের সময়। তিনি বহুভাষাবিৎ। ইংলণ্ডে থাকিবার সময় জার্ম্মাণ, ইতালিয়ান, রুষ ও সুইডিস্ ভাষা আয়ত্ত করেন। দেশে আসিয়া শিক্ষক রাখিয়া সংস্কৃত ও ফারসী শিখিয়াছেন। এখন তন্ত্রশাস্ত্র ও ইতালীয় কবি কারদুচি পাঠে নিমগ্ন। বারান্দায় লম্বা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া মদ ও বই লইয়া রাত একটা বাজিয়া যায়।

কিন্তু কোন কোন রাতে কালিদাস বা কারদুচি হাফেজ বা পুস্কিন্, কোন দেশের কোন কবিই তাঁহার চিত্তকে শান্ত করিতে পারে না।

তাঁহার শয়নগৃহে টেবিলের উপর রূপার ফ্রেমে বাঁধানো দুইখানি ফটো পূর্ব্বে ছিল। একটি, এক সমুদ্রনীলনয়না সুরূপা ইংরেজ ললনার, মাথায় কৃত্রিম ফুলভরা টুপি, কলকাওয়ালা কাশ্মীরী শাল হইতে তৈরী জামা ও স্কার্ট, মুখখানি কৃত্রিম ফুলের মত, শোভনতা আছে, প্রাণের দীপ্তি নাই। আর একটি ফটো একটি ছোট মেয়ের, তাহার নীলনয়ন

স্নিগ্ধ, চুলগুলি একটু কালো, ফুটন্ত গোলাপের মত মুখখানি, হাসিটি চমৎকার।

এখন সে নীলনয়না ইংরেজ-দুহিতার ফটো নাই, কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। আর বেবীর ফটো খাটের মাথায় দেওয়ালে ঝুলান। নিদ্রাহীন অশান্ত-রাত্রে কখনও কখনও শিবপ্রসাদ খুকীর ফটোটি হুক হইতে খুলিয়া হাতে ধরিয়া বারান্দায় পদচারণা করেন। তারপর ফটোটি যথাস্থানে রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া অন্ধকার গলির দিকে চাহিয়া থাকেন।

চৈত্রের জ্যোৎস্না। পলাশ বৃক্ষের শাখায় শাখায় রক্তিম পুষ্পগুচ্ছ পুঞ্জিত; নারিকেল বৃক্ষগুলির আড়ালে শুভ্র মেঘস্তূপে চন্দ্রমা। শিব-প্রসাদের রক্তে বসন্ত-রাত্রির মত্ততা লাগে। মনে পড়ে ইংলণ্ডের বসন্তাগমন। আপেল পেয়ার চেরীগাছে নবপুষ্পস্তবকের কি অপরূপ সৌন্দোর্য্যাচ্ছ্বাস! শিশুমুখের মত কচি পাতাগুলি এলম্ বৃক্ষের ডালে।

শিবপ্রসাদ ভাবেন সেই বেবী এখন কত বড় হইয়াছে। তাহার বয়স এখন প্রতিমার সমান হইবে।

গলির অন্ধকারের দিকে শিবপ্রসাদ চাহিয়া থাকেন, কোথায় কোন্ নিশাচর পাখী ডাকিয়া ওঠে।

৬

ছুটির দিন। চৈত্রের নিঝুম দুপুর। স্বচ্ছ রৌদ্র যেন কোন নিস্তরঙ্গ রজত সমুদ্রের স্রোত; এই শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় শব্দহীন ধারায় ঘরবাড়ি গাছ পথ সব পরিপ্লুত। ঝিরি ঝিরি ঈষদোষ্ণ বাতাসে বসন্ত-স্পন্দিত মৃত্তিকার সুরভি। এইরূপ রৌদ্রের দিকে চাহিয়া স্বপ্ন বোনা যায়। মনে হয় এই দীপ্ত স্তব্ধতা কোন গভীর প্রাণস্রোতে পূর্ণ।

এইরূপ আলোভরা দিনে অরুণ বাড়ি থাকিতে চায় না, রথঘর্ঘরপূর্ণ জনস্রোতময় কলিকাতার পথের জীবনকল্লোল মধ্যে তাহার ঘুরিতে ইচ্ছা করে। রাত্রির স্তব্ধতায় মনে শান্তি আনে, কিন্তু এই সূর্য্যালোকপূর্ণ নিস্তব্ধতায় প্রাণে চঞ্চলতা জাগে।

খাওয়ার পর অরুণ একেবারে প্রতিমার ঘরের দিকে চলিল। প্রতিমা নিজের ঘরে নাই, ঠাকুরমার ঘরে; তাঁহাকে রামায়ণ পড়াইয়া শোনাইতেছে। বারান্দায় ময়না ও কেনারী পাখীগুলি খাঁচায় ঝিমাইতেছে। সাদা কাকাতুয়াটি ছোলা ও ছাতু খাইতেছিল, অরুণকে দেখিয়া লাল ঠোঁট নাড়িয়া চেঁচাইল—গুড্ মর্নিং সমস্ত বাড়ি সচকিত হইয়া উঠিল। অরুণ তাহার জলপাত্রে জল ভরিয়া দিয়া বলিল, চুপ কুম্ভকর্ণ। এই পক্ষীগুলি প্রতিমার পোষ্য জীব। কাকাতুয়ার নামকরণ তাহারই।

অরুণ বাড়ি হইতে বাহির হইল। জয়ন্তের বাড়ি যাইবে ঠিক করিল। জয়ন্ত গতকল্য স্কুলে আসে নাই। অসুখ হইল কিনা খোঁজ লওয়া দরকার।

জয়ন্তের বাড়িতে তাহার যাইতে ইচ্ছা করে না। সে-বাড়ির আব-হাওয়া, জীবন-প্রণালী সুস্থ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

জয়ন্তের মেসো-মহাশয় তাহার পূজনীয়। কিন্তু তিনি অরুণের সহিত এত বিনীত ব্যবহার করেন, তাহার বংশ-গরিমার এত উচ্চ প্রশংসা করেন যে অরুণের লজ্জা হয়। পীতাম্বরের কপালে চন্দনের তিলক, গলায় কণ্ঠি, গায়ে ময়লা ফতুয়া, নয় হাত ছোট মোটা কাপড় পরা, সব সময় জোড়হাতে নম্র স্বরে কথা বলেন, যেন সবার দাসানুদাস। সরল কৈশোর বুদ্ধি দিয়া অরুণ এই লোকটিকে ঠিক বিচার করিতে পারে না, সে কিন্তু বুঝিতে পারে লোকটা খাঁটি নয়। বস্তুতঃ, অতি পরমবৈষ্ণব বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিতে চাহিলেও পীতাম্বর ভণ্ড ও অত্যাচারী। তাঁহার গৃহিণী মৃন্ময়ীকে দিনরাত খাটিতে হয়; কাজ বড় কম নয়, নিজের চার ছেলে, চার মেয়ে, তাছাড়া জয়ন্ত ও মণ্টু আছে। বাড়িতে পীতাম্বর ঝি রাখিতে দেন নাই, কারণ সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ছেলেমেয়েরা ভাল খাইতে ও পরিতে পায় না, কারণ দারিদ্র্য বৈষ্ণবের ভূষণ। কাহারও অসুখ করিলে ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা হয় না, হরিনাম গান হয়। পীতাম্বর কিন্তু সুন্দর নাম সংকীর্ত্তন করিতে পারেন। আসলে লোকটি অতি কৃপণ ও স্বার্থপর।

জয়ন্তের মাসতুতো ভাইবোনগুলির ব্যবহারও অতি অদ্ভুত অস্বাভাবিক লাগে। তাহাদের শীর্ণ বুভুক্ষু চেহারা, ময়লা ছোট কাপড় জামা দেখিলেও দুঃখ হয়। বড় বোন দুর্গা প্রতিমার বয়সীই হইবে, কিন্তু অরুণকে দেখিলে কেবল মাত্র সে নয় তাহার তিন-পাঁচ-সাত-নয়-দশ-নানা বৎসরের ভাইবোনগুলি লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা সকলে ছুটিয়া পালায়—পীতাম্বর তাঁহার সকল পুত্রকন্যার নাম দেবদেবীর নামে রাখিয়াছেন, হালফ্যাসানের নাম মোটেই পছন্দ করেন

না—তারপর সকলে দরজার আড়াল হইতে কৌতুকপূর্ণ নেত্রে অরুণকে দেখে, যেন সে কোন অপরূপ জীব। একদিন ঘটনাক্রমে দুর্গা তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়াতে লজ্জায় পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল, তারপর অতি বেগে ছুটিয়া পালাইয়াছিল। ইহাতে অরুণের যেমন হাসি পাইয়াছিল তেমনি রাগও হইয়াছিল।

কিন্তু কি কারণে দুর্গা ছুটিয়া পালাইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলে, অরুণ আর জয়ন্তের বাড়ি যাইত না।

একদিন খাবারের পর পান চিবাইতে চিবাইতে পীতাম্বর তাঁহার গৃহিণীকে বলিয়াছিলেন—দেখ, আমাদের দুর্গার সঙ্গে অরুণের বেশ মানায়। কি বল? চেষ্টা করব?

স্বামীর সকল মতে সমর্থন করা মৃণ্ময়ীর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কোন আপত্তি বা তর্ক করা সেবিকার ধর্ম্ম নয়। কিন্তু মৃণ্ময়ী স্বামীর এই কথায় সায় দিতে পারিলেন না। নিজ পুত্রকন্যা সম্বন্ধে পিতামাতার এক বিচারহীন শ্রেষ্ঠত্ববোধ আছে। পীতাম্বর দুর্গাকে অরুণের বিবাহ-যোগ্যা ভাবিলেও মৃণ্ময়ী তাহা পারিলেন না। এই সুদর্শন নম্র বালকটির প্রতি তাঁহার কেমন গভীর স্নেহ জন্মিয়াছে। তিনি ধীরে বলিলেন—কি যে বল, অরুণ কত বড় ঘরের ছেলে, আর আমার মেয়ে ত পেত্নী।

পীতাম্বর রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অতি মিহি সুরে তিনি নিজ বংশের খ্যাতি ও গুণগরিমা এবং তালপুকুরের ঘোষ-বংশের অসচ্চরিত্রতার ইতিহাস সম্বন্ধে তুলনামূলক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। নানা কাজ বাকি থাকিলেও মৃণ্ময়ীকে দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল। সমস্ত বাসন মাজা বাকী। অবশেষে মৃণ্ময়ীকে স্বীকার করিতে হইল, এমন বংশে বিবাহ করা অরুণের মহাসৌভাগ্য। স্বামী যদি এ বিষয়ে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিবেন। ঠিক হইল, অরুণকে নিমন্ত্রণ করিয়া

একদিন দুর্গার হাতের রান্না খাওয়াইতে হইবে, অবশ্য মৃণ্ময়ীই সমস্ত রাঁধিবেন।

জয়ন্তের বাড়ির সম্মুখে আসিয়া অরুণ দেখিল বাড়ির দরজা বন্ধ। পীতাম্বর অতি ভীত প্রকৃতির মানুষ। তাঁহার বিশ্বাস কলিকাতার সকল গুণ্ডা ও চোরের দৃষ্টি তাঁহার বাড়ির ওপর।

দরজায় কড়াও নাই। অরুণ মৃদু আঘাত করিল, কোন সাড়া পাওয়া গেল না। জয়ন্তের ছোট ভাই মণ্টু এক হাতে কয়েকখানি ঘুড়ি ও অপর হাতে লাটাই লইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে আশান্বিত হইয়া দাঁড়াইল।

মণ্টু চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিয়া আসিল—অরুণদা, যাবেন না, দাদা বাড়ির ভেতর আছেন। দাদা! দাদা!

বন্ধ দরজায় মণ্টু দমাদম লাথি মারিতে লাগিল। বলিল—দাঁড়ান অরুণদা, বাড়ির সবাই একদম কালা, দরজা দেব একদিন ভেঙে!

বাড়ির মধ্যে এই ছোট ছেলেটি উন্মত্ত প্রাণে-ভরা; সে বিদ্রোহী, কাহারও কথা শোনে না, শাসন মানে না, আপন খুশীমত হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়; পাড়ার সকল দুষ্ট ছেলের সর্দ্দার। এই অশান্ত ভ্রাতাটিকে জয়ন্ত অত্যন্ত ভালবাসে। নিজের মধ্যে প্রাণের যে তেজ নাই, নিজ বালক-ভ্রাতার মধ্যে তাহা দেখিতে পাইয়া সে গৌরবময় আনন্দ উপভোগ করে; তাহার সকল অনিয়ম অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেয়। বালকের স্বাভাবিক ব্যবহার নিরোধ করিলে অমঙ্গল হয়, ইউরোপের এই আধুনিক শিশুশিক্ষানীতি তাহার জানা না থাকিলেও সে বুঝিয়াছে প্রাণের সহজ প্রকাশকে বাধা দিলে মানুষ সজীব স্বাধীন হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না, এই শাসন-অনুশাসনের পীড়নে সমস্ত জাতি স্বাধীনতা হারাইয়াছে।

জয়ন্ত দরজা খুলিয়া অরুণকে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল।

—আরে ভাই, তোর কথাই ভাবছিলুম, জানি তুই আসবি। একে বলে টেলিপ্যাথি।

—কাল স্কুলে যাও নি কেন?

—ও যে ভীষণ কাণ্ড কাল, ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ঘরে আয় বলছি।

জয়ন্তের 'ভীষণ' 'ভয়ঙ্কর'কে কেহ সত্যই ভীতিপ্রদ বলিয়া ভাবে না। সবাই জানে অতিরঞ্জিত করিয়া বলা তাহার অভ্যাস। সে আবেগের সহিত কথা বলে, নিজেকে কোন করুণ জীবন-নাট্যের ট্রাজিক অভিনেতা রূপে সকলের সম্মুখে পরিচিত করিতে সুখ পায়, সমবেদনার জন্য তৃষিত।

অরুণ ইচ্ছাপূর্ব্বক অতি গম্ভীর মুখ করিয়া বলিল,—কি ব্যাপার, আবার কোন নূতন দুর্ঘটনা? আমি কাল থেকে তোমার কথা ভাবছি।

উচ্ছ্বাসের সহিত জয়ন্ত বলিল—অরুণ, তুই সত্যি আমার বন্ধু! অরুণকে নিজের ঘরে বসাইয়া কোঁকড়া চুল দুলাইয়া হাত নাড়িয়া জয়ন্ত যে দীর্ঘ কাহিনী বলিল তাহার মর্ম্মাংশ এইরূপ—

দুই দিন হইল জয়ন্তের পিতা কামাখ্যাচরণের একখানি পত্র আসিয়াছে হরিদ্বার হইতে। তিনি জয়ন্তকে লেখেন নাই পীতাম্বরকে লিখিয়াছেন, এজন্য জয়ন্ত বড় ব্যথিত। কামাখ্যাচরণ লিখিয়াছেন, তিনি এক সন্ন্যাসী-দলের সহিত শীঘ্রই বদরিকাশ্রম যাইবেন, সেস্থান হইতে মানস-সরোবরে যাইবারও ইচ্ছা আছে। শেষে তিনি লিখিয়াছেন, রাধাবাজারের দোকানের তাহার অংশের সমস্ত উপস্বত্ব তিনি ত্যাগ করিয়া পীতাম্বরকে দিতেছেন, দোকানের একমাত্র মালিক পীতাম্বর, এ-বিষয়ে যথোচিত দলিল করিয়া পাঠাইলে তিনি সই করিয়া দিবেন। ইহা লইয়া পারিবারিক কলহ চলিতেছে। পীতাম্বরের ইচ্ছা ছিল, চিঠি সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু বলিবেন না, দলিলটি লুকাইয়া পাঠাইয়া দিবেন।

কিন্তু কোনরূপে চিঠিখানি মৃণ্ময়ীর হস্তগত হয়, তিনি সকল কথা জয়ন্তকে বলেন। কাল সে মেসোমহাশয়ের সহিত রীতিমত ঝগড়া করে, গালাগালি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। রাগ করিয়া অভুক্তাবস্থায় বাড়ি ছাড়িয়া সে চলিয়া যায়। সেজন্য কাল সমস্ত পরিবার উপবাসী ছিল; মাসীমা, ছোট ভাই-বোনেরা কেহই খাইতে চায় নাই। মণ্টু পর্য্যন্ত সারাদিন কিছু খায় নাই জানিয়া সন্ধ্যায় জয়ন্ত বাড়ি ফিরিয়া আসে। মাসিমা, দুর্গা, লক্ষ্মী সকলে তাহাকে ঘিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করে। অগত্যা তাহাকে রাতে এ-বাড়িতেই অন্নগ্রহণ করিতে হইয়াছে ও আপাততঃ বাড়ি-ছাড়ার সঙ্কল্পও ত্যাগ করিতে হইয়াছে। মেসো-মহাশয়ের সহিতও তাহার একটা বোঝাপাড়া হইয়া গিয়াছে। তাহার মাসীমা ও ভাইবোনদের ছাড়িয়া সে-ও থাকিতে পারিবে না। মেসো-মহাশয় বলিয়াছেন বটে তিনি এখন কোন দলিল পাঠাইবেন না, তবে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করা যায় না।

দীর্ঘ বৃত্তান্ত শুনিয়া অরুণ বলিল—তা হাঙ্গাম চুকে গেছে ত। অল্স্ ওএল্ দ্যাট এণ্ড্স ওএল্ (সব ভাল যার শেষ ভাল)। এখন চল কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক্, আমি আজ ঘুরে বেড়াবার মুডেতে আছি।

—হ্যাঁ, আমারও তাই ইচ্ছে করছে, মনটা ভাল নেই। আজ আমরা দু-জনে যাই চল।

অরুণ ভাবিল, দুই-জনে বেড়াইতে গেলে জয়ন্ত সমস্ত পথ তাহার দুঃখের কথাই বলিবে; বাণেশ্বরকে ডাকিয়া লইয়া যাইতে হইবে।

এই কিশোরদের নিকট বিপুল কলিকাতা নগর এক রহস্যপুরী। নানা অজানা পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহাদের অফুরন্ত উৎসাহ। তাহাদের মন উৎসুক, দৃষ্টি নবীন, অপরিচিতকে জানিবার অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় পূর্ণ।

চার-পাঁচ জন সহপাঠী লইয়া অরুণ প্রায়ই ছুটির অপরাহ্ণে কলিকাতার রহস্যোদ্ঘাটন করিতে বাহির হয়। মাণিকতলা খালের ধার; খাল-পারে কদর্য্য পল্লী, বৃহৎ বাগানবাড়ি, বিপুল গড়ের মাঠ, গঙ্গার ধার, খিদিরপুরের ডক; অজানা বস্তি, সংকীর্ণ বক্রগলিময় অপরিচিত পাড়া, পুরাতন গোরস্থান, কলিকাতার নানা অংশে তাহারা দল বাঁধিয়া বেড়ায়। জয়ন্ত হাত দোলাইয়া মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে; বাণেশ্বর তর্ক করে, ব্যঙ্গ করে, আদিরসাত্মক সংস্কৃত শ্লোক বলে; অরুণ তর্কে ফোড়ন দেয়, খাবার কিনিয়া খাওয়ায়; যতীন চুপ করিয়া চলে, মাঝে মাঝে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করে; হরিসাধন কুলীমজুরদের জীবন, বস্তির অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে। কোন পথিক, পথদৃশ্য, সামান্য কথা, তুচ্ছ ঘটনা লইয়া কত তর্ক, কৌতুক, হাস্য। এই কিশোরদের নিকট নগরের পথ, জন স্রোত, ট্রাম-মোটর ধ্বনি, তাহার কদর্য্যতা, বীভৎসতা সমস্তই নবীন সুন্দর কৌতুককর লাগে, এ যেন কোন নবদেশ-আবিষ্কারের আনন্দময় অভিযান।

বাণেশ্বরকে ডাকিয়া লইয়া অরুণ ও জয়ন্ত যখন ট্রাম-রাস্তার মোড়ে আসিয়াছে, দেখিল মোটা বৃন্দাবন এক বড় ঠোঙা হাতে তাহাদের দিকে আসিতেছে। অরুণের দলটিকে বৃন্দাবন ভয় করে না, সে জানে ইহারা পেটে ঘুঁষি মারিবে না। সে হাসিয়া বলিল—হ্যালো বয়েজ, এত নয়েজ ক'রে কোথায় চলেছিস্?

বাণেশ্বর উত্তর দিল—হ্যালো ফ্যাটি, মারবো চাটি, এত গপ্‌গপ্‌ করে কি খাচ্ছিস্?

বৃন্দাবনকে উত্তর দিতে হইল না। জয়ন্ত তাহার হাতের ঠোঙা ছিনাইয়া লইল, তার পর সকলে মিলিয়া টেপারি ও অবাক-জলপান

খাইতে লাগিল। বৃন্দাবন তাহাতে বাধা দিল না। তাহার ইচ্ছা, অরুণ তাহাকে বেড়াইবার দলে লয়।

সহসা বৃন্দাবন চেঁচাইয়া উঠিল—ওরে!

পথের মোড়ে হেড-পণ্ডিত মহাশয়ের ছাতা দেখা গেল, উদ্যত শিখা।

অরুণ বলিল—চুপ্। বৃন্দাবন, সামনে দাঁড়া আর বাণেশ্বর আমাদের পেছনে লুকিয়ে ব'স্।

বিপদ কাটিয়া গেল। পণ্ডিত-মহাশয় এক ট্রামে উঠিলেন। বাণেশ্বর হাসিয়া বলিল—এ জগতে কিছুই বৃথা নয়, ভোঁদাদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

অরুণ বলিল—এখন্ ঠিক কর কোন দিকে যাওয়া যায়। বিন্দে যাবি নাকি?

—নিশ্চয়। আমি বলি, চল ট্রামে।

—ও, তাহ'লেই হয়েছে। না বাপু, তোমার গিয়ে কাজ নেই, কিছুদূর গিয়ে বলবে কোলে কর। আমরা এখন সাত আট মাইল হাঁটব।

—সে আমি খুব পারি। একবার আমি দেওঘরে দশ মাইল হেঁটেছিলুম।

—আরে, এ দেওঘর নয়। এখন কোথায় যাওয়া যায়?

—যে পথে যায় চোখ চল সেই পথে।

—রাখ তোমার কবিত্ব পড়বে চাপা রথে, ওরে সরে দাঁড়া।

—আমি বলি, যে নূতন যুদ্ধজাহাজ এসেছে সেটা দেখে আসা যাক্।

—জাহাজে উঠতে দেবে? ভেতরে যেতে দেবে?

—তা দেবে না।

—জাহাজ দেখে কিন্তু চৌরঙ্গী হগ্ সাহেবের বাজার হয়ে আসব।

—না ভাই, আমাদের বোটানিক্যাল গার্ডেন যাবার কথা ছিল।

—বেশ, জাহাজ দেখে চাঁদপাল-ঘাট থেকে যাওয়া যাবে।

—আমি দেখিনি বোটানিক্যাল গার্ডেন।

—কি বা তুমি দেখেছ!

—কিন্তু আমার সঙ্গে ত বেশী পয়সা নেই।

—আমার আছে, এক টাকা—

হাপ্‌প্যাণ্টের পকেট হইতে বৃন্দাবন এক চক্‌চকে টাকা ও কতকগুলি খুচরা পয়সা বাহির করিল।

বাণেশ্বর বলিল—অচল টাকা নয় ত!

অরুণ কহিল—আমার ব্যাগেও কিছু আছে।

হিসাব করিয়া দেখা গেল ষ্টীমারে যাতায়াতের ভাড়া যথেষ্ট হইবে। চারি জন হাস্যে গল্পে পথ মুখর করিয়া চলিল।

কিছু দূর গিয়া বৃন্দাবন এক দেশী হোটেলের সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল—ভাই, কিছু চপ্‌-কাট্‌লেট কিনে নেওয়া যাক্‌। ফিরতে ত সন্ধ্যে, খিদে পাবে।

—কি পেটুক বাবা! চপ্‌-কাট্‌লেট কিনলে ষ্টীমারের ভাড়াটা কোথা থেকে আসবে শুনি?

—ও তাই ত। আচ্ছা, চার পয়সার চিনেবাদাম কেনা যেতে পারে।

আবার কিছুদূর গিয়া মুসলমানদের এক খাবারের দোকানের সামনে বাণেশ্বর থামিল। জয়ন্ত তখন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছে—সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া—

বাণেশ্বর গম্ভীর ভাবে বলিল—অরুণ তুমি সেদিন বলেছিলে, একদিন শিক-কাবাব খাওয়াবে।

জয়ন্ত ও বৃন্দাবন চমকিয়া উঠিল—শিক-কাবাব! মুসলমানের দোকানের!

—হ্যাঁ।

—কি মাংসের জান?

—জানি।

—তুমি খাবে?

—কেন খাব না?

অরুণ বলিল—না, না, পাগল নাকি!

বাণেশ্বর উত্তর দিল—আচ্ছা, আজ আমার সঙ্গে পয়সা নেই; দেখো, এক দিন খাব তোমাদের দেখিয়ে।

—তোর বাবা জানতে পারলে যে বাড়ি থেকে দূর ক'রে দেবেন।

—আমি কেয়ার করি না। আচ্ছা, আর চার বছর যাক্, তার পর সবার সামনে খাব।

—ছি।

—তুমি খাও নি ও মাংস?

—না।

—আচ্ছা, সেদিন যে ছকু খানসামা আমাদের স্যাণ্ড-উইচগুলি খাওয়ালে, সে কিসের মাংস বাবা?

—সে হ্যাম।

—ও, একদিন তুমিও খাবে দেখো। তোমার কাকা খান না?

—না, বাড়িতে খান না। ঠাকুমা তা হ'লে মনে কষ্ট পাবেন।

—আর আমাদের কষ্ট কে দেখে শুনি। বাবা হলেন ভাটপাড়ার পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ, স্থতরাং রোজ কেবল শাক-চচ্চড়ি ভাত খাও গব্য ঘৃত দিয়ে।

—আমরাও ত বাড়িতে মাছমাংস খাই না।

—চল্ চল্, কি পাগলামি করিস।

বাণেশ্বর সত্যই শিক-কাবাব খাইতে চায় না, কিন্তু পিতার অর্থহীন নির্ম্মম শাসনের বিরুদ্ধে তাহার অন্তরে যে বিদ্রোহের কালো মেঘ ঘনাইয়া ওঠে, এ তাহারই বজ্রগর্জ্জন। ঘরে মমতাহীন শাসন-বিদ্রূপ, অপমানিত আত্মা মূক থাকে; বাহিরে সে সারাক্ষণ ব্যঙ্গোক্তি কথা-কাটাকাটি করে। শিশু গাছ যেমন সোজা চলিয়া আলোক না-পাইলে আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, শিশুমনও তেমনই স্নেহ আনন্দের অভাবে অস্বাভাবিক বক্র হইয়া যায়।

যুদ্ধ-জাহাজ দূর হইতে দেখিতে হইল। পুলিস ঘাটের নিকট পাহারা দিতেছে। বৃন্দাবন কাহাকেও নিকটে যাইতে দিল না।

চাঁদপালঘাটে আসিয়া জানা গেল, পরবর্ত্তী ষ্টীমার আসিতে আধ ঘণ্টা দেরি। এক নৌকার মাঝি আসিয়া বলিল—আধ ঘণ্টার মধ্যে সে বোটানিক্যাল গার্ডেন পৌঁছাইয়া দিবে, ভাড়াও খুব সস্তা।

জয়ন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিল। বৃন্দাবন ভয় পাইল, কিন্তু আপত্তি করিতে সাহস করিল না। অরুণ ভাবিল, সকলেই সাঁতার জানে, ভয়ের কিছুই নাই। অরুণদের বাড়ীর পুষ্করিণীতে ছুটির সকালে প্রায়ই সন্তরণ-লীলা হয়। অজয়ই এ-সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী। বৃন্দাবনকেও ধরিয়া নাকে মুখে জল খাওয়াইয়া সাঁতার শিখাইয়াছে।

হল্লা করিয়া সকলে নৌকায় উঠিল। মাঝি পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। সমুদ্রগামী জাহাজগুলির পাশ দিয়া নৌকা তরতর করিয়া চলিল। সকলের বড় স্ফূর্ত্তি। শুধু বৃন্দাবনের বড় অসোয়াস্তি,

মাঝি তাহাকে বার-বার সাবধান করিতেছে, সে যেন ধারে হেলিয়া না বসে, তাহা হইলে নৌকা উল্‌টাইয়া যাইতে পারে।

জয়ন্ত গান ধরিল,—

আরে মন-মাঝি, তোর বৈঠা নে রে—
আমি আর বাইতে পার্‌লাম না!

কলের চিম্‌নী, ষ্টীমারের ধোঁয়া, ক্রেনে গাঁটতোলা, মাল-ভরা গাধাবোট, বণিক-সভ্যতা-কলুষিত কলিকাতার গঙ্গার ওপর অপরাহ্নের আলোকে কিশোরকণ্ঠে ভাটিয়ালী সুর যেমন বিসদৃশ তেমনই করুণ মনে হইল।

বোটানিক্যাল বাগানে সকলে খুব হল্লা করিয়া ঘুরিল; ডাব খাইল; ছুটোছুটি করিল; বড় বটগাছের উচ্চতা কত, তর্ক বাধিল। সকলে চপ-কাট্‌লেটের অভাব অনুভব করিল।

ফিরিবার সময় ষ্টীমারে আসা ঠিক হইল। ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া বৃন্দাবন কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—ভাই, আমার টাকা?

—টাকা! কি হয়েছে?

—আমার টাকা হারিয়ে গেছে, কোথায় পড়ে গেছে। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

—যেমন চাল ক'রে হাফপ্যাণ্টের পকেটে রেখেছিলি।

—কাঁদিস না, তোর নিজের টাকা ত?

—হ্যাঁ, মা দিয়েছিলেন। চল খুঁজিগে।

—কোথায় খুঁজবি এখন, এ ষ্টীমারে না যেতে পারলে রাত হয়ে যাবে ফিরতে।

অরুণ বলিল—আচ্ছা, আমি তোকে একটা টাকা দেব'খন।

—দেবে ভাই?

—বা, তুমি কেন দেবে? ভাব্‌না, চপ কিনে খেয়েছিল।

—আমার এত কল্পনা নেই, আমি ত কবি নই।

ষ্টীমার আসিয়া পড়াতে আর টাকার সন্ধান হইল না।

চাঁদপাল-ঘাটে সকলে পরিশ্রান্ত হইয়া নামিল। সঙ্গে ট্রামে ফিরিয়া যাইবারও পয়সা নাই।

অরুণ বলিল—চল হেঁটেই যেতে হবে।

বৃন্দাবন অতি শ্রান্ত, তার পর টাকা হারাইয়া বিমর্ষ। সে ভগ্নস্বরে বলিল—আমি আর হাঁটতে পারছি না।

—খুব যে দেওঘরে দশ মাইল বেড়িয়েছিলে।

—না ভাই, আমার নতুন জুতো, পায়ে ফোস্কা পড়েছে।

অরুণের মনে পড়িল মামীমা রাত্রে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ি ফেরা দরকার। সে এক ফিটন-গাড়ীর গাড়োয়ানকে ডাকিল।

গাড়োয়ানটি সন্দিগ্ধ স্বরে বলিল—বাবু পয়সা আছে ত? অরুণ গম্ভীরভাবে দরাদরি স্নুরু করিল।

পিছন হইতে কে ডাকিল—হ্যালো, অরুণ নাকি?

অরুণ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, নূতন স্নুন্দর মোটরকারের ষ্টীয়ারিং হুইল ধরিয়া বসিয়া কোটপ্যাণ্ট-পরিহিত এক যুবক তাহাকে ডাকিতেছে। সে মোটরকার চালাইয়া যাইতেছিল, অরুণকে দেখিয়া গাড়ী থামাইয়াছে।

যুবকটি বলিল—কোথায় যাবে—এস—

অরুণ তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিল না, ধীরে বলিল,—না থ্যাঙ্কস্‌, আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে, আমরা গাড়ী ঠিক ক'রে ফেলেছি।

—অল্‌ রাইট্‌।

ধূলি উড়াইয়া সশব্দে মোটরকার চলিয়া গেল। গাড়োয়ান আর ভাঁড়ার টাকার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করিল না। সকলে ফিটন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল—কে রে ছোক্‌রা? খুব চাল্।

অরুণের তখন মনে পড়িল, যুবকটিকে সে মামাবাবুর বাড়িতে কোন সন্ধ্যায় দেখিয়াছে।

গাড়ী ধীরে চলিল।

জাহাজের মাস্তুল, কলের চিমনীগুলির আড়ালে গঙ্গার পশ্চিম তীরে সূর্য্য অস্ত গেল। অরুণের মনে হইল সূর্য্যের এরূপ রক্তিম বর্ণ সে কখনও দেখে নাই।

সমস্ত পথ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পথ, মাঠ, জনস্রোত, প্রাসাদশ্রেণী সব যেন অবাস্তব, রঙীন স্বপ্ন।

গাড়ী যখন অরুণদের বাড়ির সরু গলির মধ্যে আসিয়া ঢুকিল, অন্ধকার আকাশ তারায় তারায় ভরিয়া গিয়াছে।

৭

কৈশোর যৌবনের সন্ধিকাল পরমাশ্চর্য্যকর। এ যেন হিমালয় গিরিশৃঙ্গে সূর্য্যোদয়। প্রথম অরুণরশ্মির স্পর্শে শুভ্র তুষারশৃঙ্গ রাঙা হইয়া ওঠে, পর্ব্বতের পাদতলে স্থির ধূসর মেঘস্তূপ আলোড়িত চঞ্চল হইয়া উড়ন্ত পাখীর ডানার মত কাঁপে, নবোদিত সূর্য্যের স্বর্ণধারা পান করিতে ঊর্দ্ধে উড়িয়া আসে, মেঘের সমুদ্রে কনকবর্ণের অপরূপ লীলা হয়, রঙীন মেঘগুলি তরঙ্গের মত তুষারশৃঙ্গের চারিদিক ছাইয়া ফেলে। তেমনি, কিশোর-অন্তরে যৌবনের অরুণোদয়ে দেহ-মনে কি বিচিত্র আলোড়ন, কত অপূর্ব্ব আশা, রঙীন কল্পনা, নব নব অনুভূতি। জীবনের এই অংশটি বড় রহস্যময়। কখনও অভূতপূর্ব্ব অনুভবে অন্তর আনন্দপূর্ণ, কখনও অজানা আশঙ্কা অস্পষ্ট ভাবনায় মন বিষন্নতাময়। কবিরা এই জীবনাবস্থাকে বসন্ত-প্রভাতের সহিত তুলনা দিয়াছেন। রাত্রে বৃক্ষগুলি পীতপত্রময়, পুষ্পহীন ছিল, ফাল্গুন প্রভাতে উঠিয়া দেখ, কুটীর-প্রাঙ্গণে আম্রবৃক্ষে নবমুকুল, রক্তকরবীকুঞ্জে রক্তিম পুষ্পোচ্ছ্বাস, বৃক্ষের শাখায় শাখায় বিকচোন্মুখ পুষ্পগুচ্ছ, পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে জাগরণের আলোড়ন।

কিশোর যখন যৌবনের দ্বারে আসিয়া পৌছায়, সে চমকিয়া ওঠে, বসন্ত-স্পন্দিত পৃথিবীর মত তাহার দেহে মনে প্রাণ-প্রকাশের আকুলতা জাগে, নব নব অনুভূতি লাভের তৃষ্ণায় সে চঞ্চল হয়। অপরিণত দেহ দিয়া নব বিকশিত প্রাণের পূর্ণশক্তি সে ধারণ করিতে পারে না, তরুণ অনভিজ্ঞ মন দিয়া সে বুঝিতে পারে না, তাহার জীবনে প্রকৃতি-লক্ষ্মী

কোন্ স্বপ্ন কোন্ মায়া-রূপ রচনা করিতে চায়। সে দিশেহারা, উদাস হইয়া যায়।

জীবনের এই কাল অনেকের পক্ষে সুমধুর নয়। যৌবন-সিংহদ্বারের প্রবেশপথ বেদনাময়। বাল্যের সরলতা সহজ চপলতা হারাইয়া কিশোর গম্ভীর হইয়া যায়। বালকদের দলে তাহার স্থান নাই, বয়স্করাও তাহাকে বয়সে বড় হইয়াছে বলিয়া মানে না। তাহার ইচ্ছা করে, সে খুব শীঘ্র বয়স্কদের সমান হইয়া ওঠে। এই গূঢ় ইচ্ছা নানা রূপে প্রকাশিত হয়। দাড়ি না থাকিলেও সে দাড়ি কামাইতে আরম্ভ করে, লুকাইয়া সিগারেট খাইতে শেখে, রূপকথা, ছেলেদের গল্পের বই ছাড়িয়া বয়স্কদের পাঠ্য উপন্যাস লুকাইয়া পড়ে।

তাহার মনে নানা বাসনা জাগে। রূপরসগন্ধভরা পৃথিবী সে ভোগ করিতে চায়। অনুভূতির শক্তি সূক্ষ্ম তীব্র হইয়া ওঠে। ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য-বোধ জাগে। অথচ স্বাধীনভাবে চলিবার কাজ করিবার পথ খুঁজিয়া পায় না, অত্যন্ত বেদনাপ্রবণ, আত্মাভিমানী হইয়া ওঠে। সামান্য অবিচারে সে অবমানিত, তুচ্ছ কারণে সে বিমর্ষ। বয়স্কদের শাসনে অবহেলায় সে সহজে বিদ্রোহ করে না বটে, কিন্তু অন্তরে রোষ সঞ্চিত হয়। বয়স্কদের ব্যবহার, জীবন-প্রণালীর বিচার করে। মনে মনে সঙ্কল্প করে, এই অত্যাচার, অপমান অধিক দিন সহ্য করিবে না। এ ক্রোধও বৈশাখের ঝড়ের মত ক্ষণস্থায়ী। একটু প্রেম, স্নেহ পাইলেই মনে করে তাহার জীবনের দুঃখ দূর হইয়া গেল।

অরুণ অনুভব করিল, কোন নিগূঢ় প্রাণশক্তি তাহার দেহে অপরূপ ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতে চায়, কিন্তু কোথায় যেন বাধা পাইতেছে, তাহার অপরিণত দেহ এই অপূর্ব্ব প্রাণের উপযুক্ত বাহক নয়। সে অনুভব করিল, কোন্ চিৎশক্তি তাহার চৈতন্যে আপন মহিমা প্রকাশিত

করিতে চায়, কিন্তু ক্ষুদ্র জ্ঞান ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া সে তাহার কতটুকু প্রকাশ করিতে সমর্থ! সে বুঝি ব্যর্থ হইল। এই উপলব্ধির ক্ষণগুলি দুঃখময়।

কোন প্রভাতে স্কুলের বই পড়িতে পড়িতে তাহার মনে হয়, তুচ্ছ এ পাঠ, সে কোন বৃহৎ কর্ম্মের জন্য এ পৃথিবীতে জন্মাইয়াছে, তাহার সাধনা, তাহার আয়োজন কই? পাঠে ধৈর্য্য থাকে না। প্রভাত উদাস হইয়া ওঠে।

ক্লাসে পাঠ শুনিতে শুনিতে সে আন্‌মনা হইয়া যায়। সে যে বন্দী। এ-স্কুলে সে কয়েদী, তাহার জীবনে কোন্ মহান্ উদ্দেশ্য সফল হইবে, তাহার জন্য সে কি সাধনা করিতেছে?

সন্ধ্যায় সে বাগানে একা ঘুরিয়া বেড়ায়। কত অমূলক আশা, অজানা স্বপ্ন জাগে। নিজ মনের এই সব অভিনব চিন্তায় নিজেই অবাক হইয়া যায়। এই সব অসম্ভব কল্পনা কোথায় সুপ্ত ছিল, আজ সুন্দরী বারুণীকন্যাদের মত অন্তর-সমুদ্রের অতলতা হইতে উঠিয়া তাহাকে ভুলাইতে আসিল।

কেবল সৎচিন্তা নয়, কুৎসিত সরীসৃপের মত কত অদ্ভুত কামনা অন্ধকার অন্তরগুহা হইতে বাহির হইয়া আসে, নিজকে অশুচি মনে হয়।

অরুণ ভাবে জীবন মহা দায়িত্বময়; মানবজন্ম সার্থক করিতে হইবে। স্কুলে যে-সকল উপদেশ শোনে, পুস্তকে যে-সকল নীতিকথা পড়ে, সেগুলি মহান্ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। বয়স্কদের জীবনযাত্রা তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীতে কত দুঃখ, কত পাপ। সে-সব দূর করিতে তাহারা কি করিতেছে?

মাঝে মাঝে অরুণের মনে সন্দেহ জাগে। হয়ত সে সব ভুল বুঝিতেছে। "শান্তিনিকেতন" "কর্ম্মযোগ" নানা বই অধিক পড়িয়া

মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। এই সকল নূতন চিন্তা সে নিজমনে গোপন রাখে, কোন বন্ধুর সহিত আলোচনা করিতে পারে না।

রাত্রে তাহার প্রায়ই ঘুম ভাঙিয়া যায়। গ্রীষ্মের অগাধ রাত্রি; চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা; গাছের পাতা নড়ে না; খোলা জানালা দিয়া দেখা যায় পাণ্ডুর আকাশে বৃহৎ শীতল চন্দ্র, নারিকেল তালগাছের পাতাগুলি নীলাকাশে কালো ছোপের মত; জনহীন অন্ধকার গলিতে গ্যাসের আলো জ্বলে, কদমগাছের শাখায় রহস্যময় অন্ধকার। অরুণের মনে হয়, কে যেন ওই গাছের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে ডাকিতেছে, কোন্ গোপন দুর্গম দুঃখময় পথে তাহাকে লইয়া যাইতে চায়। অরুণের ভয় হয়। চারিদিক বড় নির্জ্জন। সে বড় একা, গা ছম্‌ছম্ করে। চুপ করিয়া বিছানাতে শুইয়া থাকে। এক নিশাচর পাখী উড়িয়া যায়।

ধীরে শীতল বাতাস বয়। কদম্ববৃক্ষ মর্ম্মরিত হইয়া উঠে। অরুণ বিছানা হইতে উঠিয়া জানালার ধারে চুপ করিয়া দাঁড়ায়; বাতাস বড় স্নিগ্ধ, রাত্রি বড় শীতল। ভয় দূর হইয়া যায়। চোখে আবার ঘুম আসে। চন্দ্রমা যেন স্বপ্নতরী।

৮

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হইল। অরুণ বাঁচিয়া গেল। সে ঠিক করিল, নিয়মিত পাঠাভ্যাস ও শারীরিক ব্যায়াম করিয়া মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিবে। ছুটি হইতেই সে এক রুটিন করিয়া ফেলিল, প্রতিদিন ছয় ঘণ্টা স্কুলের বই পড়িবে; এক ঘণ্টা প্রতিমাকে পড়াইবে বা তাহার সহিত গল্প করিবে; এক ঘণ্টা নিয়মিত ভাবে বাগানে মাটি কাটা পুকুরে স্নান, ব্যায়াম; দুই ঘণ্টা বেড়াইবে, হাঁটিয়া গড়ের মাঠ যাইবে; আর এক ঘণ্টা রাখিল কবিতা লিখিবার জন্য।

সে কবি হইবে, ইহাই তাহার অন্তরের গোপন ধ্যান। মাঝে মাঝে সে কবিতা লিখিতে বসে, জয়ন্তের চেয়ে কিছু খারাপ লেখেনা। কিন্তু তৃপ্তি হয় না, আপনার অন্তরের ছন্দ, ভাষা সে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা ভাঙিয়া নূতন করিয়া সাজাইতেছে। কবিতাগুলি লিখিয়া সে ছিঁড়িয়া ফেলে। এই ফুল, পাখী, আকাশ, আলোক, প্রেম লইয়া সে কবিতা লিখিতে চায় না। সে হইবে জনগণের কবি; নবযুগের নবমানবের দূত; কলের মজুর, ডকের কুলি, জাহাজের খালাসী, গাড়ীর গাড়োয়ান গণ-মানবের সে জয়গান গাহিবে। হর্ম্যসঙ্কুল নগরের জনাকীর্ণ পথে যে কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত, তাহারই সংঘাত, বেদনা, আনন্দকে বাণীরূপ দিবে।

কিন্তু মুস্কিল, লিখিতে বসিলেই কবিতাগুলি ভাবপ্রবণ, হৃদয়োচ্ছ্বাসময় হয়, তাহার মনের নানা আশা বেদনার কথা হয়। ছন্দ ও ভাষা

রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার অনুকরণ হইয়া পড়ে। সে অবাক হইয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ তাহার আনন্দকর পাঠ্য, তাহার তরুণ জীবনের অংশ হইয়া গিয়াছে, তাহার মানসপ্রকৃতির সহিত নিগূঢ় যোগে যুক্ত।

এবার গ্রীষ্মে সে নূতন ভাবে কবিতা লিখিবে।

অজয় কিন্তু অরুণের সকল প্ল্যান উল্টাইয়া দিল।

সকাল হইলেই সে এক ভাঙা বাইসিকেল লইয়া হাজির হয়। অরুণকে পড়ার ঘর হইতে টানিয়া বাহির করে, বলে অরুণ তুই বড় কুণো হয়ে যাচ্ছিস, অত পড়ে না, চল্ সাইকেল-চড়া শিখ্‌বি।

অরুণ বাঁচিয়া যায়। পড়ায় তাহার মন লাগে না। প্রভাতের বহিঃপ্রকৃতি তাহাকে উন্মনা করিয়া তোলে।

বাড়ির সম্মুখে জনবিরল গলিতে সাইকেল-চড়া শিক্ষা আরম্ভ হয়। গাড়ীর চাকায় বিক্ষত সরু গলি সাইকেল চালানর পক্ষে সুবিধার নয়, কিন্তু নিকটে শিখিবার উপযুক্ত স্থানাভাব।

সাইকেল-চড়া শেষ হইলে পুকুরে স্নানের পালা। দীপ্ত সূর্য্যালোকে পুকুরের জল ঝিকিমিকি করে, গাছের ছায়া পড়ে; অজয় ও অরুণ দুরন্ত ধীবর বালকের মত জলে লাফাইয়া পড়ে, সাঁতার কাটে, চোখ লাল করিয়া উঠিয়া আসে। জলসিক্ত দেহে রৌদ্রে বসিয়া অরুণ এক অপূর্ব্ব আনন্দ পায়।

দুপুরে খাওয়ার পর সে প্রতিমার ঘরে গল্প করিতে বসে। প্রতিমার কোন সঙ্গিনী নাই, তাহাকে দেখাশোনা করা দরকার। বাজে কথা অনর্গল বকিয়া যাইবার কি অদ্ভুত ক্ষমতা প্রতিমার। শুনিতে বড় ভাল লাগে। কিন্তু কিছুক্ষণ গল্প করার পর প্রতিমা বলে, দাদা বড় ঘুম পাচ্ছে। প্রতিমার বিশ্রাম বিশেষ দরকার। যা রোগা সে।

অরুণ নিজের ঘরে আসিয়া কবিতার খাতা লইয়া বসে, যত আজগুবি কথা মাথায় আসে। আপন মনে হাসিয়া ওঠে। কবিতার খাতা রাখিয়া গল্পের বই লইয়া শুইয়া পড়ে—ডিকেন্সের টেল অফ্ টু সিটিজ, ডুমার থ্রী মাস্কেটিয়ার্স, বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ—নিঝুম-দুপুরে সে কোন্ কল্পলোকে চলিয়া যায়।

প্রতিমা ঘুমায় না। ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সে লুকাইয়া বাংলা ডিটেকটিভ নভেল পড়ে।

বিকালে অজয় আসিয়া অরুণকে খেলিতে বা ম্যাচ দেখিতে টানিয়া লইয়া যায়।

সাত দিনে অরুণ সাইকেল-চড়া শিখিয়া ফেলিল। তাহার স্পোর্টস্ প্রীতি দেখিয়া উৎসাহ দিবার জন্য শিবপ্রসাদ এক নূতন সাইকেল কিনিয়া আনিলেন। ঠাকুরমার আপত্তি টিকিল না।

নূতন গাড়ী আসাতে দুই বন্ধু দ্বিচক্রযানে কলিকাতা বিজয় করিতে বাহির হইল। বৈশাখের খররৌদ্রে তাহারা সাইকেলে লম্বা পাড়ি দিতে আরম্ভ করিল—বেহালা, দমদম, কত অজানা পথ, অপরিচিত শহরতলী; পথ ভুল হইয়া যাইত, পথ হারাইয়া ফেলিত, গাড়ী চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যাইত; বরফ-দেওয়া সরবৎ খাইয়া মহা উৎসাহে তাহারা ঘুরিত।

একদিন বালীগঞ্জ ছাড়াইয়া গড়িয়াহাটার নির্জ্জন পথে অজয় হঠাৎ সাইকেল থামাইল; পকেট হইতে এক সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই বাহির করিয়া অরুণের হাতে দিয়া বলিল, খুলে ধরা দেখি।

অরুণ বিস্মিত হইয়া বলিল, এ কি? তুমি এ-সব খাচ্ছ না কি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খোল্ না প্যাকেট। সিগারেট টানতে টানতে যখন জোরে সাইকেল চালাবি, দেখবি কেমন মজা লাগে।

—না ভাই।

—কি প্যান প্যান করিস।

অরুণ একটা সিগারেট বাহির করিয়া মুখে পুরিল। আগুন আর ধরিতে চায় না। দুই-তিনটি দেশলাই-কাঠি জ্বালিয়া বহু কষ্টে সিগারেট ধরাইল। দুই টান দিয়া কাশিতে লাগিল।

—ভাই, গলা জ্বালা করে।

—বাজে কথা, ও তোর ভয়, সিগারেট খেলে নাকি গলা জ্বলে? এত লোক খায় কি ক'রে!

অজয় নিজে একটা সিগারেট জ্বালাইয়া দু-এক টান দিল।

—চল্, সিগারেট টানতে টানতে খুব জোরে যাওয়া যাক।

কিছু দূর গিয়া অজয় বলিল, হল্ট্।

অরুণ বলিল, কি ব্যাপার?

সাইকেল হইতে নামিয়া সিগারেট ফেলিয়া অজয় বলিল, ঠিক বলেছিস্, খেতে মোটেই সুবিধের নয়। গলা খুস্‌খুস্ করে। ভাবিস না, আমি খাই। তবে একটা এক্সপিরিয়ান্স করা গেল।

দুই বন্ধু এক গাছতলায় বসিল।

দিন-সাতেকের মধ্যে সাইকেল-চড়ার সখ মিটিয়া গেল। গরমও দিন দিন নিদারুণ হইয়া উঠিতেছে। মামীমা আর দুপুরের রোদে বাহির হইতে দেন না।

অরুণের জন্য অজয়েরও ভয় করে। সে বড় অন্যমনস্ক হইয়া সাইকেল চালায়। চালাইতে চালাইতে হঠাৎ থামিয়া যায়। কোন পথিক, পথদৃশ্যের প্রতি বিস্মিত ভাবে চাহিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে চালাইলে কোন দিন বুঝি গাড়ীচাপা পড়িবে।

অজয় বিস্মিত ক্ষুব্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করে, কি হ'ল?

অরুণ লজ্জিতভাবে বলে, কিছু নয়, চল্।

অরুণ তাহার নবকাব্যের কথা ভাবে।

একটি কুলি মাথায় ভারী ঝাঁকা লইয়া চলিয়াছে, বোঝার ভারে ক্লিষ্ট দেহ আনত, কালো পিঠের পেশীগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে, দেহ ঘর্ম্মাক্ত, ক্লান্তমুখে দৃঢ় ধৈর্য্য। অথবা, বিরাট কালো লোহার কল-চাপানো মহিষের গাড়ী, কলের ভারে গাড়ী সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, মহিষগুলি প্রাণপণে গাড়ী টানিতেছে, পথের কোন গর্ত্তে চাকা পড়িয়া আটকাইয়া গিয়াছে, মহিষেরা টানিয়া তুলিতে পারিতেছে না, নীরবে চাবুকের মার খাইতেছে, দীর্ঘ চোখে করুণ বিহ্বল দৃষ্টি।

অথবা প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বের প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে। কোন ব্যাঙ্কের বাড়ি বা পাটের কোম্পানীর আফিস। কুলিরা মাটি কাটিতেছে, ইট বহিতেছে, রাজমিস্ত্রি দেওয়াল গাঁথিতেছে, গগনস্পর্শী লোহার ফ্রেম, লোহার মিস্ত্রি গর্ত্ত করিতেছে, আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে।

নানা দৃশ্যের সম্মুখে অরুণ হঠাৎ সাইকেল থামাইয়া ফেলে।

গরম অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রভাত স্নিগ্ধ থাকে, কিন্তু সমস্ত দিন সূর্য্যরশ্মি অগ্নিবাণের মত; আকাশ পিঙ্গলবর্ণ; অপরাহ্ণে ঈশানকোণে কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে, রুদ্রের তৃতীয় নয়নের ক্ষুব্ধ দৃষ্টির মত বিদ্যুতের ঝিলকি; ধূলা উড়াইয়া ঝড় ওঠে; বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামে। বৃষ্টি বেশীক্ষণ হয় না। দিবসের দাহ জুড়াইয়া যায়। পশ্চিমাকাশে রঙের ঘন সমারোহে সূর্য্যাস্ত হয়। তারাভরা রাত্রি বড় স্নিগ্ধ, অশ্রুধৌত কৃষ্ণনয়নের মত।

ঝড়ের সন্ধ্যাগুলি অরুণের অপরূপ লাগে। দেহের রক্ত ঝিলমিল করে। ঝড়ের শেষে প্রকৃতির প্রশান্তি তাহার সত্তাতেও সঞ্চারিত হইয়া যায়। ঝঞ্ঝা যেন করাঘাত করিয়া তাহার হৃদয়ের কোন গোপন দ্বার,

খুলিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যায়। সে অনুভব করে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সে কোন নিগূঢ় আনন্দ-সূত্রে বদ্ধ।

এ আনন্দ-মুহূর্ত্তগুলি সুখস্বপ্নের মত।

মাঝে মাঝে আবার বিষাদ। একদিন সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চমকিয়া উঠিল। মাথায় সে খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে, হয়ত অজয়কে ছাড়াইয়া যাইবে। কিন্তু এ কি তাহার মুখের শ্রী! এ যেন তাহার মুখ নয়, মুখোস! তারুণ্য, কমনীয়তা নাই, মুখ এত দৃঢ়, রুক্ষ হইয়া গিয়াছে। কোন্ নিরুদ্ধ ভাবাবেগে স্পন্দিত।

৯

ছুটির পর স্কুল খুলিল বর্ষার আরম্ভে। প্রথম দিন অরুণ একটু ভিজিয়া স্কুল গেল।

ক্লাসে ঢুকিয়া দেখিল, চালিয়াৎ চট্টোকে ঘিরিয়া ছেলেদের মস্ত সভা বসিয়াছে। চশমার কালো ফিতা দুলাইয়া প্যাণ্টের পকেটে হাত রাখিয়া অরবিন্দ বক্তৃতার সুরে কি বর্ণনা করিতেছে।

নাকুর অসুখ করিয়াছে। ঘুসঘুসে জ্বরে ছাড়িতেছে না। চালিয়াৎ চট্টো তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিল। বাড়িতে নাকু নাকি একেবারে আলাদা মানুষ। অরবিন্দের সঙ্গে তিনি এক ঘণ্টা গল্প করিয়াছেন; তাঁহার স্ত্রী অরবিন্দকে বাজার হইতে জলখাবার আনিয়া খাওয়াইয়াছেন।

বাণেশ্বর আর থাকিতে পারিল না, ব্যঙ্গের স্বরে বলিয়া উঠিল, ইলিশ মাছের সিঙাড়া, আঙুরের সরবৎ—যা, যা, সব মিথ্যে কথা, গাঁজা—

অরবিন্দ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, গাঁজা কি, তুমি গেছলে?

—না, আমি যাই নি। নাকুর অসুখ করেছে সত্যি, কিন্তু তোমার ঐ একঘণ্টা গল্প করা, খাবার খাওয়া, সব গাঁজা—আচ্ছা, বাড়ির নম্বর কত?

—নম্বর, এই—হ্যাঁ—নম্বর?

—হ্যাঁ, নাকুর বাড়ির নম্বর কত?

—নম্বর কে মনে রেখেছে, নম্বর হচ্ছে—

ক্লাসের সকলে হাসিয়া উঠিল,—বাবা, চাল দেখাবার জায়গা পাও নি। জয় বাণেশ্বর!

জয়ন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল। সে আর এক অসুখের খবর আনিল। ভূদো বৃন্দাবনের টাইফয়েড হইয়াছে। খবর শুনিয়া সকলে প্রথমে অবাক হইয়া গেল।

—কে ভূদো, এই যে সেদিন দেখলুম মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘুঘ্‌নি দানা খাচ্ছে।

—যাক্ এবার একটু রোগা হবে।

সকলে বিমর্ষ হইল। স্থির হইল দল বাঁধিয়া তাহাকে দেখিতে যাইতে হইবে। হেডমাষ্টারের গলা শোনা যাইতে সকলে বেঞ্চে গিয়া বসিল।

টিফিনের সময় জয়ন্তকে ডাকিয়া অরুণ বলিল, 'কুহু ও কেকা' পড়েছিস ?

—না, কা'র কবিতা বুঝি ?

—হাঁ, কবি সত্যেন দত্তের কবিতার বই। আমি কিনেছি।

—কবির নাম শুনেছি বটে। দিস্ ভাই পড়তে। ভাল ?

—খুব ভাল।

বাংলার এক নূতন কবিকে সে যেন আবিষ্কার করিয়াছে। অরুণ গর্ব্বিত ভাবে হাসিল।

স্কুলের দিনগুলি বৈচিত্র্যহীন কাটিয়া গেল; পূজার ছুটি পর্য্যন্ত একটানা পড়া কেবল পড়া। মেঘ ও রৌদ্রের লীলাময় বৃষ্টিমুখর দিনরাত সংস্কৃতের ধাতুরূপ, জ্যামিতির থিওরেম, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর খ্রীষ্টাব্দ, পড়া মুখস্ত করিয়া কাটিয়া গেল। 'কুহু ও কেকা'র সকল গান নীরব।

আশ্বিন মাসে পূজার ছুটি হইল।

অরুণ সঙ্কল্প করিল, এ-ছুটিতে সে রীতিমত পড়িবে। ম্যাটিক পরীক্ষার ফল ভাল হওয়া চাই। গ্রীষ্মের ছুটির মত হেলাফেলা করিয়া কাটাইবে না।

শিবপ্রসাদ ছুটিতে মুসৌরী গেলেন। পরীক্ষার বৎসর বলিয়া তিনি অরুণকে সঙ্গে লইলেন না। প্রতিমা একা যাইতে চাহিল না। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন, খোকা, খুব বেশী পড়িস না, রোজ বেড়াতে যাবি, মোটর-গাড়ী তোদের জন্য রেখে গেলুম, যত খুশী ঘুরে বেড়াবি।

মোটর-গাড়ী অরুণের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বে আছে জানিয়া অজয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। বলিল, এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, কি? কোথায় তোর বেড়াতে যাবার ইচ্ছে? অজয় বলিল, বেড়াতে যাবার কথা আমি বলছি না, আমি বলি, এই ছুটিতে হীরা সিঙের কাছ থেকে মোটর গাড়ী চালানো শিখে নেওয়া যাক্।

—মোটর চালানো! কি হবে?

—তোমার ছাই a^3+b^3 মুখস্থ করেই বা কি হবে?

মোটর ড্রাইভার হীরা সিং উৎসাহী যুবক। অলসতা অপেক্ষা এই বৃহৎ সুন্দর গাড়ীটি পথে চালাইয়া ঘুরিতে তাহার আনন্দ। জয়ন্ত তাহাকে দেখিলেই বলিয়া উঠে, পঞ্চনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে—হীরা সিং হাসিয়া মোটর-গাড়ীর বৈদ্যুতিক হর্ণ টেপে।

অজয় তাহার সহিত ভাব জমাইয়া লইল। বলিল, ঘোষ-সাহেবকে বলিয়া তাহার মাহিনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দিবে। হীরা সিং নব-বিবাহিত। অর্থের অসচ্ছলতার জন্য নবপরিণীতাকে কলিকাতায় আনিতেছে না। মাহিনা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা জানিয়া সে অরুণ ও অজয়কে মোটর-গাড়ী চালনার রহস্যবিদ্যা দান করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

সকালে দুই বন্ধু হীরা সিংকে লইয়া মোটরে গড়ের মাঠে চলিয়া যাইত, ঘোড়দৌড় মাঠের কাছাকাছি! শিখ-যুবক দুই কিশোরকে বর্ত্তমান যুগের যন্ত্রযানের রহস্যতত্ত্ব বুঝাইত; শরৎ-প্রভাতগুলি মোটর-গাড়ী চালানো শিখিতে কাটিয়া যাইত।

কোন কোন দিন অরুণ প্রতিমাকে সঙ্গে লইত। অরুণ যখন ষ্টিয়ারিং হুইল ধরিয়া বসিত, প্রতিমার কেমন ভয় করিত, সে হাসিয়া চেঁচাইয়া উঠিত, দাদা আমায় নামিয়ে দাও। তুমি কেমন চালাচ্ছ, আমি মাঠে দাঁড়িয়ে দেখব।

কিন্তু অজয় যখন মাঠে মোটর চালাইয়া যাইত, প্রতিমা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত, মাঝে মাঝে মুচকাইয়া হাসিত।

প্রতিমার ব্যবহারে অরুণ ব্যথিত হইত। মোটর-গাড়ী চালনার উত্তেজনায় কিছু বলিত না।

আইডিয়াটা চন্দ্রার।

চন্দ্রা একদিন বলিল, অরুণদা, তোমরা বাবা বেশ রোজ মোটর ক'রে বেড়াচ্ছ, আমাদের ত একদিন বেড়াতে নিয়ে যাও না।

—আচ্ছা, কাল নিয়ে যাব, কোথায় বেড়াতে যাবি ? আলিপুরের চিড়িয়াখানায় !

—ও দেখে পচে গেছে। চল কোথাও পিক্‌নিক্।

—শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন !

—না বাপু, সেদিন ত আমরা স্কুল থেকে গেছলুম। কোন একটা নতুন জায়গা, অনেক দূর।

—তোমার জন্যে নিত্য নূতন জায়গা এখানে কোথায় পাই।

চন্দ্রা তাহার পিতার শরণাপন্ন হইল।

হেমবাবু বলিলেন, তোমরা ব্যারাকপুরের পার্কে যাও, গঙ্গার ধার, সুন্দর বাগান, বেশ লম্বা ড্রাইভ হবে।

অরুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল, মামীমার কাছে গিয়া বলিল, মামী, তোমায় যেতে হবে।

—আমি বাবা কেমন ক'রে যাই, তোমার মামাবাবুকে রেখে।

—বা, উনিও যাবেন।

—ডাক্তার কি দেবে যেতে, নড়াচড়া বন্ধ, জ্বর ত যাচ্ছে না।

—কি সুন্দর হবে, এমন শরতের দিনে নদীর ধারে ওঁর খুব ভাল লাগবে, তুমি চল মামী।

—কবে?

—যেদিন বল।

—আচ্ছা, পরশু ঠিক কর: ডাক্তার বোসকে জিজ্ঞাসা করি।

উমা ধীরে বলিল, বেশ ত মা, তুমি যাও, ডাক্তার বাবু যদি বারণ করেন, আমি বাবার কাছে থাকব।

—না, না, তোরা সবাই না গেলে অরুণের ভাল লাগবে কেন!

—সত্যি নাকি অরুণ! কি চুপ ক'রে কেন?

—তুমি না গেলে আমাদের চা তৈরী করবে কে?

—তাই বই কি! আমি গঙ্গার ধারে গঙ্গার শোভা দেখতে যাচ্ছি, খালি হাওয়া খাব আর ঢেউ গুণব।

স্থির হইল সপ্তমীর দিন সকাল-সকাল খাইয়া সকলে বারাকপুরের পার্কে যাইবে। সঙ্গে ফোলডিং চেয়ার, সতরঞ্চি, চায়ের সরঞ্জাম ও প্রচুর খাবার নেওয়া হইবে।

কিন্তু যাইবার দিন সকালে হেমবাবুর জ্বর বাড়িয়া গেল। লীলারও ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি-কাশি। ব্যাপার দেখিয়া চন্দ্রা মুষড়াইয়া পড়িল। অরুণ যখন মোটরগাড়ী লইয়া আসিল, দেখিল তুমুল তর্ক চলিতেছে। হেমবাবু বলিতেছেন, তোমরা সবাই যাও অরুণের সঙ্গে, আমি বাড়ীতে একা বেশ থাকব।

স্বর্ণময়ী বলিতেছেন, বেশ ত ছেলেমেয়েরা যাক্, আমি যাব না।

শীলা বলিল, আমি যাব না বাবা, আমার বোধ হয় ১০০ জর, মা তুমি যাও।

স্বর্ণময়ী রাগিয়া উঠিলেন,—যা বাজে বকিস্ না।

চন্দ্রা মুখ ম্লান করিয়া ঘুরিতেছিল, অরুণকে দেখিয়া প্রফুল্লিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কই প্রতিমা দিদি ?

—সে মোটরে ব'সে আছে।

—বা, আচ্ছা, আমি নিয়ে আসছি ডেকে।

বহু কথা-কাটাকাটির পর স্থির হইল, অজয়, উমা ও চন্দ্রা যাইবে অরুণ ও প্রতিমার সহিত। স্বর্ণময়ী সব খাবার ঠিক করিয়া দিলেন। ড্রাইভারকে বলিয়া দিলেন, যেন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসে।

মেঘছায়াবৃত দিনটি। হাল্কা শ্লেট-রঙের মেঘগুলি আকাশ ছাইয়া চারিদিক স্নিগ্ধ আবছায়াময় করিয়াছে। অরুণরা যখন পার্কে আসিয়া পৌছাইল তখন অপরাহ্ণ। পার্ক সাহেব মেম নানা বিচিত্রবেশী দলে ভরিয়া গিয়াছে। চারিদিকে জনতা।

প্রতিমা বলিল, এমা, কি ভিড়। এখানে কোথায় বসবে, খাবে ?

অজয় বলিল, হীরা সিং চল ওদিতে, গঙ্গার ধারে নিশ্চয় খালি জায়গা পাওয়া যাবে।

উমা বলিল, না হয় গাড়ীতে ব'সে খাওয়া যাবে।

হীরা সিং গাড়ী ঘুরাইয়া নদীর ধারে বাংলো বাড়িগুলির দিকে চলিল। একটি খালি বাড়ির সম্মুখে মোটরগাড়ী থামাইল। গেট খোলাই ছিল। বাড়ীর মালী পলাতক। তাহার এক ছেলে বকশিসের লোভে ঘর হইতে চেয়ার টেবিল বাহির করিয়া নদীর তীরে বাগানে পাতিয়া দিল।

উমা এতক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসিয়াছিল। গাড়ী হইতে নামিয়া গঙ্গার উদার স্নিগ্ধ ধারার দিকে চাহিয়া তাহার মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল। হাস্যে গল্পে কৌতুকে সে উচ্ছ্বসিতা হইয়া উঠিল।

উমা বলিল, আচ্ছা খেয়ে নাও সবাই, তার পর বেড়ান যাবে। সে খাবার সাজাইতে বসিল। টিফিনের বড় বেতের বাক্স হইতে বাহির হইল স্যাণ্ডউইচ, কেক, সন্দেশ, লুচি, থার্মোফ্লাস্কে চা, নানা খাদ্যদ্রব্য।

অরুণ সাহায্য করিতে আসিয়া উমার ধমক খাইল, বেশী কর্ত্তাত্তি করতে হবে না, নিজের প্লেট নিয়ে খেতে বস।

প্রতিমা বলিল, আমার ভাই কিছু খিদে পায় নি।

উমা বলিল, সে সব চলবে না, এখন খেয়ে নাও ভাই। লক্ষ্মিটি। হৈ চৈ করিয়া খাওয়া শেষ হইল।

উমা বলিল, চল এবার বেড়িয়ে আসা যাক, ভারি সুন্দর জায়গা। অরুণ বলিল, বা তুমি কিছু খেলে না।

উমা হাসিয়া বলিল, বাবা, গিন্নিপনার চোটে গেলুম, আচ্ছা দাও একটা সন্দেশ।

প্রতিমা বলিল, আমি ভাই বসলুম, এমন সুন্দর বাগান, কোথায় যাবে বাইরে বেড়াতে—এই বাগানে খানিকটা ঘুরে চলে যাওয়া যাবে।

অজয় সায় দিল—আমারও উঠতে ইচ্ছে করছে না।

উমা চঞ্চলা হইয়া বলিল, ও, যেন কত ঘুরেছেন, এত পথ মোটরে ব'সে গা হাত পা ব্যথা করে না—চল, অরুণ, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

চন্দ্রা বলিল, দিদি, আমি?

—তুইও আয়।

অরুণ ও উমা এক সরু পথ দিয়া নামিয়া গেল। চন্দ্রা দিদির সহিত গেল না, প্রতিমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, প্রতিমাদি একটা গান গাও ভাই।

—বাবা, এখানে এসেও গান গাইতে হবে!

—গাও না প্রতিমা।

উমা ও অরুণ নদীর জলের কাছাকাছি পৌছিল। তীরে এক বৃহৎ বৃক্ষ। উমা গাছের তলায় গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসিল। অরুণ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

—ব'সো না অরুণ।

অরুণ একটু দূরে বসিল।

—ওই ধূলোয় ব'সো না, না-হয় এখানেই বসলে, ক্ষয়ে যাবে না—কি সুন্দর, গঙ্গা যে এত সুন্দর আমি জানতুম না।

—তুমি ত আসতে চাইছিলে না।

—আচ্ছা, বেশ; মেনি থ্যাঙ্কস্, আমার কি ইচ্ছা করে জান, গঙ্গার ধারে এমনি একটি ছোট বাংলো ক'রে থাকতে।

ওপারে আবছায়াময় তীরে ঘননীল মেঘের স্নিগ্ধ যবনিকা সরাইয়া দীপ্ত সূর্য্য প্রকাশিত হইল, নদীর জলধারা আলোকরশ্মিতে ঝলমল করিয়া উঠিল, মৃদু বাতাস বহিতেছে, চারিদিকে মায়াময় আলো!

উমার কিশোরী মুখের ডৌল অপরূপ লাবণ্যে উদ্ভাসিত, চক্ষে অপূর্ব্ব দীপ্তি নিষ্কাসিত অসিলতার মত, কণ্ঠে কি আবেগময় স্বর আসিল, প্রতিদিনের জানা উমার চারিদিকে এক স্বপ্ন-মায়া ঘিরিয়া আসিল, এ আনন্দ-স্পন্দিতা জ্যোতিঃলতা যেন কোন অপরিচিতা।

সৌহার্দ্দ্যের কণ্ঠে উমা ডাকিল, অরুণ!

—বেশ ভাল লাগছে?

—কি জানো, মনে হচ্ছে এই সুন্দর দৃশ্য আমি যেন কোন স্বপ্নে দেখেছি, এ যেন আমার জীবনের স্বপ্ন, এমনি গাছের স্নিগ্ধ ছায়া, নির্ম্মল ধারা, তার তীরে একটি কুটীর স্নেহের নীড়ের মত, তার ওপর তরুরেখা-ঘেরা উদার আকাশ, সূর্য্যালোকে ভরা উজ্জ্বল দিন, তারাভরা শীতল রাত' শান্ত জীবনধারা এই গঙ্গার সুনির্ম্মল স্নিগ্ধ স্রোতের মত, স্বপ্নের মত।

দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নদীর বক্রিম রেখার মত রেশমের শাড়ীর লাল পাড় কালো চুলে লুটাইয়া পড়িয়াছে, কয়েকটি চূর্ণকুন্তল চোখে-মুখে উড়িয়া আসিতেছে; ওপারের তীরভূমির প্রতি উমা উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া।

অরুণের মনে হইল এই শরৎ অপরাহ্ণের সোনার আলোয় বঙ্গমাতা এক কিশোরীর রূপ ধরিয়া গঙ্গার নির্জ্জন তীরে বৃক্ষছায়ায় মধুর উদাসিনী বসিয়া কোন ভাবী সুখশান্তিপূর্ণ সোনার যুগের স্বপ্ন দেখিতেছে। উমা যেন বাংলা দেশের প্রতিরূপ।

উমা হাসিয়া বলিয়া উঠিল, বড় কবিত্ব হয়ে যাচ্ছে—নয়—তুমি ত কবিতা লেখ।

অরুণ চমকিয়া বলিল, কে বললে?

—আমি জানি, আজকে, এই সন্ধ্যাটি বর্ণনা ক'রে একটি কবিতা লিখো।

—এ যে অবর্ণনীয়, কথায় আমরা কতটুকু প্রকাশ করতে পারি, আমাদের হৃদয়ের গভীর আশা বলতে পারি কি?

—ঠিক বলেছ, আমাদের হৃদয়ের গভীর আনন্দের বেদনার বুঝি ভাষা নেই।

পশ্চিমাকাশের কাঞ্চনবর্ণ মেঘপুঞ্জের আড়ালে সূর্য্য অস্ত গেল। নদীর জল রাঙিয়া উঠিয়াছে।

উমা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, চল, ওঠ, খুব কবিত্ব করা গেল। ওরা বোধ হয় ভাবছে, আমরা কোথায় হারিয়ে গেলুম।

অরুণ বলিল, সত্যি তুমি এমনি নদীর তীরে একটি কুটীরে থাকতে চাও?

হাসিয়া উমা বলিল, কি পাগল, সাধে কি তোমায় কবি বলে, জীবনটা স্বপ্ন নয় বুঝলে!

আবার সেই প্রতিদিনের জানা উমা। অরুণ ভাবিল, উমা তোমায় কোনদিন বোধ হয় বুঝিতে পারিব না।

সে নীরবে চলিল।

স্বপ্নের মত ছুটা শেষ হইয়া গেল। আবার স্কুল, একটানা পড়া, কেবল পড়া, একঘেয়ে জীবন।

নাকু অসুখ হইতে ফিরিয়া আসিলেন ; তাঁহার স্বভাব আরও রুক্ষ, তাঁহার দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হইয়াছে।

বৃন্দাবনও দীর্ঘদিন অসুখে ভুগিয়া আসিল। সে রোগা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা তাহাকে 'ভুদো' বলা ছাড়িল না।

পড়া! পড়া! কবিতার খাতা, ডায়েরি, ডিকেন্সের উপন্যাস, সব ডেস্কে চাবি দিয়া বন্ধ রহিল।

ডিসেম্বর মাসে টেষ্ট হইয়া গেল। টেষ্ট-পরীক্ষার ফল অরুণের তেমন ভাল হইল না। হেডমাষ্টার মহাশয় ডাকিয়া রীতিমত ধমকাইলেন।

পরীক্ষার ফি জমা দিয়া অরুণ আপিস হইতে বাহির হইতেছিল, কেরাণীবাবু তাহাকে ডাকিলেন, ওহে, তোমাদের ক্লাসের যতীন দত্তের কি হয়েছে বলতে পার?

—না, তার সঙ্গে বহুদিন দেখা হয় নি।

—ছোকরা টেষ্টে খুব ভাল মার্ক পেয়েছে, কিন্তু ফি ত জমা দিয়ে গেল না. কাল জমা দেবার শেষ দিন, খোঁজ নিও ত।

আপিস হইতে যতীনের বাড়ির ঠিকানা জানিয়া লইয়া অরুণ তখনই তাহার বাড়ি চলিল।

বাড়িটি কিছুদূরে, গলির পর গলি। একটি ছোট একতলা জীর্ণ বাড়ির সামনে আসিয়া সে নম্বর মিলাইল।

যতীন বাড়িতেই ছিল। অরুণকে বিশেষ সাদরে অভ্যর্থনা করিল না। ঘরে এক ভাঙা চেয়ারে বসাইল।

—তোমার অসুখ করেছে নাকি? স্কুলে যাও নি, কাল পরীক্ষার ফি জমা দেবার শেষ দিন।

—আমি জানি, আমি পরীক্ষা দিচ্ছি না।

—দিচ্ছ না কি রকম? তোমার টেষ্টের রেজাণ্ট খুব ভাল হয়েছে।

—কি হবে পরীক্ষা দিয়ে, তার চেয়ে একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা করলে।

—বা, পরীক্ষা তোমায় দিতেই হবে।

—না, আমি ঠিক করেছি, আমি দেব না।

—না, না, কি পাগলামি করছ।

তর্ক চলিল। যতীনের সঙ্কল্প অটল।

বাহিরে কে যতীনকে ডাকিল। অরুণকে বসিতে বলিয়া যতীন বাহিরে যাইতেই, পাশের দরজা খুলিয়া এক মহিলা ঘরে আসিলেন, মলিন থান-পরা, রুক্ষ কেশ, শীর্ণ দেহ।

অরুণ চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

—বস, বাবা, বস, আমি যতীনের মা।

অরুণ কোনমতে হেঁট হইয়া একটা প্রণাম সারিয়া লইল।

—থাক, বস, বাবা, তুমি যতীনের সঙ্গে পড়?

—আজ্ঞে হাঁ।

—আমার হয়েছে দায়। মরণও হয় না। তুমি ত এতক্ষণ বোঝালে, কি বললে, রাজী হ'ল?

—কেন ও ম্যাট্রিক দিতে চাইছে না?

—টাকা নেই, বাবা টাকা নেই। 'ফি'র টাকা দেয় কোথা থেকে? আমি বার-বার বললুম, আমার দু-চারখানা গয়না এখনও রয়েছে, তুই

তাই বেচে ফি জমা দে, তার পর জলপানি পেলে আমায় করিয়ে দিস—তা ছেলে যা গোঁয়ার—ওর বাবা ঠিক অমন ছিলেন, না হ'লে সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এক কথায় দেড়-শ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দেন।

—আচ্ছা আপনি ভাববেন না।

—হাঁ, বাবা, তুমি ওকে বুঝিয়ে বল, এত পড়লি, পরীক্ষাটা দে। কি হবে আমার গহনা। তুমি কিন্তু ব'লো না, আমি কিছু বলেছি।

যতীনের পদশব্দ শুনিয়া তাহার মা দৌড়িয়া চলিয়া গেলেন। অরুণ বলিল, যতীন, কাল স্কুলে 'নিশ্চয় এস। হেডমাষ্টার তোমাকে ডেকেছেন।

পরদিন স্কুলে অরুণ যতীনের জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিল। যতীন আসিল না। অরুণ আপিসে গিয়া যতীনের নামে ম্যাটিক পরীক্ষার ফি জমা দিয়া দিল। টাকাগুলি সে সরকার-মহাশয়ের নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছিল।

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, শীতের দিনরাতগুলি পরীক্ষার পড়ায় কাটিয়া গেল। নানা ঐতিহাসিক ঘটনার খ্রীষ্টাব্দ, য়্যালজ্যাব্রার ফরমূলা, জিওমেট্রির ভেরি ইম্পর্টেণ্ট থিওরেম ইত্যাদি ঘরের দেওয়ালে লিখিয়া দেওয়াল ভরিয়া তুলিল।

প্রথম দুই দিন অরুণ ভাল পরীক্ষা দিল। তৃতীয় দিন তাহার একটু জ্বর হইল। জ্বর লইয়াই পরীক্ষাগারে যাইতে হইল। শিবপ্রসাদ একটু ব্রাণ্ডি খাওয়াইয়া দিলেন। নিজে মোটর করিয়া তাহাকে পরীক্ষাগারে পৌঁছিয়া দিয়া আসিলেন। ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তরগুলি অরুণ যেন স্বপ্নের ঘোরে লিখিয়া গেল।

পরীক্ষা শেষ হইল। স্কুলের বই খাতা সব আলমারিতে পুরিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল। ওগুলি দেখিলে যেন আবার জ্বর আসিবে।

প্রতিমা বলিল, দাদা বন্‌-ফায়ার কর।

অরুণ উত্তর দিল, রোস, রেজাল্ট বেরুক।

আবার রৌদ্র-উদাস স্বপ্নবিহ্বল দিন, জ্যোৎস্না-পাণ্ডুর দক্ষিণ সমীর মর্ম্মরিত রাত্রি।

বাগানে ফুটিয়াছে সূর্য্যমুখী, স্থলপদ্ম, রঙ্গন, রক্তজবা ; পেয়ারা গাছে শুভ্র পুষ্পগুচ্ছ, আম্রমুকুলগন্ধে মৌমাছিরা উতলা। উমার গাওয়া একটী গানের সুরে দিনের প্রহরগুলি ভরিয়া ওঠে—'একি আকুলতা ভুবনে, একি চঞ্চলতা পবনে—'

গত বসন্তে অরুণের দেহে মনে যে পরমার্থকর পরিবর্ত্তনানুভূতি হইয়াছিল, এ-বৎসর সে অনুভূতি আরও বেগবান, আরও রহস্যময় হইয়া উঠিল। যৌবন-লক্ষ্মী এই কিশোরের দেহে মনে প্রেমলাবণ্যের মায়ামন্ত্র পড়িয়া দিলেন। অনিশ্চিতের কুহকভরা পথে সে শঙ্কিত আনন্দচিত্তে অগ্রসর হইল।

১১

কলেজ-জীবনের প্রথম দিন!

ভোরবেলা অরুণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাতে ভাল ঘুম হয় নাই।

জীবনের এই দিনটি বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করিতে হইবে। অরুণ তাড়াতাড়ি ছাদে গেল নবোদিত সূর্য্যকে প্রণাম করিতে।

বর্ষার প্রভাত মেঘাচ্ছন্ন। সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়া চারিদিক সজল স্নিগ্ধ। তালপুকুরের ওপারে নারিকেল বৃক্ষগুলির আড়ালে সূর্য্যোদয় হইল। যেন নিকষমণির পেয়ালা হইতে গলিত স্বর্ণস্রোত চারিদিকে উপচাইয়া পড়িতেছে। উচ্ছ্বসিত আলোকতরঙ্গাঘাতে পেয়ালা খান্‌-খান্‌ হইয়া ভাঙিয়া গেল। অরুণ অন্তরে গভীর আনন্দ অনুভব করিল।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সে কৃতিত্বের সহিত পাস করিয়াছে; পনর টাকা বৃত্তি পাইয়াছে; ইতিহাসে বিশেষ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। পরীক্ষার ফল এত ভাল হইবে, সে স্বপ্নেও আশা করে নাই।

ছাদে পড়িবার ঘরটি সে গোছাইতে আরম্ভ কা্রল। স্কুলের বইগুলি অনেক দিন হইল সরাইয়া ফেলিয়াছে, কতকগুলি বিলাইয়া দিয়াছে, কতকগুলি নীচে লাইব্রেরীর আলমারীর মাথায় রাখিয়াছে।

ছাদে পড়িবার ঘরটি ছোট। বইয়ের একটি আলিমারী আনিতে হইবে। লিখিবার একটি ছোট ডেস্ক আনিতে পারিলে ভাল হয়। কলেজের বই কোথায় কি ভাবে রাখিতে হইবে, অরুণ তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

দেওয়ালে কয়েকটি ছবি টাঙাইতে হইবে। কীটস্, শেলী, শেক্সপীয়ার, ইংরেজ কবিদের ছবি। বড় একটি পড়িবার ঘর পাইলে ভাল হয়। একতলার লাইব্রেরী-ঘরটি 'ষ্টাডি' করা যাইতে পারে, কিন্তু ঘরটি পুরাতন পুস্তক-ভরা বড় বড় আলমারীপূর্ণ, দেওয়ালে পিতৃপুরুষ-গণের অয়েলপেণ্টিংগুলি পুরাতন দিনের স্মৃতিভরা। তাঁহাদের পাশে শেলী, বায়রনের ছবি ঠিক মানাইবে না।

ছকু খানসামা আসিয়া জানাইল, সাহেব সেলাম দিয়াছেন।

অরুণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে, কাকা ?

—হাঁ জী।

—কোথায় !

—ডাইনিং-রুমে।

দোতলার রেনোয়া-রসেটি-দেগার চিত্রাবলী-সজ্জিত খাবার ঘরে শিবপ্রসাদ ব্রেকফাষ্ট খাইতেছিলেন। অরুণ প্রবেশ করিতে শিবপ্রসাদ বলিলেন—খোকা আজ তোর কলেজ খুলছে ?

—হাঁ, কাকা।

—তুই কি করবি, কিছু ভেবেছিস ?

প্রশ্ন শুনিয়া অরুণ বিস্মিত হইয়া গেল। রসেটি অঙ্কিত "দান্তের স্বপ্ন" ছবিটির দিকে চাহিয়া বলিল—আমি কি করব ? কেন—

—বস্ বস্ খোকা—খানসামা, খোকা-সাহেবকে একটা কাটলেট্ দেও।

—জী, হুজুর।

—দেখ্, এখন থেকে ঠিক করা দরকার, কি করবি।

—কেন, আমি ত এখন আই-এ পড়ব।

—সে ত জানি। আমি বল্ছি, জীবনে কি করতে চাস তোর "এম্ অফ লাইফ" কি ?

—বুঝেছি।

দেগার "নর্ত্তকী" জিজ্ঞাসুভাবে অরুণের দিকে চাহিয়া রহিল।

—দেখ্ এখন থেকে ভেবে ঠিক করা উচিত, জীবনে কি 'প্রফেসান' নিতে চাস।

—আচ্ছা, আমি ভাব্ব।

—আমার মত ব্যারিষ্টার হবার ইচ্ছে নেই আশা করি।

—আমি কিছু ঠিক করি নি।

—তোর যেরকম পড়ার সখ্ দেখি, প্রফেসার হ'লে মন্দ হবে না—কি বলিস, ইতিহাসের অধ্যাপক। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কাজ কর্বার আছে।

—না, প্রফেসার হ'তে আমার ইচ্ছে নেই।

অরুণ ভাবিল, যাহারা ইতিহাস সৃষ্টি করিতেছে, পুরাতন সভ্যতা ভাঙিয়া নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছে, সে তাহাদের দলে থাকিতে চায়। সে পুরাতন ঘটনাবলীর কথক হইবে না।

হয়ত সে কবি হইবে। দেশের চিত্তের বেদনাকে বাণী দিবে, নবসৃষ্টির প্রেরণা দিবে। নবসভ্যতার অগ্রদূত হইবে।

সে ধীরে বলিল—আচ্ছা, আমি ভাব্ব।

—আজকাল কোন্ প্রফেসার প্রেসিডেন্সীতে আছেন ?

অরুণ কাহারও নাম জানে না। কেবল, কবি মনোমোহন ঘোষের নাম শুনিয়াছিল।

—ইংরেজীতে মনোমোহন ঘোষ আছেন।

—কে ? অরবিন্দ ঘোষের দাদা ? অক্সফোর্ডে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমিও তখন ইংরেজী কবিতা লিখতুম। Oh, to be young, was heaven! দেখ্ খোকা, এদেশের কলেজ-জীবন বড়

একঘেয়ে। দিনরাত পড়াশোনা করিস নে, ছেলেদের মধ্যে যাতে সামাজিক জীবন গড়ে ওঠে তার চেষ্টা করবি।

—আমরা ত অনেক রকম প্ল্যান করছি, একটা ক্লাব করব।

—বেশ ভাল। তোর পড়ার ঘরটা বড় ছোট। নীচে লাইব্রেরী-ঘরটা তোর পড়ার ঘর করতে পারিস্। আর লাইব্রেরীর সব বই এবার তোর চার্জ্জে রইল।

শিবপ্রসাদ খানসামাকে ডাকিলেন। তাঁহার ঘর হইতে লাইব্রেরীর আলমারীগুলির চাবীর থোলো আনিয়া অরুণকে দিতে বলিলেন।

—খোকা, আমি সরকার মহাশয়কে ব'লে দিয়েছি, তোকে এক-শ টাকা বই কিনতে দেবেন। কলেজের বই কেনার টাকা ছাড়া এটা এক্সট্রা, কি বই কিনতে চাস্ একটা লিষ্ট ক'রে আমায় দেখাস্। আর তোর স্কলাশিপের টাকা তোর পকেট্-মানি রইল। গভর্ণমেণ্ট তোকে স্কলারশিপ দিয়েছে, আর আমি তোকে এই ফাউণ্টেন্-পেন আর রিষ্ট-ওয়াচ দিচ্ছি। কেমন পছন্দ?

অরুণ বিস্মিত হইয়া শিবপ্রসাদের দিকে চাহিল। তার পর তাড়াতাড়ি নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

—অলরাইট মাই বয়!

শিবপ্রসাদ মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। অরুণের মাতার কথা তাঁহার মনে পড়িল। আজ যদি দাদা ও বৌদিদি বাঁচিয়া থাকিতেন!

প্রতিমা চঞ্চলপদে গৃহে প্রবেশ করিল।

—দাদা, ঠাকুমা জিজ্ঞেস করছেন, তোমার কখন ভাত চাই?

—দেখ্ টুলি, কেমন সুন্দর ফাউণ্টেন-পেন্ আর ঘড়ি কাকা দিয়েছেন।

—বা কি সুন্দর ঘড়ি। দেখ কাকা, আমার হাতে ঠিক মানিয়েছে। বা, কাকা, আমার জন্যে কি—

—তুই ত মান্থ্‌লি পরীক্ষায় ফেল করেছিস।

—গানের পরীক্ষায় কে প্রথম হয়েছে ?

—আচ্ছা, একটা জিনিষ পাবি, ফাউণ্টেন্‌-পেন না ঘড়ি ? কি চাই ?

—আমার কিছু চাই না।

—আমি বুঝেছি, একটা ভাল শাড়ী চাই।

—যাঃ!

—আচ্ছা, গ্রামোফোন ?

—ঠিক্‌ বলেছ, কাকা, ঠিক্‌। আমি যা ভাবছিলুম।

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল—কাকা, তোমার সবচেয়ে প্রিয় কবি কে ?

—আমার প্রিয় কবি—ব্রাউনিং, ব্রাউনিং—Pippa Passes পড়েছিস—

The year's at the spring,
And day's at the morn ;
God's in his heaven—
All's right with the world !

শিবপ্রসাদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। হাঁকিলেন—বয় !

অরুণ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, স্কলারশিপের টাকা পাইলে কাকার জন্য একটি মরক্কোচামড়া-বাঁধন ব্রাউনিং ও টুলির জন্য একটি এম্বর-বর্ণের ফাউণ্টেন্‌-পেন কিনিয়া দিতে হইবে।

বয় আসিতে অরুণ বুঝিল, এবার কাকার মদের বোতলগুলি বাহির হইবে। প্রতিমাকে লইয়া সে খাবার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

১২

প্রেসিডেন্সী কলেজে অরুণের পিতা, পিতৃব্য, মাতুল সকলে পড়িয়াছেন। অরুণ যে প্রেসিডেন্সীতে পড়িবে, ইহা যেন তাহার শিশুকাল হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছিল।

কলেজ ষ্ট্রীটের উপর পুরাতন কলেজের বৃহৎ বাড়িটি অরুণের নিকট রহস্যপুরী ছিল। শুধু জ্ঞানের সাধনা নয়, ওখানে মুক্তির আনন্দ আছে। অরুণ কতদিন দেখিয়াছে, কলেজের ছেলেরা যখন খুশী কলেজে যায়, যখন খুশী কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসে, গেটের বৃদ্ধ দরওয়ান কাহাকেও আটকায় না, সবাইকে সেলাম করে। অনেক ছেলের হাতে কোন বই থাকে না, একখানি খাতা, নোটবুক। ক্লাসে সব দিন না গেলেও চলে। কলেজের বারান্দায় দাঁড়াইয়া গল্প করা যায়, প্রফেসাররা কিছু বলেন না।

কলেজ সম্বন্ধে স্কুলের ছেলেদের ধারণা অলীক স্বর্গের মত।

আজ সেই অপূর্ব্ব কল্পলোকের আনন্দ-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে।

কলেজে যাইবার জন্য অরুণ একটি জয়পুরী নাগরা অনেক খুঁজিয়া কিনিয়া আনিয়াছিল, সিল্কের পাঞ্জাবীও করাইয়াছিল।

সিল্কের পাঞ্জাবী পরিল না। লংক্লথের পাঞ্জাবী পরিল, নাগরা পরিল, নূতন ফাউণ্টেন পেনটি পাঞ্জাবীর পকেটে গুঁজিল, হাতে একটি বাঁধানো নোটবই লইল।

কলেজের গেট দিয়া ঢুকিয়া অরুণ দেখিল, দক্ষিণ দিকের করিডরে নবাগত ছাত্রদিগের জনতা। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্কুল হইতে নানা

আকৃতি ও প্রকৃতির ছাত্রদল। ছেলেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত। প্রতিস্কুলের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে দল গঠন করিয়াছে। এক দল অপর দলের প্রতি উৎসুক ও বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চাহিতেছে। কোন্ ছেলেটি কোন্ বিষয়ে প্রথম হইয়াছে, কে কত টাকার স্কলারশিপ পাইয়াছে—নানা আলোচনা, তর্ক, হাস্য, ব্যঙ্গ, কৌতুক। কলিকাতাবাসী ছাত্ররা বাহিরের ছেলেদের বেশভূষা চাল-চলন সম্বন্ধে পরিহাসপূর্ণ মন্তব্য করিতেছে। সকলে উৎসুক, চঞ্চল, অনর্গল কথা কহিতে ব্যগ্র। বসন্ত-প্রভাতে পুষ্পোদ্যানে মৌমাছি-দলের মত উতলা। যেন তাহারা কোন্ বিচিত্র দেশ বিজয়ের অভিযানে বীরদর্পে সমাগত।

অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় চকোলেট রঙের নূতন স্যুট পরিয়া ঘুরিতেছিল। তাহার চশমার কালো ফিতা আরও লম্বা ও চওড়া হইয়াছে। সকলের দিকে সে ব্যঙ্গদৃষ্টিতে চাহিতেছে। যেন সে কোন রাজ-মন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী, কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছে।

—হ্যালো অরুণ! আমাদের স্কুলের কাউকে দেখতে পাচ্ছি নে।

—অজয়কে দেখ্‌ছ?

—না। তুমি আই-এ, না আই-এস্‌সি?

—আমি আই-এ; অজয় আই-এস্‌সি।

—যাক, এক জনকে দলে পাওয়া গেল। ও! কনগ্রাচুলেশন্‌স! তুমি আমাদের স্কুলের মান রেখেছ, আর দ্বিজেন মিত্তির। দ্বিজেন খুব, একেবারে কুড়ি টাকার স্কলারশিপ মেরেছে।

—আর যতীন দত্তের নামও বল। ও কুড়ি টাকার পেয়েছে।

—সে আমাদের কলেজে আসছে?

—না, আমাদের কলেজে ভর্ত্তি হয় নি। সে রিপন কি বঙ্গবাসীতে ভর্ত্তি হয়েছে। ওখানে ফ্রি পড়তে পারবে।

আমাদের কলেজ! কথাগুলি সকলে কি গর্ব্ব ও আনন্দের সহিত উচ্চারণ করিতেছে।

—তা, আমাদের পুরানো স্কুলের অনেকেই এখানে ভর্ত্তি হয়েছে।

—হাঁ, দ্বিজেন, জয়ন্ত, সুহাস, বৃন্দাবন, মোহিত, বিকাশ, হরিসাধন।

—আর বাণেশ্বরের খবর কি?

—সেও ত ভর্ত্তি হয়েছে শুনেছি কিন্তু সে কোথায় উধাও হয়েছে, বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, কোন খোঁজ খবর নেই।

—ওই যে আমাদের কবি আসছে।

জয়ন্তের চুলগুলি আরও কুঞ্চিত ও দীর্ঘ হইয়াছে; পাঞ্জাবীটির বোতামগুলি পার্শ্বে; গলায় সাদা ধপধপে কোঁচানো চাদর। সে যে একজন উদীয়মান কবি, বঙ্গভাষার ভবিষ্যতের আশা, এ-বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিবে না।

অরবিন্দ জয়ন্তের করমর্দ্দন করিয়া বলিল—গ্রেট ডে, গ্রেট ডে, কবি কলেজ-বন্দনা লেখ।

জয়ন্ত বলিল—অরুণ আমি ভেবে দেখলুম, সংস্কৃত তোমার নেওয়া উচিত। আমিও সংস্কৃত নিচ্ছি। চট্টো সাহেব কি কি নিলে?

—আমার আই-এস্‌সি পড়বার বড় ইচ্ছে ছিল। বাবা বললেন, আই-সি-এস্‌ পরীক্ষা দিতে হবে, ইংরেজীটা ভাল ক'রে জানা দরকার, আমি তোমাদের দলেই।

বৃন্দাবন গুপ্ত আসিয়া হাজির হইল। সে আর হাফ্‌-প্যাণ্ট পরিয়া নাই, লালপাড় কোঁচানো দেশী ধুতি পরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু পুরাতন কোটটি আছে, হাতে একগাদা বই।

—হ্যালো ফ্যাটি!

—দেখ, এখানে ফ্যাটি-ফ্যাটি বলবে না।

—আহা চটো কেন।

—অরুণ কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্‌, আমার ভাই এগার মার্কের জন্তে স্কলারশিপ্‌টা হ'ল না।

—তোর যা অসুখ গেল।

—আচ্ছা, আমাদের "মাকাল ফল" ত ফেল করেছে।

—এই তৃতীয়বার হ'ল। ও আর পড়ছে না। আমাদের হেড-পণ্ডিত বলতেন না, বাবার আপিসে বেরুতে আরম্ভ কর, এবার তাই করবে।

—বাণেশ্বরের খবর কি ?

—সে না কি সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল।

—হাঁ বাণেশ্বর হবে সন্ন্যাসী !

—ওই বোধ হয় ঘণ্টা পড়ল।

ক্লাশে অরুণের পার্শ্বে একটি অপরিচিত যুবক আসিয়া বসিল। মল্লযোদ্ধার ন্যায় বলিষ্ঠ দেহ, কিন্তু মুখখানি অত্যন্ত শুচি; চিকন শ্যামবর্ণ। যুবকটি কলিকাতায় নবাগত, লাজুক প্রকৃতির।

অরুণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোন্ স্কুল থেকে পাস করেছেন ? যুবকটি চট্টগ্রাম শহরের এক স্কুলের নাম করিল।

চট্টগ্রাম ! কর্ণফুলী নদী ! অরুণের শৈশব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তখন তাহার পিতা পূর্ব্ববঙ্গের কোন শহরে ডেপুটি। এক ছুটিতে তাহারা কলিকাতায় না আসিয়া ষ্টীমার করিয়া চট্টগ্রাম হইতে রাঙামাটি গিয়াছিল। কর্ণফুলী নদী কি সুন্দর ! দুই তীরে ছোট ছোট পাহাড়, ঝাউবন। মধ্যে কর্ণফুলী নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। অরুণের

মাতা বলিয়াছিলেন, দেখ্ খোকা, কি সুন্দর দেশ! অরুণ বলিয়াছিল, 'ঠিক রূপকথার কেশবতী রাজকন্যার দেশের মত, নয় মা? আজ বার-বার তার মায়ের কথা মনে পড়িতেছে।

চট্টগ্রামের যুবকটিকে অরুণ বলিল—আমার নাম অরুণকুমার ঘোষ।

—ও, আপনি কি ইতিহাসে ঠিক আমার ওপর হয়েছেন?

—তা হবে।

—আমার নাম শিশিরকুমার সেন।'

কয়েকটি কথা। কিন্তু শিশিরের সহিত অরুণের বড় ভাব হইয়া গেল। দুই ঘণ্টা পড়ার পর এক ঘণ্টা ছুটি। কলেজ-জীবন কি মজার!

অরুণ শিশিরকে লইয়া প্রথমে কমন্-রুমে গেল। কমন্-রুমে গোলমাল, হৈ চৈ চীৎকার।

শিশিরকে লইয়া সে লাইব্রেরীতে গেল।

ক্লাসের ঘরগুলি দেখিয়া অরুণ হতাশ হইয়াছিল। বেঞ্চিগুলি স্কুলের বেঞ্চির মত, বসিবার তেমন ভাল বন্দোবস্ত নাই। জানালা দিয়া পথের ট্রাম মোটরগাড়ীর শব্দ আসে। কিন্তু লাইব্রেরী দেখিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইল। এ যেন স্বপ্ন! এমন সুন্দর লাইব্রেরী সে কখনও দেখে নাই। আলমারীর পর আলমারী, নূতন পুরাতন কত বই-ভরা! বসিয়া পড়িবার জন্য ছোট ছোট টেবিল, চেয়ার। জানালা দিয়া নির্ম্মল নীলাকাশ, সবুজ মাঠ দেখা যায়; ঘরটি স্তব্ধ, স্নিগ্ধ! সবাই নীরবে পড়িতেছে।

শিশিরকে লইয়া অরুণ সমস্ত লাইব্রেরী ঘুরিল। দুইজন পাশাপাশি দুই চেয়ারে বসিয়া ফিসফাস্ গল্প করিল। শিশিরও বই পড়িতে অত্যন্ত ভালবাসে। কে কোন্ বই পড়িয়াছে, কোন্ লেখক সম্বন্ধে কাহার কি মত, বহুক্ষণ আলাপ চলিল।

কলেজের শেষে অরুণ শিশিরকে বলিল—চল ভাই তোমার ঘর দেখে আসি।

—মোটেই ভাল ঘর নয়, বাতাস আসে না, আরও দু-জনের সঙ্গে থাকতে হবে। আমি একটা সিঙ্গল রুম পাবার চেষ্টা করছি। দুই জনে ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের দিকে চলিল।

কলেজের প্রথম সপ্তাহ উৎসুক, উত্তেজনা, কৌতুক, নবীনতার আনন্দে কাটিয়া গেল।

নূতন বই কেনা, নূতন বই পড়া, নূতন প্রফেসারদিগের সঙ্গে পরিচয় করা, নূতন ছেলেদের সহিত ভাব করা; স্কুলের পুরাতন সহপাঠিদের সহিত নূতন করিয়া ভাব করা।

বাড়িতে বই লইবার জন্য লাইব্রেরীর কার্ড পাইয়া অরুণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল। লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা লইয়া কি কি বই পাড়বে তাহার এক তালিকা করিয়া ফেলিল। কলেজের টেনিস-ক্লাবে ভর্ত্তি হইল।

কলেজ ষ্ট্রীটের পুস্তকের দোকানগুলি ঘুরিতে অরুণের উৎসাহের অন্ত রহিল না। কেবল মাত্র কলেজপাঠ্য পুস্তক কেনা নয়, নূতন ইংরেজী উপন্যাস কিনিতে, বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় লেখকদের বই কিনিতে তাহার পরম আনন্দ। কাকার দেওয়া এক শত টাকা সে প্রথম সপ্তাহেই খরচ করিয়া ফেলিল। দোকানে দোকানে ঘুরিয়া পুস্তক কিনিতে নূতন বন্ধু শিশির তাহার সঙ্গী হইল। সেও অনেক বই কিনিল। দু-জনে এক বই কিনিল না।

কলেজে ছুটির ঘণ্টাগুলি অরুণ লাইব্রেরীতে কাটাইত। মাঝে মাঝে জয়ন্ত তাহাকে কমন্ রুমে টানিয়া লইয়া যাইত। জয়ন্ত তাহার চারিদিকে একটি স্তাবক দল গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহাদের বাংলা-কাব্য সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিত; অরুণকেও মাঝে মাঝে তাহার বক্তৃতা শুনিতে হইত।

তখন ইউরোপে মহাসমর চলিতেছে। লাইব্রেরীতে এক প্রকাণ্ড কাঠের বোর্ডের উপর ইউরোপের একটি ম্যাপ পিন্ দিয়া আঁটা থাকিত। ম্যাপে নানা বর্ণের পিন্-যুক্ত ক্ষুদ্র পতাকা যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন পক্ষের জয়-পরাজয় নির্দ্দেশ করিত। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান, রুশ নানা জাতির বিভিন্ন রঙের পতাকা। যুদ্ধভূমিতে এক পক্ষ কতদূর অগ্রসর হইল, হারিয়া কতদূর পিছাইয়া পড়িয়াছে, কে কোন নগর ধ্বংস করিল, কোন্ দেশের কোন্ অংশ অধিকার করিল—যুদ্ধের প্রতিদিনের ইতিহাস ম্যাপের ওপর পতাকাগুলি আঁটিয়া দেখান হইত।

অরুণ লাইব্রেরীতে গিয়া প্রথমেই ম্যাপটি দেখিত। এতদিন ইউরোপীয় সমর তাহার নিকট অবাস্তব ছিল, এখন সত্য জীবন্ত হইয়া উঠিল। প্রতিদিন সে নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিল।

কেন যুদ্ধ হইতেছে? কেন এক জাতি অপর জাতির সহিত যুদ্ধ করে?

ইতিহাসে সে নানা যুদ্ধের কথা পড়িয়াছে। সে যেন প্রাচীন কাহিনী। উপন্যাসের মত।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সভ্য জাতিদিগের মধ্যে যুদ্ধ! প্রতিদিন নূতন গ্রাম ধ্বংস হইতেছে, নূতন নগর দগ্ধ হইতেছে, বড় বড় জাহাজ ডুবিতেছে, শত শত লোক মরিতেছে।

মানুষ যেমন পরস্পরকে ভালবাসে তেমনই পরস্পরকে ঘৃণাও করে। ভালবাসা যেমন সত্য, হিংসা-দ্বেষ তেমনই সত্য। প্রেমের মিলন যেমন সত্য, মৃত্যুর সংগ্রাম তেমনই সত্য। আজ যখন সে কলিকাতায় কলেজে বসিয়া বই পড়িতেছে, তর্ক করিতেছে, গল্প করিতেছে, তখন ফ্রান্সের যুদ্ধ ক্ষেত্র কামানের ধূমে অন্ধকার। ইংরাজের গুলিতে

জার্ম্মান মরিতেছে, জার্ম্মানের গুলিতে কত ফরাসী যুবক প্রাণ হারাইতেছে।

কিন্তু কেন এ যুদ্ধ ?

অরুণ শিশিরের সহিত আলোচনা করিত। দুই বন্ধু নানা তর্ক করিত। মানব-ইতিহাসের কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাইত না।

এক মাসের মধ্যেই কলেজ-জীবনের কোনও অপূর্ব্বতা রহিল না। অরুণ হতাশ হইয়া পড়িল। সে দেখিল, কলেজ-জীবন স্কুল-জীবনেরই শোভন সংস্করণ। সে মুক্তি, সে-স্বাধীনতা কোথায় ?

স্কুলে সকল ছেলের মধ্যে সহজ যোগ ছিল। কলেজে সকলে ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত, ছাত্রদের মধ্যে সেরূপ সরল বন্ধুত্ব নাই।

প্রফেসারগণ ছাত্রদের সকলকে চেনেন না। তাঁহাদের সহিত কোনও সামাজিক যোগ নাই। ছাত্রদের অভিযোগ, ব্যথা কিছুই জানেন না।

কলেজেও স্কুলের মত সাপ্তাহিক মাসিক নানা পরীক্ষা। ছেলেরা নিজেদের খুশীমত কিছু পড়িতে পারে না।

প্রথম মাসেই শিশিরের জ্বর হইল। বহু আবেদনের পর সে একটি আলাদা ঘর পাইয়াছিল। ঘরটি একতলায়, ছোট ও অন্ধকার, কাঠের দেওয়াল দিয়া বিভক্ত। স্বাস্থ্যকর চট্টগ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় এইরূপ বদ্ধ ঘরে বাস করিলে জ্বর ত হইবেই। প্রথম দিন জ্বরে শিশির সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। অরুণ অত্যন্ত চিন্তিত হইল। কলেজ কামাই করিয়া সমস্ত দিন শিশিরের শুশ্রূষা করিল। দ্বিতীয় দিন জ্বর কমিয়া গেল। শিশিরের বাড়ীতে আর টেলিগ্রাম করিতে হইল না। রাত্রে শিশিরের শুশ্রূষার সব ব্যবস্থা করিল।

এক সপ্তাহের মধ্যে শিশির সারিয়া উঠিল। অরুণ নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু কলেজ-জীবনে তাহার আর কোনও আনন্দ রহিল না।

আর একটি ঘটনায় অরুণের মন অত্যন্ত বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

বর্ষার রাত্রি। সমস্ত দিন অবিশ্রাম বৃষ্টি হইয়াছে। আকাশ মেঘাবৃত।

রাত্রে খাওয়ার পর অরুণ নীচে লাইব্রেরীতে বসিয়া শেলী পড়িতেছিল। দুঃখময় মানব-জীবন হইতে সে কাব্যের কল্পলোকে শান্তির আশ্রয় খুঁজিতেছিল; শেলী তাহার প্রিয় কবি হইয়া উঠিয়াছে।

একটি ভৃত্য মামীমার পত্র লইয়া আসিল। মামীমা লিখিয়াছেন, হঠাৎ মামাবাবুর ভয়ানক অসুখ হইয়াছে, অরুণ কি আসিতে পারিবে? অরুণ তৎক্ষণাৎ হীরা সিংকে ডাকিয়া মোটর বাহির করিয়া চলিল।

অজয়দের বাড়ি পৌঁছিয়া অরুণ দেখিল ব্যাপার খুব গুরুতর নয়। বিছানা হইতে জোর করিয়া উঠিয়া চলিতে গিয়া মামাবাবু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। এখন সংজ্ঞা আসিয়াছে তবে পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই। ডাক্তার বসু মামীমাকে বোঝাইতেছেন, ভয়ের কিছু নাই, রাত্রে থাকিবার জন্য একজন ছোকরা ডাক্তারকে তিনি পাঠাইয়া দিবেন।

অরুণকে দেখিয়া মামীমা মনে বল পাইলেন। রাত্রে রোগীকে কি ঔষধ দিতে হইবে, কিরূপভাবে শুশ্রূষা করিতে হইবে, ডাক্তারবাবুর নিকট হইতে অরুণ সব জানিয়া লইল। ঔষধ আনিতে অজয়কে মোটর গাড়ী করিয়া পাঠাইয়া দিল।

পাশের ঘরে চন্দ্রা চোখ লাল করিয়া ঢুলিতেছে, শীলা তখনও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। উমা প্রস্তরমূর্তির মত মামাবাবুর মাথার নিকট বসিয়া।

অরুণ উমাকে ধীরে বলিল—আমি মামাবাবুর কাছে বসছি, তুমি চন্দ্রা ও শীলাকে খাইয়ে এস। মামী, আমি আজ রাতে এখানে থাকব এখন। আমি খেয়ে এসেছি মামী, তুমি ওই চেয়ারটায় বস।

আধ ঘণ্টার মধ্যে মামাবাবু সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

গভীর রাত্রি। বৃষ্টি থামিয়াছে। আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। হেমবাবু শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছেন। বাড়ীর সকলে নিদ্রিত। অরুণ এক লম্বা ইজিচেয়ারে শুইয়াছিল, ধীরে উঠিয়া বারান্দার সম্মুখে খোলা ছাদে আসিল। ভিজা ছাদ; ফুলগাছের টবগুলি হইতে জল উপচাইয়া পড়িয়াছে। অরুণ রেলিংএ ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

আকাশ অন্ধকার। কালো মেঘের ফাঁক দিয়া একটি তারা জ্বলজ্বল করিয়া কাঁপিতেছে।

কে অরুণের পার্শ্বে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। অরুণ বুঝিল, সে উমা। ভিজা লোহার রেলিঙের উপর দুই হাত রাখিয়া উমা বলিল—তুমি ঘুমোও নি?

—না, ঘুম আসছে না। মামীমা ঘুমোচ্ছেন?

—হাঁ। মার আজ সারাদিন যা গেছে। ভাগ্যিস তুমি এলে।

—চিঠি পেয়ে আমি সত্যি বড় ভয় পেয়েছিলুম।

—এখন আর ভয়ের কিছু নেই, মনে হয়।

—হাঁ, আপাততঃ নেই।

দুইজনে চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিল।

সজল বাতাসে চামেলীর মৃদু গন্ধ আসিতেছে। পশ্চিম দিকে চন্দ্রের উদয় হইল, বক্র তরবারির মত। বারিস্নাত অন্ধকারময় ঘুমন্ত পৃথিবীর উপর ম্লান আলো বড় করুণ।

অরুণ ভাবিতেছিল মামাবাবু এ-যাত্রা রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি হয়ত আর বেশী দিন বাঁচিবেন না। হঠাৎ কোন্ দিন তাঁর মৃত্যু হইবে। তার পর কি হইবে? এ পরিবারের কি হইবে? টাকা তিনি বিশেষ কিছুই জমান নাই। তাঁর চিকিৎসার জন্ম প্রায় সব খরচ হইয়া যাইতেছে। তিনি মরিয়া গেলে এদের অবস্থা কি হইবে?

আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিল। কৃষ্ণ মেঘস্তূপে চন্দ্র তারা সব লুপ্ত হইয়া গেল।

অরুণ অনুভব করিল, এই নীরন্ধ্র অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সে যে-কথা ভাবিতেছে, উমাও সেই কথা ভাবিতেছে।

ধীরে সে বলিল—উমা যাও, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করগে।

কয়েক দিনের মধ্যে হেমবাবু বেশ সারিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় বেশী দিন বাঁচিবেন না, এই চিন্তা অরুণের মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

১৪

অরুণ পড়িবার একটি নূতন ঘর পাইয়াছে। ঘরটি দোতলায় পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে, তাহার শয়ন-গৃহের পার্শ্বে। শিবপ্রসাদ এ-ঘর চিঠি পত্তর লিখিবার জন্য ব্যবহার করিতেন।

ঘরটি অরুণ নূতন করিয়া সাজাইল। দেওয়ালে শেক্সপীয়র, শেলী ও রবীন্দ্রনাথের ছবি টাঙাইল। পুরাতন ছবিগুলির মধ্যে ওয়াট্সের "আশা" চিত্রখানি রাখিল। অন্ধ আশা পৃথিবীর গোলকের উপর বসিয়া মায়াময় রাগিণীতে কোন্ সোনার স্বপ্ন রচনা করিতেছে।

পূজার ছুটির আর বেশী দেরী নাই। শরতের প্রভাত। এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পড়িবার ঘরে ইজিচেয়ারে বসিয়া অরুণ জানালা দিয়া বৃষ্টিধোয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। হট-হাউসের ভাঙা কাঁচগুলির ওপর সূর্য্যালোক ঝিকিমিকি করিতেছে, কদম্ববৃক্ষের ঘন সবুজ দীর্ঘপত্রগুলি বাতাসে কাঁপিতেছে, দূরে কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের উপর শুভ্র মেঘস্তূপ সমুদ্রগামী বলাকা শ্রেণীর মত।

এ সুন্দর প্রভাত অরুণের মন উদাস করিয়া তুলিতেছিল। তাহার অন্তরে স্তরে স্তরে কোন বিষাদের অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাহাকে শান্তি দেয় না।

হিন্দু হোষ্টেলে শিশির সেনের অন্ধকার ছোট ঘরে প্রায়ই আড্ডা বসিত। চা-পান ও সিগারেটের ধূম-কুণ্ডলীর মধ্যে সাহিত্য, সমাজ,

রাজনীতি, জীবনের উদ্দেশ্য, সভ্যতার ভবিষ্যৎ, প্রফেসারগণের পড়ান, 'সবুজপত্রে' 'ঘরে-বাহিরে' নানা বিষয়ে তর্ক, আলোচনা, বক্তৃতা হইত। অরুণ ও শিশির এই দুইজনই আলোচনা-সভার নিয়মিত সভ্য। বৃন্দাবন, দ্বিজেন বা অরবিন্দ আসিয়া আড্ডায় মাঝে মাঝে যোগ দিত। যখন কেবলমাত্র অরুণ থাকিত তখন শিশির দীর্ঘ বক্তৃতা জুড়িয়া দিত। নীরব শ্রোতারূপে অরুণকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে। শিশির অরুণের অপেক্ষা অধিক বই পড়িয়াছে, তাহার স্মৃতিশক্তিও প্রখর, পঠিত পুস্তকগুলি হইতে নানা অদ্ভুত মতবাদ উদ্গারণ করিয়া সে নূতন বন্ধুকে তাক্ লাগাইয়া দিবার চেষ্টা করিত। বৃন্দাবন, অরবিন্দ অথবা জয়ন্ত থাকিলেই মুস্কিল হইত। তাহারা তর্ক করিত, ব্যঙ্গ করিত, স্বাধীন চিন্তার জয় ঘোষণা করিত। শিশির সহজেই রাগিয়া উঠে, পরিহাস বুঝিতে পারে না; ব্যঙ্গ করিতেও জানে না। তর্ক অনেক সময় ঝগড়া হইয়া দাঁড়াইত।

শিশিরকে লইয়া ক্লাসে অরুণের মুস্কিল হইত। ছেলেরা যখন জানিল শিশির সহজেই রাগিয়া ওঠে তখন তাহাকে রাগাইবার, অপদস্থ করিবার নিত্য নূতন ফন্দী বাহির করিত। ঝগড়া হইলে অরুণকে মধ্যস্থ হইয়া মিটমাট করিয়া দিতে হইত।

জয়ন্তের সহিত অরুণের যোগ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। জয়ন্ত কেমন বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার সহজ ভাব, সরল বেশভূষা নাই। তাহার অত্যুগ্র কবিয়ানা অরুণের ভাল লাগিত না।

জয়ন্তের কয়েকটি কবিতা একটি খ্যাতনামা মাসিক পত্রিকায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া এক অখ্যাতনামা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে জয়ন্ত যেমন ক্ষুব্ধ তেমনই গর্ব্বিত। সে বাস্তবের কবি, ভবিষ্যৎ যুগের অগ্রদূত, সেজন্য আজ সে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে; অরুণ বলিয়া-

ছিল, তোমার কবিতায় বাস্তবতা কোথায়? তুমি যত খুশী কবিতা লেখ, কিন্তু এখন ছাপিও না। অরুণের মত শুনিয়া জয়ন্ত শিশিরের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল শিশির সেনের সহিত মিশিয়াই অরুণের এরূপ ভাবান্তর হইয়াছে; অরুণের মত শিশিরের মতেরই প্রতিধ্বনি।

জয়ন্তের কবিতাগুলি অধিকাংশ নারী-প্রেমের কবিতা, তরুণ প্রেমিক-অন্তরের তপ্তবাষ্পভরা বুদ্বুদরাশি, তাহাতে আবেগের ফেনিলতা ও অলস কল্পনার প্রাধান্য আছে কিন্তু রসাত্মক সৌন্দর্য্য-রূপ নাই। মধ্যে মধ্যে নারীদেহের রূপবর্ণনা আছে। জয়ন্তের ধারণা, এই দৈহিক সৌন্দর্য্য বর্ণনাই বাস্তব, আধুনিক।

জয়ন্তের ইচ্ছা, অরুণ কবিতাগুলির প্রশংসা করিয়া তাহার কবি-যশ চারিদিকে প্রচার করে।

শিশিরের ঘরে অরুণ 'সবুজপত্র' হইতে 'ঘরে-বাহিরে' পড়িতেছিল, কতকগুলি মাসিক পত্রিকা ও একটি মোটা খাতা হাতে করিয়া জয়ন্ত আসিল, যেন যোদ্ধার বেশ।

উচ্চস্বরে সে বলিল—অরুণ আমার নূতন কবিতাগুলো পড়েছিস্, সবাই খুব প্রশংসা করছে। দেখ্ ওই ফুলের চাষ, ভাবের রঙীন ফানুষ-ওড়ান আর চলবে না; এটা বস্তুতন্ত্রের যুগ, সন্দীপ হচ্ছে এ যুগের হোতা। শিশির তোমার কি মনে হয়?

শিশির গম্ভীর ভাবে বলিল—তোমার কবিতা আমি ভাল ক'রে পড়েছি। আমার মনে হয় ও বাস্তব বা নবযুগের কবিতা নয়। তুমি রোমান্টিক ডেকাডেণ্ট্। হৃদয়ের তাপ ও আক্ষেপের সঙ্গে নারীর দেহ রূপ বর্ণনা করলেই বাস্তব হয় না।

—আমি ডেকাডেণ্ট্! হাসালে। আমার প্রতি কবিতা বাস্তব জীবনের গভীর অভিজ্ঞতা হ'তে—

অরুণ মৃদুস্বরে বলিল—অভিজ্ঞতা নয়, বল কাল্পনিক অনুভূতি। আমি জানি নারী ও প্রেম সম্বন্ধে তোমার কি অভিজ্ঞতা আছে।

জয়ন্ত রাগিয়া উঠিল। অরুণ তাহাকে পরিহাস করিতেছে! ব্যঙ্গ-স্বরে সে বলিল—না, তুমি ভাব অভিজ্ঞতা শুধু তোমারই আছে—অজয়ের বোনের সঙ্গে প্লেটোনিক প্রেম ক'রে যদি ভাব—

অরুণের মূর্ত্তি দেখিয়া জয়ন্ত চুপ করিল। লজ্জায় অরুণের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে সে দাঁড়াইয়া উঠিল। সজোরে জয়ন্তের গণ্ডে করাঘাত করিতে ইচ্ছা হইল। আপনাকে দমন করিয়া অরুণ স্থির হইয়া বসিল, তিক্ত স্বরে বলিল—দেখ জয়ন্ত, তোমার ওই রাবিশ কবিতার আলোচনা কর্‌বার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই; তুমি তোমার স্তাবক-দলের নিকট যাও।

একটি সিগারেট ধরাইয়া অরুণ জোরে টানিতে লাগিল।

—রাবিশ কবিতা! ঐ শিশির সেন তোমার মাথা খেয়েছে। আচ্ছা!

কবিতার খাতা ও পত্রিকাগুলি বগলে পুরিয়া জয়ন্ত হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রে জয়ন্ত অরুণের বাড়ীতে আসিয়াছিল। ব্যথিত স্বরে তাহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছে, তাহার হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। দুই বন্ধুর আবার মিলন হইয়াছে।

শরৎ-প্রভাতের দিকে চাহিয়া অরুণ গত সন্ধ্যার ঘটনাটি ভাবিতে-ছিল। বন্ধুত্বের সূত্র অতি সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া রচিত, একবার কোথাও ছিঁড়িয়া গেলে, তাহাতে মোটা তালি দিয়া জোড়া যায় না।

জয়ন্তের সহিত হয়ত সে আর পূর্ব্বের মত সহজ সরল ভাবে মিশিতে পারিবে না। হয়ত মিথ্যা বানাইয়া তাহার কবিতার প্রশংসাও করিবে।

বন্ধুত্বের অভিনয় করিতে হইবে। জীবন বড় জটিলতাময়। এই চিন্তাগুলির ভারে তাহার মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। কলেজ যাইতে ইচ্ছা করিল না।

প্রতিমা আসিল চঞ্চল পদে।

—দাদা, অ দাদা, বা বেশ ইজিচেয়ারে শুয়ে আছ—আজ কলেজ যেতে হবে না?

—না।

—আজ কিসের ছুটি?

—ছুটি নয়, আমি যাব না।

—বেশ আছ দাদা, কলেজে পড়ার ওই মজা, নয়? যেদিন খুশী গেলুম, যেদিন খুশী গেলুম না। ও, তোমার মুখ কি ফ্যাকাসে, অসুখ করেনি ত?

—না, বেশ ভাল আছি। হাঁ রে টুলি, তোর স্কুল নেই?

—বা, আজ শনিবার যে, তোমার কিছু মনে থাকে না, কি হয়েছে আজ?

—তোর খাওয়া হয়েছে?

—এখনও ঠাকুমার বড়ার অম্বল হয় নি, খাব কি!

—শোন্, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, চল কোথাও বেড়িয়ে আসি।

—বেশ সুন্দর দিন।

—মোটরকার এসেছে?

—ওই ত হর্ণ শোনা যাচ্ছে।

—হীরা সিংকে বল, গাড়ী যেন বাইরে রাখে।

—কোথায় বেড়াতে যাবে?

—ও, আজ একটা লম্বা ড্রাইভ।

কিছুক্ষণ পরে প্রতিমা হিল্‌-তোলা জুতার খট্‌-খট্‌ শব্দ করিতে করিতে আসিল; পরনে সবুজ-পাড়-ওয়ালা ধপ্‌ধপে সাদা শাড়ী।

—চল দাদা।

—এ কি, একটা রঙীন শাড়ী পর।

—না দাদা, এই বেশ, চল শীগ্‌গীর।

সাদা শাড়ী পরার এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য আছে, শরতের শুভ্র আলোকে হিল্লোলিত কাশগুচ্ছের অনুপম লাবণ্যের মত।

অরুণ বসিল সম্মুখে ষ্টিয়ারিং-হুইলে, তাহার পার্শ্বে প্রতিমা। হীরা সিং বসিল পিছনে গাড়ীর ভিতর।

গলি পার হইয়া তাহারা বড় রাস্তায় পৌছিল।

প্রতিমা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—দাদা, চল উমাদিকে নিয়ে যাই।

অরুণ গম্ভীর ভাবে বলিল—না।

—বা, না, কেন, আজকাল উমাদির নাম কর্‌লে তুমি এত গম্ভীর হয়ে যাও কেন?

—বেশী বাজে বকিস্‌ না।

—দাদা, আস্তে চালাও, আর একটু হ'লে এই গরুর গাড়ীতে ধাক্কা লাগত।

—তুই যা বক্‌ বক্‌ কর্‌ছিস্‌।

—ওই, ওই তোমার বন্ধু যাচ্ছেন!

সম্মুখের ফুটপাতে অজয় যাইতেছিল, হাতে একখানি নোটবুক।

অরুণ গাড়ী থামাইয়া ডাকিল—অজয়, অজয়!

—হ্যালো, কোথায় চলেছিস্‌? কলেজ?

—না, একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।

—মার্কেটিং?

—না। তুই আয় আমাদের সঙ্গে।

—আমি? আমার কেমিষ্ট্রির ক্লাস।

প্রতিমা হাসিয়া বলিল—রোজ যদি কলেজে যেতে হয় তবে আর কলেজে পড়ার মজা কি?

—টুলি ভাবে আমাদের কলেজ-জীবন খুব মজার।

—মন্দই বা কি।

—আয়, শীগ্‌গীর, ওদিকের দরজা খুলে উঠে আয়।

—আস্থন চলে। ওই ট্রামটা সাম্‌নে আস্‌ছে।

প্রতিমার কালো চোখের চাউনিতে কোন্ সুদূরের ইসারা। প্রতিমার কথা-বলার ভঙ্গীতে কোন্ সুর-সমুদ্রের আহ্বান। প্রতি-কথার শেষে প্রতিমা একটি ছোট টান দেয়, সুরের রেশের মত, কথা শেষ হইয়া যায় কিন্তু তাহার ঝঙ্কার বহুক্ষণ কানে বাজে।

অজয় দ্বিধা করিল না, প্রতিমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। অরুণ বেগে গাড়ী ছোটাইল।

অজয় জিজ্ঞাসা করিল কোন দিকে যাবে?

অরুণ হাসিয়া কবিতার সুরে বলিল—কিছু ঠিক নাই, চলিয়াছি ভাই অজানার সন্ধানে।

—চল যশোর-রোড্ দিয়ে।

কলিকাতা, শহরতলী পার হইয়া গ্রাম্যপথে পড়িতে মোটরগাড়ী যেন নাচিতে লাগিল। গরুর গাড়ীর চাকার বিক্ষত পথ, কোথাও বর্ষার জলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কোথাও গর্ত্ত। অরুণ গাড়ীর বেগ কমাইল।

পথের দুইধারে অপূর্ব্ব শারদশ্রী। শস্যপূর্ণ দিগন্ত-প্রসারিত ক্ষেত্র বাতাসে হিল্লোলিত, আলোকে ঝলমল। মাঝে মাঝে কদলী নারিকেল নানা তরু-ছায়াপ্রচ্ছন্ন ছোট ছোট গ্রাম।

প্রতিমা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—দাদা, কি সুন্দর!

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অজয়ের অনুভূতি সূক্ষ্ম নয়। মাঠ দেখিলেই তাহার মনে হয়, ইহাতে কয়টা ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার মাঠ হইতে পারে। কিন্তু আজ তাহার চোখে কে সৌন্দর্য্যের অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে।

কোন্ পথ দিয়া কোন্ দিকে কত দূর যে তাহারা চলিল, তাহার আর হিসাব রহিল না। শরৎ-মধ্যাহ্নের সোনালী আলোক ফেনিল মদের মত তাহাদের অন্তর-পেয়ালা ভরিয়া তুলিয়াছে। উন্মুক্ত আকাশের তলে শস্য-শ্যামল সুবিস্তৃত মাঠগুলি, ছায়াচ্ছন্ন স্বপ্নময় গ্রামগুলি মোটরগাড়ীর দুই ধারে সুন্দর ছবির অফুরন্ত ঝর্ণাধারার মত বেগে বহিয়া গেল।

অপরাহ্নে তাহারা এক বড় গ্রামের নিকট আসিয়া পৌঁছাইল। সম্মুখে বড় দীঘি।

—দাদা, এখানে মোটর থামাও, চল ওই গ্রামে যাওয়া যাক্।

—আরে অরুণ, গাড়ী থামা ত। বাণেশ্বরের মত কে ব'সে রয়েছে ওই দীঘির ধারে।

—বাণেশ্বর! এখানে? সে ত সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছে। গ্রামে যাইবার মেঠো পথে গাড়ী চালান শক্ত।

হীরা সিংহের জিম্মায় গাড়ী রাখিয়া সকলে গাড়ী হইতে নামিল।

অজয় দীঘির দিকে অগ্রসর হইল। কেয়া-বনের পাশে কে এক জন দীঘিতে ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। তাহার পাশে এক ছোট বালিকা মাছের টোপ তৈরি করিতেছে।

অজয় চীৎকার করিয়া উঠিল—আরে বাণেশ্বর! বাবা, এই তোমার সন্ন্যাসিগিরি হচ্ছে!

বাণেশ্বর ছিপ তুলিয়া অবাক হইয়া দেখিল—তাহার সম্মুখে অজয়, অরুণ ও তাহার বোন প্রতিমা।

—এ কি তোমরা? তোমরা এখানে!

—কলেজে আসার নাম নেই, গাঁয়ে ব'সে মাছ ধরা!

—মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।

—যা বলেছিস্ ভাই। গাঁয়ে খাবার সুখ আছে। এই গাঁয়ে আমার মাসীর বাড়ী।

—চল, গাঁয়ের ভেতর; বড় জলতেষ্টা পেয়েছে।

—খিদেও পেয়েছে মন্দ নয়।

—চল, মাসীমার ভাণ্ডারে অনেক রকম খাবার মজুত আছে।

—ভাই, মুড়ি আর নারকেল খাব, বেশ গেঁয়ো খাবার সব খাওয়ান চাই।

হৈ-চৈ করিয়া সকলে গ্রামে ঢুকিল। নিঝুম গ্রাম সচকিত হইয়া

বাণেশ্বরের মাসীমার ভাণ্ডার হইতে মুড়ি, মোয়া, পাটালি গুড়, রসকরা নানা খাদ্য বাহির হইল। কিন্তু ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, লুচি ভাজিতে বসিলেন।

গ্রাম দেখিতে প্রতিমার বড় মজা লাগিল। আঁকা-বাঁকা সরু পথ, প্রাচীন বটগাছ, চণ্ডীমণ্ডপ, পানা-ভরা পুকুর, পুকুরের ছোট ছোট ঘাট, খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল, গোবর-লেপা পরিষ্কার আঙিনা, ধানের গোলা, পানের বরজ, কড়াইসুটির ক্ষেত—এ যেন আর এক দেশ, স্বপ্নের রাজ্য।

যাইবার সময় বাণেশ্বরের মাসীমা পুকুরের মাছ, ক্ষেতের শাকসব্জী ও এক হাঁড়ি গুড় সঙ্গে দিলেন। অরুণরা তাঁহাকে জানাইয়া আসে

নাই বলিয়া বার-বার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আর তাহারা কখনও এ গ্রামে আসিবে ?

অরুণ বলিল—চল্ বাণেশ্বর আমাদের সঙ্গে, কি পাগলামি কর্‌ছিস্, কলেজে ভর্ত্তি হয়ে আসার নাম নেই।

বাণেশ্বর হাসিয়া বলিল—নিশ্চিন্ত হও। আস্‌ছে সোমবার থেকে যাচ্ছি। পরশু মা এসেছেন এখানে। বড় কান্নাকাটি করছেন। পিতার আদেশ অমান্য করা যায়, কিন্তু মাতার অশ্রুজল, বুঝতে পারছিস ত বাঙালী ছেলের পক্ষে—

হীরা সিংকে ফিরিবার পথের নির্দ্দেশ দিয়া বাণেশ্বর বিদায় লইল।

সে রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে প্রতিমা পথধূলিপূর্ণ চুলগুলি বহুক্ষণ ধরিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া আঁচড়াইল। হাস্য-কৌতুকপূর্ণ আনন্দাবেগময় আজিকার দিনটি তাহার হৃদয়ের কোন্ রুদ্ধ গোপন দ্বারে আঘাত করিয়াছে। আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল, সে অত্যন্ত সুন্দরী।

ধীরে সে অরুণের পড়িবার ঘরে গেল।

—দাদা, কি পড়ছ, ছাই, চল, ছাদে একটু বেড়াইগে।

—বা, এখনও ঘুমোস্ নি। সারাদিন টো-টো ক'রে ক্লান্তি নেই।

—ঘুম যে আস্‌ছে না।

—আচ্ছা, চল্ ছাদে।

—তোমার বেহালাটা নাও।

—গান গাইবি ?

—না বাপু, এখন গাইতে পারব না। তুমি বাজাবে, আমি শুনব।

—কি আবদার !

শরৎ-নিশীথের নিস্তব্ধ স্বপ্নময় শুভ্রতায়, নক্ষত্রলোকের অসীমতায়, কোন কণ্ঠ-সঙ্গীত নয়; এ অনির্ব্বচনীয় রাত্রে বেহালার সুদূর-প্রসারী সুর-তরঙ্গে ব্যাকুল অন্তরকে অজানা রহস্যময় পথে ভাসাইয়া দেওয়া।

৯৫

কিশোরীর চিত্তকে রূপকথার রাজকন্যার ঘুমন্ত রাজপুরীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এ যেন অপরূপ রাজপ্রাসাদ; তাহার কক্ষে কক্ষে কত মণি-মাণিক্য, বিবিধ বর্ণের রত্ন, কত বিচিত্র চিত্র, কারু-মূর্ত্তি; কত অপূর্ব্ব পশুপক্ষী, সুসজ্জিত সভাসদ, সালঙ্কৃতা দাসদাসী, সুকণ্ঠ গায়কবৃন্দ, তাহার দ্বারে দ্বারে বর্ম্মপরিহিত সৈনিকগণ মুক্ত তরবারি হস্তে। কিন্তু সকলেই সুষুপ্ত। প্রাসাদের গর্ভগৃহে মণিময় মন্দিরে হেমপ্রদীপ অন্ধকারে রহিয়াছে। রাজপুত্র আসিয়া যখন সেই প্রেমের প্রদীপ জ্বালাইবে, জাগিয়া উঠিবে রাজকন্যা, জাগিয়া উঠিবে রাজপুরী, চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল, জীবনকল্লোলধ্বনি জাগিবে।

তরুণ যুবকের অন্তর-লোক এই অপরূপ রাজপ্রাসাদ নয়। এ যেন পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক যুগের শ্যামল ছায়াঘন অরণ্য। এখনও চারিদিকে জল ও স্থলের বিভাগ স্থির হয় নাই। ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতে কোথাও পর্ব্বত ভাঙিয়া সমুদ্রের সৃষ্টি হয়, কোথাও সমুদ্রতল হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। অন্তর্নিহিত তপ্ত বাষ্পের আলোড়নে কত অচিন্ত্যনীয় তাণ্ডব-নৃত্য! চারিদিকে অবাস্তব ছায়া, অলীক মায়া। অদ্ভুত বৃহদাকার জন্তুগুলি উদাসীন ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা কে পক্ষী হইবে, কে স্থলচর অথবা সামুদ্রিক হইবে তাহা নির্দ্ধারিত হইতেছে না। অসম্ভব আশার মত বৃহৎ পক্ষ বিস্তার করিয়া সকল জন্তুই আকাশে উড়িতে চায়।

এই ছায়াঘন পথহীন অরণ্যে যদি একটি মন্দিরে একটি প্রেমের

প্রদীপ জ্বলিত, তাহা হইলে হয়ত মঙ্গল হইত। কিন্তু এখানে নানা শক্তির সংগ্রাম, নানা হৃদয়াবেগের সংঘাত, নানা ভাবুকতার অসম্ভব জটিল জালরচনা।

তরুণ যুবক ত কেবলমাত্র প্রেমিক নয়, সে যে বীর যোদ্ধা। সে বাহির হইয়াছে সত্যের সন্ধানে, সে করিতেছে শক্তির সাধনা, স্বাধীনতার জয়পতাকার সে রক্ষক। পুরাতন পৃথিবী ভাঙিয়া সে গড়িবে নূতন পৃথিবী, নব সভ্যতা। কেবলমাত্র প্রেম নয়, আরও জ্ঞান, আরও শক্তি, আরও যশ, আরও মানবকল্যাণ চাই, তবেই ত তাহার নারী-প্রেম সার্থক হইবে।

১৬

পূজার ছুটি আরম্ভ হইতেই অরুণ ছুটিতে পড়িবার পুস্তকগুলির দীর্ঘ তালিকা করিল। প্রায় পঁচিশখানি বই। অধিকাংশই ইতিহাসের বই। উপন্যাসের মধ্যে লইল, টলষ্টয়ের 'রেজারেকশন্'। একটি রুটিন করিয়া ফেলিল। আর হেলাফেলা নয়।

তাহার অশান্ত হৃদয়াবেগকে দমন করিবার জন্যই এই জ্ঞানের সাধনা।

ছুটিতে সে একা, বন্ধুহীন। শিশির চট্টগ্রামে চলিয়া গিয়াছে। জয়ন্তের সহিত আর সহজ সৌহার্দ্দ্য নাই; অধিকক্ষণ তাহার সহিত কথা কহিলে সে যেন হাঁপাইয়া উঠে। বাণেশ্বর তাহার মাসীর বাড়ি, মৎস্যভক্ষণের লোভে। অজয়কে বাড়িতে বড় দেখা যায় না, তাহার নূতন কয়েক জন বন্ধু হইয়াছে, তাহাদের সহিত সমস্ত দিন খেলা ও খেলার গল্প।

অরুণ এই নিঃসঙ্গ জীবনই চাহিতেছিল। তাহার মন অত্যন্ত বেদনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে।

ভাল না লাগিলেও প্রতিদিন অজয়দের বাড়ি একবার যাইতে হয়। হেমবাবুর মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে; বাড়ির সকলে কেমন গম্ভীর, বিষণ্ণ; চন্দ্রাও যেন হাসিতে লাফাইতে ভুলিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ির আবহাওয়ায় চাপা গুমোঠ ভাব। কবে যে হেমবাবু সারিয়া উঠিবেন, তিনি সারিবেন কিনা, কিছুই বোঝা যায় না। ডাক্তারদের আশ্বাসবাণী আর কেহ বিশ্বাস করে না। তাহার উপর অর্থাভাব।

অজয়দের বাড়িতে ঢুকিলেই অরুণ যেন শুনিতে পায়, ঘরের কোণে কোণে কাহারা যেন কাণাকাণি করিতেছে,—টাকা নাই। ছাদের ফুলের টবে শুষ্ক গাছগুলি দোলাইয়া মলিন পর্দা কাঁপাইয়া বাতাস বহিয়া যায়—টাকা নাই। মামীমার স্থির পাণ্ডুর মুখে, উমার দীর্ঘ কৃষ্ণ নয়নপল্লব-ছায়ায় উদাস ক্লান্ত সুর বাজে—টাকা নাই। কেহ মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না। নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করে না। গত মূর্চ্ছার পর হেমবাবুর জন্য একটি নার্স রাখা হইয়াছিল, তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, উমা স্কুলে আর যায় না, পিতার শুশ্রূষার ভার লইয়াছে। একটি চাকর কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সন্ধ্যায় বাড়িতে প্রবেশ করিলে অরুণ চমকিয়া ওঠে, নীচের ঘরগুলি অন্ধকার, উপরের ঘরগুলির আলোক ম্লান, যেন একটা চাপা আর্ত্তনাদ গুমরিয়া উঠে—টাকা নাই।

অরুণের ইচ্ছা করে, তাহার স্কলারশিপের টাকা মামীমার হাতে দেয়। কিন্তু সত্যই অর্থাভাব কি না, সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

অত্যধিক পাঠ ও নিঃসঙ্গ জীবনে বিষণ্ণতার ভারে অরুণের মন হয়ত অসুস্থ হইয়া উঠিত, প্রতিদিন নিয়মিত টেনিস খেলিয়া সে বাঁচিয়া গেল। বহুক্ষণ টেনিস খেলিয়া ঘর্ম্মাক্ত শ্রান্ত হইয়া যখন সে বাড়ি ফিরিত, মনের মধ্যে শান্তি অনুভব করিত।

সন্ধ্যায় প্রায়ই ছাদে বেহালাটি লইয়া বসিত। স্কলারশিপের টাকা জমাইয়া বেহালাটি কিনিয়াছিল; সঙ্গীত-চর্চ্চার জন্য নয়, অলসক্ষণে সুর লইয়া আপন মনে খেলা করা। শিবপ্রসাদ বলিয়াছিলেন, একজন ভাল ফরাসী বেহালাবাদক শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিতে চান। অরুণ রাজি হয় নাই। নিজের সাধনায় নিজের খুশীমত সে বেহালা শিখিবে।

ছুটির মাঝামাঝি অরুণ অত্যন্ত মানসিক শ্রান্তি অনুভব করিল। বৃথা এ গ্রন্থ-পাঠ। সব পড়া-শোনা সে ছাড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে

কবিতার বই লইয়া পড়িত। ইজিচেয়ারে শুইয়া শরতের আলো-ছায়ার দিকে চাহিয়া অবকাশপূর্ণ দিনগুলি নীলাকাশ-সমুদ্রের আলো-অন্ধকারে মাঝি-হীন তরীর মত আনমনা ভাসাইয়া দিত। তাহার চারিদিকে প্রকৃতি ও মানব-জীবন যেন কোন্ গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন।

এই সময় এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় তাহার জীবন ওলট-পালট হইয়া গেল।

সমস্ত দিবস প্রখর সূর্য্যতাপের পর অপরাহ্ণে আকাশ অন্ধকার হইয়া আসিল। ঝড় উঠিল। রুদ্রের তৃতীয় নেত্রের ধক্-ধক্ কম্পনের মত দিকে দিকে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল।

বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি নামিল। উষ্ণ বাতাস।

ঝড়ের শোভা দেখিতে অরুণ ছাদের ছোট ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। বৃষ্টি বেশীক্ষণ হইল না। পূর্ব্বাকাশে কতকগুলি কালো মেঘ জমিয়া রহিল। পশ্চিমাকাশের জলধৌত নীলিমায় সূর্য্যালোক নির্ম্মল, উজ্জ্বল। মায়াময় আলো। বারিস্নাত বৃক্ষগুলির পাতায় পাতায় উচ্চ নীচ লাল হলদে সাদা বাড়িগুলির দেওয়ালে ছাদের শ্রেণীতে স্তরে স্তরে যেন সৌন্দর্য্যের আগুন লাগিয়া গেল। চারিদিক ঝলমল, ঝিকিমিকি করিতেছে। পূর্ব্ব উত্তর কোণে স্নিগ্ধ সজল মেঘস্তূপের পার্শ্বে পুষ্করিণীর তাল নারিকেল শ্রেণীর মাথায় রামধনু উঠিল, অর্দ্ধেক আকাশ জুড়িয়া।

প্রাত্যহিক পৃথিবীর উপর হইতে বিষাদের কালো যবনিকা উঠিয়া গিয়া, অরুণের চক্ষুর সম্মুখে বিশ্বসংসারের কোন জ্যোতির্ম্ময় আনন্দরূপ প্রকাশিত হইল। সে বিমুগ্ধ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এ কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-দীপ্তি, আনন্দ-জ্যোতিঃ চারিদিকে বিচ্ছুরিত।

রাত্রির নিকষকৃষ্ণ পেয়ালা শত খণ্ডে ভাঙিয়া যেমন প্রভাত-সূর্য্যের রক্তিম আলোক-ধারা মত্ত বেগে চারিদিকে উপছাইয়া পড়ে তেমনই অরুণের অন্তরে এত দিন যে বিষাদ ও বেদনা স্তরে স্তরে জমিয়াছে, সেই অন্ধকার অন্তর-গুহা বিদীর্ণ করিয়া আনন্দ-প্লাবন প্রবাহিত হইল।

এ অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার অর্থ বুঝিবার মত পরিণত বুদ্ধি অরুণের ছিল না। সে শুধু অনুভব করিল, ক্ষান্তবর্ষণ আকাশ-নীলিমার নির্ণিমেষতায়, জলসিক্ত তরুপুঞ্জের শ্যামলিমায় এ কি অপরূপ আলো, এ কি জ্যোতির্ম্ময় সৌন্দর্য্য!

সে আর ছাদে থাকিতে পারিল না, পথে বাহির হইল। প্রাসাদ শ্রেণী, জনস্রোত, ট্রামের যাত্রী, মোটর-গাড়ীর প্রবাহ, সকল বস্তু রূপ শব্দ সে নূতন আনন্দে অনুভব করিল। চারিদিকে এ কি অপরূপ আলো।

উন্মত্তের মত সে রাস্তা দিয়া চলিল। পথের কোন নির্দ্দেশ রহিল না। এ কি সৌন্দর্য্য! তাহার ইচ্ছা হইল, পথের ঐ মুটেকে সে আলিঙ্গন করে, ঐ ভিখারীকে সে সর্ব্বস্ব দান করিয়া দেয়; ঐ মেয়েটির কি সুন্দর মুখশ্রী।

অরুণ নূতন নূতন অপরিচিত রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলিল। ধীরে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পথে গ্যাসের আলো জ্বলিয়া উঠিল। চলিতে চলিতে অরুণ কলিকাতার দক্ষিণ-প্রান্তে বালীগঞ্জের এক বৃহৎ মাঠের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছাইল।

সুবিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর, জনহীন, উদাস, প্রদোষান্ধকারময়। মধ্যে একটি প্রাচীন বৃক্ষ। অরুণ বৃক্ষটির নীচে ভিজা ঘাসের উপর বসিল। আনন্দময় সৌন্দর্য্যানুভূতির তীব্রতা আর নাই, চারিদিকে স্নিগ্ধ মাধুর্য্য।

মাঠ-ভরা তরল অন্ধকার। দেবদারু-ছায়াচ্ছন্ন রক্তিম পথের ওধারে ধনীদিগের প্রাসাদ ও উদ্যান স্তব্ধ। দূরে তরুশ্রেণীতে ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ। পূর্ব্বদিকচক্রবালে নারিকেল বৃক্ষগুলির অন্তরালে কয়েকটি বাড়ি হইতে আলো জ্বলিয়া উঠিল।

শূন্য অন্ধকার মাঠে অরুণ নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সে বড় একা, বড় অসহায়। তারার আলোকে এক পথহারা শিশু যেন অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া মাতৃহস্তের স্পর্শের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আকাশ তারায় তারায় ছাইয়া গেল। অরুণ অনুভব করিল, অসীম ব্যোম ভরিয়া অগণিত নক্ষত্রে যে প্রাণশিখা জ্বলিতেছে তাহারও জীবনে সেই প্রাণ স্পন্দিত। মাটির তৃণ হইতে আকাশের তারা এক গভীর আনন্দময় প্রাণসূত্রে বদ্ধ। সে আর একা নয়। বিশ্বজগতের যিনি দেবতা, তিনি তাহার সঙ্গী, তাহার বন্ধু হইলেন। সমস্ত চৈতন্য দিয়া সে কোন্ অতল স্পর্শ প্রাণ-সমুদ্রের শান্ত গভীরতায় নিমগ্ন হইয়া গেল।

ছুটির পর কলেজ খুলিল। শরৎ-সন্ধ্যায় কনক মহিমা ম্লান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সৌন্দর্য্যস্মৃতির আভায় চারিদিক রঙীন। দিনগুলি যেন আনন্দ-পদ্মের এক একটি পাপড়ি। জয়ন্ত, শিশির, বাণেশ্বর, অরবিন্দ, সকলকেই তাহার ভাল লাগে। সকলের সহিত সে হৈ-চৈ করিয়া গল্প করে, উচ্ছ্বসিত হাস্য করে; সকলে মিলিয়া একটি ক্লাব করিবে, এক সাহিত্যিক পত্রিকা বাহির করিবে, নানা জল্পনা করে।

৮৭

অরুণ বাড়িটির নাম দিয়াছিল "সোনার স্বপ্ন"। পরবর্ত্তী জীবনে এই বাড়ির কথা যখন সে বন্ধুদের বলিয়াছে, তাহারা হাসিয়া উঠিয়াছে, "সোনার স্বপ্ন নয়, ওটা তোমার দিবাস্বপ্ন।"

অরুণের অনেক সময় সন্দেহ হইয়াছে, হয়ত সে সত্যই স্বপ্ন দেখিয়াছিল। শীত-অপরাহ্নের সোনালী আলোয় তাহার মগ্নচৈতন্য কোন মায়াজাল বুনিয়াছে, হয়ত এ-বাড়িটি তাহার নিঃসঙ্গ মনের মরীচিকা।

ঘটনাটি এইরূপ—

মাঘ মাস। শীত শেষ হয় নাই। সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে বসন্তের বাতাস বয়।

ছুটির দিনে অপরাহ্নে অরুণ প্রায়ই কলিকাতার পথে বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়ে। কোন সহপাঠী বন্ধু সঙ্গে থাকে না। এখন সে একা নয়, সৌন্দর্য্যময়ী কল্পনা তাহার সঙ্গিনী।

ঘুরিতে ঘুরিতে অরুণ বালীগঞ্জের দক্ষিণপ্রান্তে আসিয়া পড়িল। সর্পিল জনহীন পথ, তরুছায়াবৃত ; মাঝে মাঝে বস্তি ; কোথাও পানাপুকুর, বাঁশঝাড় ; ধনীদিগের প্রমোদ উদ্যান। শীত-অপরাহ্নের আলো অতিসূক্ষ্ম মসলিনের অবগুণ্ঠনের মত জল স্থল আকাশ আবৃত করিয়াছে,—অজানা, অস্পষ্ট, রহস্যময়।

অরুণ এক খোলা মাঠের সম্মুখে আসিয়া পৌছাইল। অদূরে এক দোতলা বাগান-বাড়ি, উঁচু দেওয়ালে ঘেরা। পুরাতন হলদে দেওয়াল কাঁচা সোনার মত আলোয় ঝকমক করিতেছে। সোনার দেওয়াল

ভরিয়া মাধবীলতা, অপরাজিতা-লতা পথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

ছোট একটি কাঠের দরজা, সবুজ রঙের, বন্ধ। দীর্ঘ প্রশস্ত দেওয়ালে এই ছোট দরজা দেখিলে মনে হয়, যেন কোন গুপ্তদ্বার।

মন্ত্রচালিতের মত অরুণ দরজায় আঘাত করিল, দরজা খুলিয়া গেল ; মরচে-পড়া কব্জার শব্দে সে চমকিয়া উঠিল।

সম্মুখে মরকতশ্যাম তৃণাস্তরণ ; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রক্তিম পথ সোনার প্রাসাদের অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে ; পথের দুই পার্শ্বে মনোহর ক্রীড়াশৈল, পুঞ্জিত লতাবিতান, স্তব্ধ নিকুঞ্জ। শ্যামল তৃণভূমিতে নানা অপরূপ বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত, ক্রিস্থান্থেমাম্, মার্সেল নীল, য়্যামারেন্থাস্, কত অজানা বিদেশী ফুল।

দুইটি বালিকা ছুটিয়া আসিল হাস্যচঞ্চল চরণভঙ্গীতে, গ্রীষ্মের গুমোট সন্ধ্যায় অকস্মাৎ দক্ষিণ-বাতাসের মত। যেন মাটি হইতে দুটি ফুল ফুটিয়া উঠিল অরুণকে অভ্যর্থনা করিতে। তাহাদের বয়স সাত কি দশ হইবে। অরুণের মনে নাই, তাহারা সাড়ী পরিয়াছিল না ফ্রক পরিয়াছিল। তাহার শুধু মনে পড়ে, এক জনের বসন ছিল চাঁপাফুলের রঙের, আর এক জনের ছিল রক্তকরবীর মত।

কেশে গোঁজা প্যান্সি ফুল দুলাইয়া একটি বালিকা বলিল—কাকে চাও তুমি ?

অরুণ নীরব, বিমুগ্ধ হইয়া রহিল।

অপর বালিকাটি হাতের স্কিপিং-দড়ি ঘুরাইয়া বলিল—ও'বুঝেছি, তুমি দাদাকে চাও।

অরুণ হাসিয়া বলিল—আমি কাউকে চাই না, আমি এসেছি তোমাদের বাগানে বেড়াতে।

—চিনেছি, তুমি ত দাদার বন্ধু, এস, এস।

—দাদা ত বাড়ি নেই।

—বা, তাতে কি, আমরা আছি। এস, এস।

মেয়ে দুইটির কচিগলার স্বর মধুর সুরে ভরা। দুইটি বরজয়ি কুকুর তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল,—লম্বা, ছিপ্‌ছিপে শাণিত বর্শার ফলকের মত।

বালিকারা অরুণকে বাড়ির ভিতর লইয়া চলিল। পিছনে চলিল দুইটি কুকুর।

সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম; রঙীন মার্ব্বেলের মেঝের উপর চিত্রিত পারস্য কার্পেট পাতা; নানা অদ্ভুত আসবাবপত্র; দেওয়ালে নানা বিচিত্র ছবি, দীপ্ত রঙের বড় বড় ছোপ, বহু বর্ণের পর্দ্দা; স্তিমিত আলোকে চারিদিক আব্‌ছায়াময়।

কোণের চামড়া-মোড়া সোফায় এক প্রৌঢ়া মহিলা মরক্কো-চামড়া বাঁধান এক বৃহৎ গ্রন্থ নীরবে পাঠ করিতেছেন। মাতৃস্নেহমণ্ডিত মুখে কি শান্ত ভাব!

—মা দেখ, দাদার এক বন্ধুকে ধ'রে এনেছি।

—কিছুতেই আসতে চায় না।

—বা, বেশ, ব'স তুমি। তোরা ওর সঙ্গে খেলা কর।

—কি খেলা জান তুমি?

—আমি কোন খেলা জানিনা। আমি শুধু বই পড়তে জানি, বই পড়ি।

—আমরা বই পড়ি না; মা পড়েন, আমরা গল্প শুনি।

—আমাদের অনেক ছবির বই আছে, দেখবে?

বালিকারা অরুণের সম্মুখে তাহাদের ছবির বই, তাহাদের নানা খেলনা, তাহাদের নানা জন্মদিনের উপহারদ্রব্য সকল স্তূপীকৃত করিল।

অরুণ তাহাদের সহিত কত অদ্ভুত সুন্দর ছবির বই দেখিল, কত নাম-না-জানা খেলা খেলিল। খেলার নামগুলি তাহার মনে পড়ে না। তবে বালকবালিকা-সমাজ-প্রচলিত লুডো, ক্যারম, বাঘ-বন্দী ইত্যাদি সাধারণ খেলা নয়। খেলার শেষে খাবার আসিল। অতি তৃপ্তিকর পানীয়। খাবারগুলিও বৈদেশিক। নানা রঙের কেক, চকোলেট, আরও নানা অজানা খাবার। অরুণ কোনও খাবারের নাম বলিতে পারে না, মেয়ে দুইটি হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে।

চাঁপাফুলের রঙের কাপড়-পরা মেয়েটি বলিল—তোমার নাম কি বল ?

সচিত্র "কিংআর্থার" উপাখ্যান-গ্রন্থ হাতে করিয়া অরুণ বলিল—আমার নাম স্যার ল্যান্সলট।

রক্তকরবী ফুলের রঙের বেশ-পরা মেয়েটি বলিল—না, তোমার নাম ল্যান্সলট নয়; আমি জানি তোমার নাম, তুমি হচ্ছ অজিত সিং, তুমি বেরিয়েছ দৈত্য বধ করতে।

কোন উপকথায় সে পড়িয়াছিল, ভীষণ দৈত্য বধ করিয়া অজিত সিং এক দেশকে কিরূপে রক্ষা করে।

অরুণ গম্ভীর হইয়া বলিল—তুমি ঠিক বলেছ।

—দৈত্য বধ করতে তুমি পারবে ? সে বড় ভয়ঙ্কর দৈত্য।

—নিশ্চয় পারব।

—চল তবে; আমাদের বাড়ির উত্তর দিকে পাঁচিলের ওপারে সে বাস করে। মাঝে মাঝে তার গর্জ্জন শুনে আমরা চম্‌কে উঠি। তখন বড় ভয় করে। রাতে ঘুম হয় না।

—চল, আমি বধ করব সে দৈত্যকে।

বালিকা দুইটির সহিত সে ঘর হইতে বাহির হইল। বালিকা দুইটি তাহাকে পথ দেখাইয়া চলিল, কুকুর দুইটি চলিল অগ্রে।

পুষ্পশোভিত সুন্দর উন্মুক্ত পথ নয়। এ ঘনবন, সঙ্কীর্ণ বক্র বীথিকা দুই পার্শ্বে অতি প্রাচীন ঝুরি-নামা বট-অশ্বত্থ বৃক্ষগুলির ভীষণ অন্ধকার।

উচ্চ দেওয়ালে সংলগ্ন বৃহৎ কৃষ্ণ লৌহ কবাটের সম্মুখে তাহারা উপস্থিত হইল। কবাট অর্গলবদ্ধ।

—কবাট খুলতে পারবে?

বালিকা দুইটির মুখ আশঙ্কায় পাণ্ডুর, চক্ষুগুলি ব্যথার করুণ। কুকুর দুইটি চঞ্চল হইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে।

অরুণ সশব্দে অর্গল সরাইয়া দ্বার খুলিল। সম্মুখে সঘন অন্ধকার।

পিছন হইতে বালিকা দুইটি বলিল—এগিয়ে যাও।

অজানা অন্ধকারপথে দৈত্যের সন্ধানে অরুণ অগ্রসর হইল।

পিছনে দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

দৈত্যের এ কি অবয়বহীন অন্ধকার রূপ!

যেন স্বপ্নের ঘোর হইতে জাগিয়া চমকিয়া অরুণ চাহিয়া দেখিল, বালীগঞ্জের এক অজানা পথে শীত-সন্ধ্যার অন্ধকারে দিশাহারা দাঁড়াইয়া।

কোথায় সেই সোনার প্রাসাদ? স্বপ্নের মত রাত্রির সঘন তিমিরে মিলাইয়া গিয়াছে।

ইহার পর বহুদিন সে বালীগঞ্জে ঘুরিয়াছে, সে "সোনার স্বপ্ন" আর খুঁজিয়া পায় নাই।

সমস্ত কলেজ জীবনে এই বাড়ি সে কতবার খুঁজিয়াছে, আর কখনও দেখিতে পায় নাই। যেন আলাদীনের প্রদীপ-দৈত্য কোন রূপকথা-পুরী হইতে এক দিনের জন্য এই অপূর্ব্ব বাড়ি তুলিয়া আনিয়া বালীগঞ্জের নির্জ্জন শ্যামল উদ্যানপথে স্থাপিত করিয়াছিল, তারপর রাতারাতি কোথায় তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

১৮

সোনার স্বপ্ন-প্রাসাদ হইতে অন্ধকার পথে বাহির হইয়া অরুণ যেমন দিশাহারা হইয়া গেল, তেমনই শীত-সন্ধ্যায় ধূম-কুজ্ঝটিকার মত বিষাদের আবরণ তাহার অন্তর আবৃত করিল। সে অনুভব করিল, শৈশবের অপরূপ স্বর্গরাজ্য হইতে দুইটি দেববালা তাহাকে বাহির করিয়া দিল যৌবনের অজানা ভীতিসঙ্কুল পথে। গভীর রাতে যখন সে বাড়ি ফিরল প্রাসাদ, উদ্যান, চারিদিকের জীবনস্রোত গূঢ় রহস্যময় ভীতিপ্রদ মনে হইল। শুইবার পূর্ব্বে আয়নাতে নিজের মুখ দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। শৈশবের সরল সৌকুমার্য্য নাই, তাহার অন্তরবাসী কবি-যুবকেরও পরিচয় এ মুখে নাই; গণ্ডের পাণ্ডুরতায়, চিবুকের শীর্ণতায়, চক্ষের কৃষ্ণছায়ায় এ কোন্ অজানা মানুষের মূর্ত্তি।

আবার ফাল্গুন মাস আসিল। পলাশবৃক্ষ রক্তপুষ্পভারে আনত। গাছের শাখায় নবপত্রদলের মধ্যে পাখীরা নীড় বাঁধিতেছে। পুষ্পবনে মৌমাছিদলের গুঞ্জরণের বিরাম নাই। বৃক্ষের কাণ্ডে প্রতি বৎসর চক্রচিহ্নে যেমন বৃক্ষের জীবনেতিহাস লিখিয়া যায় তেমনই প্রতি বসন্ত-ঋতু অরুণের জীবনপটে পুরাতন চিত্রের উপর নব বর্ণের স্বপ্ন-ছবি অঙ্কিত করে। এ বসন্তের বাতাস অরুণের অন্তরের বিষাদ কুজ্ঝটিকা উড়াইয়া দিতে পারিল না।

দেহে মনে করুণ বিহ্বলতা। অরুণ উদাসী, সুদূরের পিয়াসী। তাহার কিছু ভাল লাগে না। নিয়মিতভাবে সে কলেজে যায়, নোট লেখে, পড়া মুখস্থ করে, বন্ধুদিগের সহিত গল্প করে, সকল কাজ যেন

কলের পুতুলের মত করিয়া যায়; আনন্দ কোথাও নাই। এই চলন্ত দিনরাত্রির কলরোলের মধ্যে তাহার অস্তিত্বের ধারা যেন সহসা স্তব্ধ হইয়া যায়; গুহাবদ্ধ নির্ঝরিণীর ন্যায় কোন আনন্দময় প্রাণশক্তি তাহার দেহে-মনে শৃঙ্খলাবদ্ধ; একটা মূক বেদনা বক্ষের পঞ্জর ঠেলিয়া ওঠে; মনে হয় পারিপার্শ্বিক জীবনস্রোতের সহিত তাহার যোগ নাই, সে একাকী, সে বিচ্ছিন্ন। কয়েকটি বন্ধু ছাড়া, সে ক্লাসের অন্য ছাত্রদিগের সহিত কথা বলে না। কেহ বলে, সে দাম্ভিক; কেহ বলে, এ তাহার কবিয়ানা।

একদিন শিশির তাহাকে বলিল—অরুণ, তুমি বড় সেল্‌ফ্-কন্‌সাস্ হয়ে উঠছ। অরুণ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—ঠিক বলেছ, আমার সেল্‌ফ্‌কে জানবার চেষ্টা করছি। বস্তুতঃ এতদিন তাহার জীবনধারা জগতের বিরাট প্রাণস্রোতের সহিত মিলিত হইয়া অজানা আনন্দে অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, এখন সে এই জীবনস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়, দুই স্রোতের বিপরীত টানে আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে।

অজয় একদিন বলিল—কি হয়েছে তোর? টেনিস খেলতে আসিস্ না কেন? সব সময়ই মহাচিন্তিত, যেন পৃথিবীর সব সমস্যা সমাধানের ভার তোর ওপর।

অরুণ মৃদু হাসিয়া বলিল—ভাই দুপুরে রোজ বড় মাথা ধরে, তাই বিকেলে খুব লম্বা বেড়িয়ে আসি। টেনিস খেলতে আর ভাল লাগে না।

অজয় বিরক্ত হইয়া বলিল—এ সব বেশী কবিতা-পড়ার ফল।

অরুণের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া অরুণের ঠাকুমা উদ্বিগ্না হইলেন। বংশের এই কুলপ্রদীপের জন্য তাঁহার মন সর্ব্বদাই শঙ্কান্বিত। তিনি শিবপ্রসাদকে ডাকিয়া বলিলেন—ওরে অরুণের নিশ্চয় একটা ভারী

অসুখ করবে। কিছু খেতে চায় না, কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে, চোখে কালি পড়েছে, বাগানে চুপ ক'রে বসে থাকে, মুখ ফুটে কিছু বলে না।

ডাক্তার আসিয়া সকল প্রকার পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন—অসুখ কিছু নয়, বড় বেশী পড়ে, অত পড়াশোনা কমাতে হবে, চেঞ্জে যাওয়া দরকার। চেঞ্জে পাঠিয়ে দিন, তা না হ'লে নারভাস্ ব্রেকডাউন হ'তে পারে।

শিবপ্রসাদ চিন্তিত হইয়া বলিলেন—কোথায়, দার্জ্জিলিঙে পাঠাব?

ডাক্তার বলিলেন—দার্জ্জিলিং, অতি সুন্দর জায়গা। কোন সমুদ্র-তীরেও পাঠাতে পারেন।

একমাত্র স্বর্ণময়ী বুঝিলেন, অরুণের মনোজগতের আলোড়নেই তাহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িতেছে। তিনি স্নেহস্বরে অরুণকে বলিলেন—অরুণ, তুমি রোজ সন্ধ্যায় একবার এস; আমি কারুর সঙ্গে একটু গল্প করতেও পাই না।

অরুণ প্রতিসন্ধ্যায় বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া মামীমার নিকট আসিত। তিনি তাহাকে রান্নাঘরের সম্মুখে ছাদে বসাইয়া গল্প করিতে বসিতেন। কোন দিন বা উমাকে ডাকিয়া বলিতেন, অরুণের সঙ্গে একটু গল্প কর্ না, আমি রান্নার কাজগুলো সেরে আসি।

উমা কিন্তু গল্প করিতে চাহিত না। সে বলিত—আমার সামনে পরীক্ষা, আর আমি এখন গল্প করতে বসি। আগামী মার্চ্চ মাসে সে প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতেছে।

উমা চলিয়া যাইত। অরুণ ম্লান হাসিয়া বলিত—মামী, তোমার কাজ সেরে এস, তার পর নিশ্চিন্ত মনে গল্প করা যাবে।

—কি খাবে অরুণ?

—না, মামী, কিছু খাব না।

—আচ্ছা, একটু সরবৎ ক'রে দি, কেমন ?

হাতের কাজ ফেলিয়া মামীমা গল্প করিতে বসিতেন। আপন সংসারের সুখ-দুঃখের কথা লইয়াই গল্প সুরু হইত, তার পর মামীমা বলিতেন, দিল্লী-সিমলার সুখের দিনগুলির কথা, নিজ গ্রামের কথা, স্কুলের কথা, কত মধুর স্মৃতি।

অরুণের মন বেশ হাল্কা হইয়া উঠিত।

১৯

ছোট বাড়িটি ঘেরিয়া অনন্ত সমুদ্রের অবিরাম কল্লোলধ্বনি। সম্মুখে সোনালী বালুচরে সমুদ্র-তরঙ্গ কখনও ভীমগর্জ্জনে আছড়াইয়া পড়ে কখনও শুভ্র ফেনপুঞ্জে কলহাস্যে ছড়াইয়া যায়।

কিছুদিন হইল অরুণ পুরীতে আসিয়াছে, একা। একা আসিবে, এই সর্ত্তে সে পুরীতে আসিতে রাজী হইয়াছিল।

সমুদ্র সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই। প্রথম যেদিন সমুদ্র দেখিল, সে বিস্মিত বা মুগ্ধ হইল না। সমুদ্রের যে অসীমতা, বিরাট নর্ত্তন, অপূর্ব্ব বর্ণভঙ্গিমা সে কল্পনা করিয়াছিল, সে রূপ না দেখিতে পাইলেও, ধীরে ধীরে সে সমুদ্রকে ভালবাসিয়াছে, প্রতিদিন সমুদ্র নব নব সুন্দর রূপে প্রকাশিত। সমুদ্রের ঝোড়ো বাতাসে বিষাদের কালো যবনিকা খান্ খান্ হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে, জল স্থল আকাশ নব আনন্দালোকে উদ্ভাসিত। দেহে-মনে সে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতি-প্রভাতে সুনীল জলে আলো-ভরা দিন বিকশিত হইয়া উঠে শ্বেতপদ্মের মত, কে যেন সোনালী খাম খুলিয়া একখানি নীল চিঠি অরুণের হাতে দিয়া যায়, প্রতিসন্ধ্যায় অলক্তক-রাঙা সমুদ্রের অতলতায় সূর্য্য অস্ত যায়, দিগ্বধূদের কণ্ঠে দোলে রক্ত-প্রবালের মালা; সমুদ্র-সঙ্গীত-মুখর নিশীথিনী শান্তিপ্রদায়িনী।

ভোরের বাতাসে অরুণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। খাটটি জানালার ধারে। বিছানায় শুইয়াই দেখা যায়, বালুচর সমুদ্রে মিশিয়াছে, যেন সোনালী শাড়ীর স্বচ্ছ নীল আঁচল সুদূর দিগন্তে

প্রসারিত। জানালা দিয়া নীলাম্বুর খণ্ডিত রূপ দেখিয়া মন ভরে না। তাড়াতাড়ি একটি পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া অরুণ শুধু-পায়ে বাড়ি হইতে বাহির হইল।

জনহীন সমুদ্রসৈকত। রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ভিজা বালি ভোরের আলোয় ঝিকিমিকি করিতেছে। পশ্চিমের আকাশ স্নিগ্ধ নীল মেঘে ছাওয়া। ঢেউগুলি অতি শান্তভাবে তটভূমিতে ভাঙিয়া পড়িতেছে অতি মৃদু কল্লোলধ্বনি,—ঘুমন্ত শিশুর দিকে চাহিয়া মাতা যেমন অতি মৃদুস্বরে সন্তানের নাম উচ্চারণ করেন, শিশুকে জাগাইবার জন্য নয়, শুধু আপন সন্তানের নাম-ডাকার আনন্দে।

এ নির্ম্মল উষায় অরুণ অন্তরে গভীর শান্তি অনুভব করিল। স্তব্ধ নীলাকাশ হইতে দিগন্তবিস্তৃত শান্ত সিন্ধুজল পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাপী সহজ সরল আনন্দ পরিব্যাপ্ত, সদ্য-জাগা শিশুর হাসির মত।

এক হাসির শব্দে অরুণ চমকিয়া চাহিল। অদূরে এক তরুণীর আবছায়াময় রঙীন মূর্ত্তি আকাশ-সিন্ধুর নীলপটভূমিকায় আঁকা। অরুণ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, এই অজানা তরুণী অকারণে হাসিয়া উঠিল, অথবা, সমুদ্রের তরঙ্গকল্লোলে এ হাস্য। সে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া চলিল।

কালো চুলের রাশি কুণ্ডলী করিয়া আল্‌গা খোঁপা বাঁধা, সদ্যজাগরণ-ফুল্ল মুখে নবোদিত সূর্য্যের আভা, হাল্কা সবুজ রঙের শাড়ী, পায়ে কার্পেটের চটিজুতা, ঘুম ভাঙিতেই তরুণীও তাড়াতাড়ি আসিয়াছে সমুদ্রে অরুণোদয় দেখিতে।

মেয়েটি অরুণের পাশ দিয়া চলিয়া গেল, সঞ্চারিত বল্লরীর মত। উজ্জ্বল চক্ষুতারকায় স্বচ্ছ অতলতা। শ্যামলোজ্জ্বল মুখে লাবণ্যের মায়ামন্ত্র। আবার অতি মৃদু হাসির শব্দ। অরুণের সর্ব্বশরীর চমকিয়া

উঠিল। হাসি নয়, বালির ওপর অলস গতিতে চলার ছন্দে চটিজুতার খস্‌খস্‌ ধ্বনির সহিত হাতের বেলোয়ারী চুড়িগুলির ঝঙ্কার।

রক্ত-মেঘের অন্তরালে সূর্য্যের উদয় হইল। কল্লোলে উল্লাসে রজতশুভ্র হাস্যে সূর্য্য-হসিত সিন্ধু বেলাভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে বহুদূর বেড়াইয়া অরুণ সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজপথ দিয়া আসিতেছিল। দূর সমুদ্র-কল্লোলধ্বনির সহিত ঝাউগাছগুলির সন্‌ সন্‌ শব্দ, আষাঢ়ের মেঘ-মেদুর আকাশ রিমঝিম করিতেছে।

পিছন হইতে কে তাহাকে ডাকিল, তোমার নাম অরুণ? অবাক হইয়া সে তাকাইয়া দেখিল, এক বর্ষীয়সী মহিলা, সালঙ্কৃতা, সুসজ্জিতা, তাহার দিকে আসিতেছেন।

—হাঁ, আমার নাম অরুণ।

—আমারও তাই তখন মনে হ'ল। ক'দিন ধ'রে তোমায় খুঁজছি।

—আপনি?

—হাঁ, স্বর্ণ তোমার কথা আমায় লিখেছে, তোমার স্বর্ণমামীমা।

—ও, বুঝেছি।

—স্বর্ণ আমার বন্ধু, আমরা একসঙ্গে সিমলা দিল্লী বহুদিন কাটিয়েছি। স্বর্ণ লিখেছে, তুমি এখানে একা আছ, তোমার খুব লোনলী লাগছে, আমরা যেন দেখাশোনা করি।

—আমার মোটেই লোনলী লাগছে না, আমি এখানে একা থাকতেই ত এসেছি।

—না, না, ও ভাল নয়, ইয়ংম্যান, সব সময় সোসাইটিতে থাকবে।

—সোসাইটি থেকে পালাবার জন্যেই ত এখানে আসা।

—কি জানি বাপু, আমি ত এ ক'দিনে হাঁপিয়ে উঠেছি, সারাক্ষণ সমুদ্রের ডাক আর বাতাস হু হু ক'রে বইছে, লোকে কথা বলতে না পারলে পাগল হয়ে যাবে যে। আর এত বালি ওড়ে, টেবিল চেয়ার বিছানা সব বালিতে কিচকিচ করে। কি সুখে যে লোকে সমুদ্রে আসে, দার্জ্জিলিং নৈনিতাল অনেক ভাল। এস, এস, এই সামনে আমাদের বাড়ি।

সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে অরুণকে বসাইয়া মিসেস্ মল্লিক ডাকিলেন—বেবি! বেবি!

বেবী-নাম্নী এক অষ্টাদশী হিল-উঁচু জুতার খটখট ছন্দে ঘরে ঢুকিয়া অরুণের দিকে স্মিতমুখে চাহিল।

—এই, ইনি অরুণ, found at last!

—বা, মা, কাল রাতে তোমায় বললুম না, কাল আমি ওকে ডিস্‌কভার করেছি, তোমার আগে। কাল সকালেই দেখে মনে হয়েছিল, স্বর্ণমাসীমার চিঠির বর্ণনা মিলছে, তারপর কাল সন্ধ্যায় যখন দেখলুম, সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন একা, like a lost soul—

—মামী আমার খুব বর্ণনা ক'রে পাঠিয়েছেন, দেখছি। কিন্তু আপনাদের সম্বন্ধে ত কিছুই আমাকে লেখেন নি।

—এটি আমার মেয়ে মল্লিকা, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে বি-এ পড়ছে। অরুণকে কিছু খেতে দে, বেবি।

—তোমার খানসামাটি ত সকাল থেকে পলাতক মা, বাহাদুরকে দিয়ে যা-হয় কিছু রাঁধাবার চেষ্টা করছিলুম।

—আচ্ছা, আমি দেখছি। আজ কি বাড়িতে স্নান করলি?

—বা, আজ আমার চুল স্যাম্পূ করার দিন যে, নোনা জলে চুলগুলি যা হচ্ছে।

—বস বস অরুণ, তোরা গল্প কর্।

মল্লিকা অরুণের পার্শ্বে সোফায় আসিয়া বসিল। লেস্-বসান নীচু গলা জ্যাকেট, গলায় রঙীন কৃত্রিম পাথরের লম্বা মালা, কানে মুক্তার দুল, হাতে সোনার চুড়িগুলির সহিত বেলোয়ারী চুড়ি, হাল্কা নীলরঙের শাড়ীতে সোনার আঁচলা; পিঠে ঈষদার্দ্র কালো চুলের বন্যা।

স্বচ্ছ চোখ দুইটি নাচাইয়া মল্লিকা বলিল—কেমন লাগছে সমুদ্র?

—প্রথমে ভাল লাগে নি, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই ভাল লাগছে।

—ঠিক, আমারও তাই। আমরা এসেছি সাত দিন হ'ল। আমিই মাকে জোর ক'রে নিয়ে এলুম। মা দার্জ্জিলিং যেতে চান; আমি বললুম, পাহাড় দেখে মা চোখ প'চে গেছে, চল; সমুদ্র কখনও দেখি নি।

—আমারও এই প্রথম দেখা।

—দেখে এমন খুব আশ্চয্যি লাগে না তবে স্নান, ও! সমুদ্র-স্নান ডিলিসাস, আর সমুদ্রের মাছ খাওয়াও খুব চলছে—খুব স্নান করা হয়—কতক্ষণ?

—আমি, আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার জলে থাকি।

—আমি ত এক ঘণ্টার কম উঠি না। রোজ চোখ মুখ রাঙা ক'রে বাড়ি আসি, আর মার কাছে বকুনি খাই, দুখানি শাড়ী ত ছিঁড়েছে। দুপুরবেলাটা বড় ভাল লাগে, কতক্ষণ আর হাঁ ক'রে সমুদ্রের ঢেউ গোণা যায়।

—বই পড়তে পার।

—ভাল ডিটেকটিভ নভেল আছে? খুব থ্রিলিং?

—ডিটেকটিভ নভেল নেই, ভাল কবিতার বই দিতে পারি।

—কবিতা—ওঃ—আমার মোটেই ভাল লাগে না।

অরুণের কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মল্লিকার কণ্ঠে এমন সহজ কৌতুকের সুর যে তাহার কোন কথায় রাগ করা যায় না।

অরুণ হাসিয়া বলিল—কবিদেরও ভাল লাগে না!

—It depends—উহুঁ—না, কবিরা বেশ ইন্‌টারেষ্টিং হয়—কবি নাকি তুমি?

—না, কবি হ'তে চাই, কিন্তু—

—কিছু মনে ক'রো না, আমার যা মনে হয়, বলে দি, মনের কথা আমি চেপে রাখতে পারি না, তাই মা বলেন—

মা, কি বলেন বেবি, বলিয়া মিসেস্ মল্লিকা প্রবেশ করিলেন।

—মা, তুমি বল না, আমি বড় বাজে বকি।

—তোমার সঙ্গে যে পাঁচ মিনিট গল্প করবে, সে-ই তা বুঝতে পারবে—ওর বড় খোলা মন। অরুণ, গল্প কর তোমরা, আমাকে মিসেস্ সেনের বাড়ি একবার যেতে হবে। বাহাদুরকে চা আনতে ব'লে দিয়েছি, বেবি। চা না খেয়ে যেও না তুমি, আর বিকেলে এখানে এসে চা খাবে, যেন ভুলো না তোমার সঙ্গে গল্পই হ'ল না।

মিসেস্ মল্লিক চলিয়া গেলেন।

পেয়ালাতে চা ঢালিতে ঢালিতে মল্লিকা বলিতে লাগিল—দুই-এক জন কবি আমার খুব ভাল লাগে, যেমন কীটস্, শেলী। আমাদের কনভেণ্টের সিষ্টার এমিলি, ও কি শেলীর ভক্ত, আমি ত প্রাইজে দুখানা শেলী পেয়েছি, আবার জিজ্ঞেস করবেন, পড়েছ, 'ক্লাউড' কবিতা? মুখস্থ করেছ? ক চামচ চিনি? সুন্দর কবিতা 'ক্লাউড'—

I bring fresh showers for the thirsting flowers
From the seas and the streams;

অরুণ বলিল—এই সমুদ্রের তীরে বসেই ত কবিতা প'ড়ে সবচেয়ে এন্‌জয় করা যায়—

—রক্ষে কর, আমার ডিটেকটিভ নভেল বেঁচে থাক।

চা খাওয়ার শেষে অরুণ যখন মল্লিকার নিকট বিদায় লইল, আকাশে আষাঢ়ের নবস্নিগ্ধ মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, সমুদ্রের গুরুগুরু ধ্বনি মাদলের শব্দের মত। অরুণের অন্তরেও নববর্ষা নামিয়া আসিল, তৃষিত পুষ্পদলের জন্য যে মেঘ নদী সমুদ্র হইতে শীতল বারিধারা সঞ্চিত করিয়া আনিল, তাহারই স্নিগ্ধ আবির্ভাব তাহার হৃদয়ের দিগন্তে।

অপরাহ্ণে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখিতে অরুণ যথাসময়ে মিসেস্ মল্লিকের বাড়িতে উপস্থিত হইল। বেহারা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ড্রয়িংরুমে বসাইল। মেমসাহেব কোথায় চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, বেবী-বাবা শীঘ্রই আসিতেছেন। মল্লিকার আসিতে দেরি হইতে লাগিল।

প্রসাধন কিছুতেই মনের মত হইতেছে না। কোন্ রঙের ব্লাউজের সহিত কোন্ রঙের শাড়ী পড়া যায়, মাতার অনুপস্থিতিতে এ সমস্যার সহজ সমাধান হইতেছে না।

নানা খাদ্যভরা বৃহৎ প্লেট হাতে করিয়া সুচিস্মিতা মল্লিকা ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল। অর্থাৎ, দেরিটা যেন খাবার তৈরী করিবার জন্যই হইতেছিল। প্লেটে আমিষ ও নিরামিষ স্যাণ্ডউইচ, সামুদ্রিক মৎস্যের নানাপ্রকার খাবার।

—Excuse me. দেরি হ'য়ে গেল আস্‌তে, অনেকক্ষণ ব'সে আছ?

—তোমার এই দুটো ফটোর য়্যালবাম দেখা শেষ হ'ল; এসব তোমার তোলা ফটো?

—বেশীর ভাগ।

—বেশ সুন্দর ত।

—ফটো-তোলা সুন্দর না মেয়েগুলি ?

—দুই-ই।

ছোট গোলটেবিলে মল্লিকা বসিল অরুণের মুখোমুখি। শ্যামলোজ্জ্বল মুখশ্রী, কচি ধানের চিকণ আভার মত; উঁচু করিয়া চুল বাঁধা বলিয়া কপাল চওড়া দেখাইতেছে। নাকটি একটু মোটা; মুখের ডৌল বড় সুকুমার, অনতিপক্ক ফলের মত বিম্বাধর; সবচেয়ে আশ্চর্য্য টানা কালো চোখ দুইটি, আয়ত নয়নে যেমন হাস্য-কৌতুকের ছটা তেমনই অপূর্ব্ব স্বচ্ছতা।

চা-খাওয়ার শেষে মল্লিকা ফটো য়্যালবামগুলি লইয়া অরুণের পাশে আসিয়া বসিল। কন্‌ভেণ্ট স্কুলের ও কলেজের নানা সহপাঠিনী ও শিক্ষয়িত্রীর ছবি; সিমলা, দিল্লী, নানা স্থানের প্রাকৃতিক শোভা ও পথ দৃশ্য রহিয়াছে। মল্লিকা অফুরন্ত গল্প করিয়া চলিল—কোন্ মেয়েদের সঙ্গে তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব; কোন্ পিক্‌নিকে কি হাস্যকর ঘটনা ঘটিয়াছিল, সিমলাতে বসন্তাগমে কত বর্ণের ফুল ফোটে; কোন্ ফিরিঙ্গি মেয়ের পিতামাতার বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়াছে, মেয়েটি পিতার তত্ত্বাবধানে আছে, অথচ মাতার সহিত মাঝে মাঝে কি কৌশলে লুকাইয়া দেখা করে; একবার দিল্লীর চকে বাজার করিতে গিয়া মল্লিকার গলা হইতে সোনার হার খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, আবার কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া গেল; কলেজে তাহার কোন প্রফেসারকে ভাল লাগে না; কোন্ পিয়ানো-বাদককে সে শ্রেষ্ঠ মনে করে; মোজার্টের মিউজিক সে কিরূপ ভালবাসে; এইরূপ কত সামান্য গল্প, তুচ্ছ কথা, অরুণ মুগ্ধচিত্তে শুনিতে লাগিল অপরূপ কাহিনীর মত।

মল্লিকা যখন চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসে, রাঙা সরু ঠোঁটের ওপর মোটা নাক বিশ্রী দেখায়, কিন্তু যখন সে কথা বলে, তাহার মুখ সুন্দর

হইয়া ওঠে, চোখে শ্যামল ধরণীর স্বপ্ন-অঞ্জন লাগে, গলার হার, কানের দুল ঝিকিমিকি করে। তুচ্ছ কথা বলার অবসরে কখন মল্লিকার সরল মুখে কোন্ অমৃতময় সৌন্দর্য্যলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, এ অপূর্ব্ব অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য সে কখনও কাহারও মুখে দেখে নাই। অরুণের মনে চমক লাগে।

রাতে যখন অরুণ বিদায়গ্রহণ করিল, মল্লিকা বলিল—কাল সকালে কি করছ? স্নান করবার সময় তোমায় ডেকে নিয়ে যাব, সাড়ে ন'টা, কেমন!

—আচ্ছা, মেনি থ্যাঙ্কস্।

সম্মুখে অন্ধকার পথে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া অরুণ বহুক্ষণ বাড়িটির দিকে চাহিয়া রহিল।

একটা হাসির ধ্বনি।

ফানি বয়, নয় মা!

সে ফানি বয়। কলিকাতার কেহ অরুণকে এরূপভাবে বর্ণনা করিলে সে তাহার সহিত দেখা করিত না; কিন্তু এই সমুদ্রতীরের জল স্থল আকাশের কি যাদু আছে। ফানি বয়, কথাগুলি গানের সুরের মত গ্রহতারাবেষ্টিত নিশীথ গগনে বাজিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে সাড়ে আটটার সময় অরুণ সমুদ্রস্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়া বাড়ির সম্মুখে চঞ্চলভাবে ঘুরিতেছিল। বালি ও সমুদ্রের জলে কাপড় জামা গৈরিকবর্ণ হইয়া ওঠে, ছিঁড়িয়া যায়; সেজন্য সে স্নানের জন্য একটি মোটা কাপড় ও গেঞ্জি আলাদা রাখিত; আজ ময়লা কাপড়-জামা পরিল না, ফর্সা কাপড় ও পাঞ্জাবী পরিয়া মল্লিকার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বেলা প্রায় নয়টার সময় মল্লিকা আসিয়া ডাক দিল—মিষ্টার পোয়েট, প্রস্তুত! সকাল ক'রে এলুম, মাকে ব'লে এসেছি, আজ দেড়ঘণ্টা স্নান।

—আমি প্রস্তুত। চলো।

মল্লিকার বিদেশী স্নান-সজ্জার প্রতি অরুণ বিস্মিত বিমুগ্ধ ভাবে চাহিল। স্নান-সাজের ওপর সুন্দর কিমানো ড্রেসিং গাউন!

সঙ্গে বেহারার হস্তে ছাতা ও বড় তোয়ালে।

—জুতো প'রে নাও, আসবার সময় বালি তেতে উঠবে।

—ভিজে পায়ে বালির ওপর দিয়ে আসতে বেশ লাগে। চলো।

তাহারা কিছুদূরে স্নান করিতে চলিল। অদূরে সাহেবদের ছেলে-মেয়েরা মাথায় তালপাতার টুপি পরিয়া স্নান করিতেছে।

অরুণ স্নান-বিলাসী। বাড়ির পুষ্করিণীতে সে বহুক্ষণ সাঁতার কাটিয়া স্নান করে। কিন্তু সমুদ্রে স্নান যেন মাদকতাময়। প্রথম ঢেউ শুভ্রফেনায় পায়ের উপর লুটাইয়া পড়ে, দ্বিতীয় ঢেউ বুকে আসিয়া আঘাত করে, তৃতীয় ঢেউ শুভ্রহাস্যে কণ্ঠ জড়াইয়া দূরে আরও দূরে টানিয়া লইয়া যায়, চতুর্থ ঢেউ সমস্ত দেহ দোলাইয়া দেয়, মাথার উপর উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। তারপর দোলার পর দোলা। নেশা লাগিয়া যায়।

আজ সমুদ্রকল্লোলের সহিত মল্লিকার হাস্যদীপ্ত চাউনি, উল্লাসধ্বনি, সরল কৌতুক মিলিয়া সমুদ্র-স্নান অপূর্ব্ব মধুর হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ তাহারা সাঁতার কাটে, ঢেউয়ে দোলা খায়; তারপর তীরে বসিয়া গল্প করে, রোদ পোহায়; আবার দুরন্ত ধীবর বালক-বালিকার মত আবেগে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

বেহারা সঙ্গে ঘড়ি আনিয়াছিল। সে জানাইল, প্রায় দুই ঘণ্টা হইয়াছে। চোখ মুখ রাঙা করিয়া শ্রান্ত হইয়া অরুণ ও মল্লিকা জল হইতে উঠিল বটে; কিন্তু তাহাদের স্নানের নেশা তখনও মেটে নাই।

তিন দিন পরে।

উদাস দ্বিপ্রহর। বিজন সাগরতীর। সূর্য্যহসিত শান্ত সিন্ধু। বসুন্ধরার হিরণ্যঅঞ্চলের মত প্রসারিত বালুচর। তীরপ্রান্তে একটি বৃহৎ নৌকা পড়িয়া রহিয়াছে, যেন আরব্যোপন্যাসের কোন দৈত্য বৃহৎ জুতা ফেলিয়া গিয়াছে, সে জুতা পরিয়া পর্ব্বত বন নদী সমুদ্র পার হইয়া কেশবতী রাজকন্যার দেশে পৌছান যায়।

তটের নিকট তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্র শুভ্র, তার পর একটু পাটলবর্ণ, তার পর স্নিগ্ধ সবুজ, তার পর দিগন্তে ঘন নীল, যেন নানাবর্ণের নক্সা-করা একটি পারস্য কার্পেট সুদূর গগনসীমান্ত পর্য্যন্ত ঝলমল করিতেছে। নৌকার আড়ালে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া অরুণ শেলী পড়িতেছিল :

Many a green isle needs must be
In the deep wide Sea of Misery.

বা, গ্র্যাণ্ড, বলিয়া কে হাততালি দিয়া উঠিল।

অরুণ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল নৌকার ওধারে বালুর গর্ত্তে পা ডুবাইয়া মল্লিকা বসিয়া আছে।

—তুমি।

—হ্যাঁ, আমি, এলুম নষ্ট সোল উদ্ধার করতে। গ্রীন আইল-এর সন্ধান পেলে?

—এতক্ষণ পাচ্ছিলুম না, এবার পেয়েছি, সুতরাং শেলী বন্ধ, এবার মল্লিকা-কথা আরম্ভ হোক।

—কি ফাজিল ছেলে, এস এদিকে।

—তুমি উঠে এস, গল্পের মনসুন নামুক।

—বা, আমি কেমন পা ডুবিয়ে বালিতে বসেছি।

অরুণকে উঠিয়া যাইতে হইল। নৌকায় ঠেস দিয়া দুই জনে বসিল পাশাপাশি। আকাশ হাল্কা কালো মেঘে ছাইয়া আসিল।

—হাত দেখতে জান? দেখ দেখি আমার হাত।

মল্লিকার হাতটি অরুণ নিজের হাতে তুলিয়া লইল। শিশুর মত নরম তুলতুলে হাত, লম্বা আঙুলগুলি সুন্দর, নখগুলি সুন্দর কাটা, ঈষদ্রক্ত।

—এই হাত দেখা হচ্ছে!

—এই ত হাত দেখ্‌ছি, সুন্দর হাত, আর্টিষ্টের হাত।

—ঠাট্টা!

—ঠাট্টা নয়, আচ্ছা বলছি, তুমি বেশ ভাল বাজাতে পার।

—তা, পিয়ানো মন্দ বাজাই না, একটা পিয়ানো থাকত এখানে, আর বেহালা—

—বেহালা বাজান ভাল লাগে?

—I adore.

—আমি একটা বেহালা এনেছি, এতদিন বাক্স হ'তে বার করাই হয়নি।

—চল, নিয়ে এস।

—এখন?

—আচ্ছা, আজ সন্ধ্যায় বাজাতে হবে কিন্তু। আর কি, আর কি দেখ্‌ছ হাতে?

—দেখ্‌ছি আর সাত দিনের মধ্যে কাচের চুড়িগুলি সব ভেঙে যাবে, আর সেই সঙ্গে একটি যুবকের হৃদয়ও ভাঙবে।

—কে? তার হৃদয় কি কাচ দিয়ে গড়া?

—সে তোমায় ভালবাসে কিন্তু তুমি তাকে ভালবাস না।

মল্লিকা গম্ভীর হইয়া উঠিল, মৃদুস্বরে বলিল—তুমি কেমন ক'রে জানলে?

—বা, আমি যে হাত দেখ্‌তে জানি।

হাত টানিয়া লইয়া মল্লিকা বলিল—তোমার আর হাত দেখ্‌তে হবে না। তাহার মুখ ছলছল করিয়া উঠিয়াছে, মেঘ-ঢাকা সমুদ্রের মত।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। নৌকার আড়ালে দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মল্লিকার শুষ্ক গম্ভীর রূপ দেখিলে অরুণের কেমন ভয় হয়।

—কি হ'ল তোমার?

—না, কিছু নয়। মাঝে মাঝে মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়। শোন, উমার চিঠি পেয়েছি আজ।

—উমার?

—হাঁ, এক সময়ে সে আমার খুব বন্ধু ছিল।

—বা, বেশ জোর বিষ্টি হ'ল। ব'সে ব'সে একটু ভেজা যাক্‌।

বহুক্ষণ বিষণ্ণমুখে বসিয়া থাকিবার মেয়ে সে নয়। উচ্ছ্বসিতভাবে সে গল্প সুরু করিল।

অপূর্ব্ব, আনন্দময় দিনরাত্র, অঘটন ঘটনের স্বপ্ন-ভরা। সত্তার নবজন্ম। জীবন-সমুদ্রে আনন্দের বান ডাকিয়া আসিয়াছে। অরুণের অস্তিত্বের ধারা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে আলোর বন্যায় উপছে-পড়া শরতাকাশের পেয়ালার মত। এত দিন সে চলিয়াছে আপন রহস্যে একাকী, আজ সে জীবনের সকল দুঃখ সমস্যার কথা ভুলিয়া গেল, শুধু অনুভব করিল, এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকায় পরমানন্দ।

অরুণ ও মল্লিকা দুই বিভিন্ন জগতের। অরুণ যেমন মল্লিকার মত কৌতুকময়ী, প্রাণ-ভরা বিলাসচঞ্চল স্বাধীন-প্রকৃতির মেয়ে দেখে নাই,

মল্লিকাও সেইরূপ অরুণের মত গম্ভীর, চিন্তাশীল, ভাবপ্রবণ কবি-প্রকৃতির ছেলে দেখে নাই। পরস্পর পরস্পরের নিকট পরম রহস্যময়।

মল্লিকার প্রকৃতি এত সরল, স্বচ্ছ, অরুণ সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ছোট মেয়ের মত সে প্রচুর খাইতে ভালবাসে, খাবারের গল্প করে; নানা রঙীন বেশে অলঙ্কারে সাজিতে ভালবাসে বন্য নারীর মত; ছুটিতে, সাঁতার কাটিতে, চেঁচাইতে, উচ্চ হাসিতে, অকারণে শব্দ করিতে ভালবাসে। তাহার দেহে যেমন প্রচুর স্বাস্থ্য তাহার মনে তেমনই প্রচণ্ড স্বাধীনতা, সে কিছু লুকাইতে, বানাইয়া বলিতে পারে না, এই তারুণ্যমণ্ডিত সহজ স্বাধীনতা তাহাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়াছে।

তাহার অফুরন্ত প্রগল্‌ভতা, তুচ্ছ ঘটনার বর্ণভঙ্গিমা, হাস্যকৌতুকের অবিরাম ধারা, প্রাণের খুশীর ঝলমলানি, বাঁচিয়া থাকার উদ্দাম উল্লাস—এ যেন বসন্ত ঋতুতে ফুলের অজস্রতা, গিরি-ঝর্ণার বিরামহীন সঙ্গীত-ধ্বনি, নীলাম্বুর উচ্ছ্বসিত কল্লোল,—উন্মুক্ত প্রকৃতির মত স্বাভাবিক সুন্দর।

নারীপ্রকৃতিকে বিচার বা বিশ্লেষণ করিবার শক্তি অরুণের তখনও হয় নাই। সে মুগ্ধ হইয়া যায়। এ তরুণীর প্রাণকল্লোলে তাহার জীবন ছন্দিত হইয়া উঠে। মেঘকজ্জল দিনগুলি যেন তাহারই প্রসারিত চক্ষের কৃষ্ণ তারকার স্নিগ্ধতা, সমুদ্রগীতমুখর রাত্রিগুলি যেন তাহারই আনত আঁখিপদ্মের নিবিড় রহস্য।

দিনের পর দিন সহজ আনন্দে কাটিয়া গেল; কোন হিসাব রহিল না।

অরুণ চিঠিটি পাইল দুপুরবেলায়। চিঠি পড়িয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। এ কি তাহার আনন্দভোগের শাস্তি! সমস্ত দিন সে

বিছানাতে চুপ করিয়া শুইয়া কাটাইল। সমুদ্রতীরে যাইতে ভয় ক রল। দেহ-মন বড় ক্লান্ত। সন্ধ্যায় সে কোনরূপে মিসেস্ মল্লিকের বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিল। ড্রয়িংরুমের সম্মুখে বারান্দায় আসিতে, শুনিতে পাইল, মাতা ও কন্যার কথাবার্ত্তা হইতেছে।

—বেবি, তুই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস, অরুণের সঙ্গে অত মেশা ভাল নয়।

—দেখ মা, কথাটা স্পষ্ট ক'রে বল না, অত ঘুরিয়ে বলার কিছু দরকার নেই।

—শোন্, মহেশ লিখেছে, আসছে শনিবার সে আসতে চায়, মানে, সে শনিবারে আসছে, যদি কোন কারণে আমরা বারণ ক'রে না লিখি।

—তাই বল না, তোমার মহেশ আমার বন্ধুত্বটা পছন্দ করতে না পারেন।

—সেটাও ভাবতে হবে। দেখ অত বড় লোকের ছেলে রাজী হয়েছে, তার দিকটা ত দেখা দরকার। আর আমার মনে হয় অরুণ তোর সঙ্গে লাভ-এ পড়েছে, আমার ত চোখ আছে, আমি নিশ্চয় বলতে পারি, ও তোকে ভালবাসে।

—আচ্ছা যদি ভালই বেসে থাকে, কি হয়েছে তা'তে?

—ওর তরুণ জীবন, ছেলেটি বড় ভাল, বড় সিরিয়স।

—মা, স্পষ্ট কথাটা বল না কেন, তোমার ভয়, পাছে তোমার মেয়েটি ওকে ভালবাসে, আর তোমার এমন সাধের সম্বন্ধটি ভেঙে যায়।

—তোকে নিয়ে আমি পারলুম না, বেবি চুপ কর, কে যেন আসছে।

পাংশুমুখে অরুণ ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল।

মল্লিকা স্মিতমুখে বলিল—হ্যালো, সারাদিন তোমায় দেখি নি, মুখ এত শুক্‌নো, অসুখ?

অরুণ মল্লিকার দিকে চাহিল না, মিসেস্ মল্লিককে বলিল—আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এলুম, আমি কাল সকালে চলে যাচ্ছি।

সমস্যার এত সহজ সমাধান হইবে, মিসেস্ মল্লিক ভাবেন নাই। তিনি খুশী হইয়া উঠিলেন।

কণ্ঠে একটু বিস্ময়ের সুর আনিয়া বলিলেন—হঠাৎ কাল?

অরুণ ধীরে বলিল—হাঁ, এখানে বহুদিন থাকা হয়ে গেল, বাড়ি থেকে যাবার তাগাদা এসেছে। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ, ছুটিটা বড় আনন্দেই কাটল।

মল্লিকা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে উচ্চ হাসিয়া বলিয়া উঠিল—এই তোমার কথাই হচ্ছিল, মা বলছিলেন,—

—বেবি!

মিসেস্ মল্লিক অরুণকে বলিলেন—কালই যাচ্ছ? স্বর্ণকে ব'লো আমাদের কথা, দেখি কলকাতায় যদি যাই দেখা করব। সুবিধে হ'লে এস একবার সিমলার দিকে। তোমায় বড় ভাল লাগল, এখানে কিছুই আদরযত্ন করতে পারলুম না। কাল সকালের ট্রেণে যাবে? ডিনার খেয়ে যাও, ব'স তোমরা গল্প কর, আমাকে একবার মিসেস্ সেনের বাড়িতে যেতে হবে।

অনর্গল বকিয়া মিসেস্ মল্লিক সহসা চলিয়া গেলেন, অরুণের বিদায় গ্রহণ করাও হইল না।

মল্লিকা বলিল—চল অরুণ বাহিরে, ঘরে বড় গরম মনে হচ্ছে।

দুই জনে নিঃশব্দে বাহির হইল, ঝাউবন অতিক্রম করিয়া রাজপথ পার হইয়া বালুচরে গিয়া বসিল। অন্ধকার রাত্রি, আকাশ তারায় ভরা, উদ্বেলিত সমুদ্রে একটা অদ্ভুত আলো মাঝে মাঝে ঝিকিমিকি করিয়া উঠিতেছে।

—হঠাৎ কাল যাবে ?

—আজ বাড়ি থেকে চিঠি পেলুম, বড় দুঃসংবাদ।

—কি ?

—আমার বোনের বড় অসুখ।

—প্রতিমার! কি হ'ল ?

—কি অসুখ লেখে নি, গত পাঁচ দিন ধ'রে জ্বর ছাড়ছে না আর আমি এখানে—

—আমারও একটা দুঃসংবাদ শোন। আসছে শনিবারে মহেশ মজুমদার আসছেন।

—কে তিনি ? তোমার ফিঁয়াসে ?

—মা তাই ভাবেন, তিনিও ওইরূপ আশা ক'রে আছেন, কিন্তু আমি এবার তাঁর আশা ভঙ্গ করছি।

—কেন ?

—কেন, আমার খুশী, ও!

—দেখ, হয়ত তোমার মা আমার নামে বদনাম দেবেন।

—পাগল! তুমি সে ভয় ক'রো না।

সহসা মল্লিকা অরুণের হাত নিজের হাতে টানিয়া লইল। তাহার মুখ ছলছল করিতেছে, স্বচ্ছ চোখ অশ্রু-বাষ্পময়।

—Ships that pass in the night ব'লে একটা কবিতা পড়েছ ?

—না।

—অন্ধকার অনন্ত সমুদ্রে দুইটি জাহাজ ক্ষণিকের জন্য পাশাপাশি এসে চলে গেল, আবার তাদের দেখা হবে কিনা কে জানে! আচ্ছা শীতের মরসুমী ফুল-ফোটা দেখেছ, রঙের কত বাহার কিন্তু ক'দিনই বা থাকে। পৃথিবীতে আনন্দ বড় ক্ষণস্থায়ী, ঈশ্বর এমন করেন কেন ?

দুই জনে স্তব্ধ বসিয়া রহিল। তাহাদের অস্তিত্বের ক্ষুদ্র বিন্দু ঘিরিয়া কোন্ অতলস্পর্শ অনাদি শক্তির বন্যা সৃষ্টির ভাষাতীত বেদনা ও আনন্দে গর্জ্জমান অন্ধকারে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহারই ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে লক্ষ্যহীন পথযাত্রার গান।

মল্লিকা চকিতপদে দাঁড়াইয়া উঠিল। অরুণ তাহার পার্শ্বে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—চল তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না, চলো তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি, তা না হ'লে হয়ত তুমি এই সমুদ্রের ধারে সারারাত কাটাবে।

অরুণের বাড়ির নিকট আসিতে, মল্লিকা তাহার অতি নিকটে আসিয়া তাহার অধরে চুম্বন করিল।

অরুণ বিস্মিতভাবে মল্লিকার দিকে চাহিল, তাহার চিরস্বচ্ছ চোখে আজ অন্ধকার সমুদ্রের রহস্য।

কিন্তু মল্লিকার অশ্রু অরুণের হাতে পড়িতে তাহার রুদ্ধ অশ্রুজল চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। সে মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

মল্লিকা বলিল—জানি, তুমি আমায় ভুলে যাবে, কিন্তু মল্লিকা মল্লিক যে হৃদয়হীনা নয়, সেই কথা তোমায় জানিয়ে গেলুম,—না, না, তোমায় আসতে হবে না, আমি একা যেতে পারব। au revoir!

চোখের জল মুছিয়া অরুণ যখন চাহিল, মল্লিকা অদৃশ্য হইয়াছে।

রাত্রি আরও নিবিড় অন্ধকারময়, সমুদ্রের আহ্বান আরও গম্ভীর রহস্যময় হইয়া উঠিল।

২০

পুরী হইতে কোন চিঠি না লিখিয়াই অরুণ হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ি পৌঁছিয়াই সে প্রতিমার ঘরের দিকে ছুটিল। প্রতিমার রোগপাণ্ডুর শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বুকে যেন গভীর বেদনা অনুভব করিল। অরুণ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল প্রতিমাকে একা ফেলিয়া আর কখনও সে কোথাও বেড়াইতে যাইবে না।

—কেমন আছিস টুলি, কপাল ত ঠাণ্ডা, জ্বরটা বোধ হয় গেছে।

প্রতিমার টানা চোখ দুইটি আরও বড় আরও কালো হইয়া উঠিয়াছে।

—বা, দাদা, তুমি কখন এলে? কই মোটা হয়েছ কই? খুব কালো ত হয়েছ।

—কেমন আছিস আজ?

—আজ সকালে ত শরীর বেশ ঝর্‌ঝরে লাগছে। জ্বর কাল থেকে গেছে।

—যাক্ জ্বরটা গেছে।

—তুমি আসছ জেনেই বোধ হয় তাড়াতাড়ি পালিয়েছে। জানো দাদা, আমাকে কিছু খেতে দেয় না। আমি কিন্তু আজ সাবু খাব না, কিছুতেই।

—না, না, ডাক্তারেরা যা বল্‌ছে তাই খেতে হবে বইকি।

—রেখে দাও তোমার ডাক্তার। ভারি ত বিদ্যে। প্রথমে হ'ল টাইফয়েড, তার পর প্যারাটাইফয়েড, ঠাকুমা ত ভেবে অস্থির, তার পর

কাল যখন জর ছেড়ে গেল তখন রক্তপরীক্ষার ফল এল, ম্যালেরিয়া, এই ত' তোমাদের ডাক্তার।

—কুইনাইন খেয়েছিস ?

—ও সব কিছু খাচ্ছি না। আমি ডালমুট্ খাব।

অসুখে ভুগিয়া প্রতিমা যেন সাত বছরের আবদারে মেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। অরুণ স্নেহকরুণ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

—বা, পুরীর গল্প কিছু বলছ না, সমুদ্র কেমন লাগল ? ওওারফুল!

—তুই শীগগীর সেরে ওঠ তারপর তোকে নিয়ে পুরী যাব বেড়াতে। আহা, বিছানা থেকে উঠিস্ না।

—বা, সারাক্ষণ শুয়ে থাকতে ভাল লাগে! দাদা পুরী নয় সিমলে; কাকা বলেছেন, এবার সিমলা নিয়ে যাবেন পূজার ছুটিতে; ভাগ্যিস অসুখটা হ'ল। আমার কিন্তু ডালমুট্—

ঠাকুমা ঘরে প্রবেশ করিতে প্রতিমা চুপ করিয়া গেল। ডালমুট্ সম্বন্ধে কোন আলোচনা আর অগ্রসর হইল না।

অরুণ ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, আচ্ছা, ঠাকুমা আমাকে এত দেরী করে খবর দিতে হয়—

—আমি ত রোজ বলছি, ওরে, অরুকে একটা চিঠি দে, আমার কথা কেউ কানে তোলেই না। তা তোমার বন্ধুরা খুব সেবা করেছে।

—কে ? অজয় ?

—অজয় এসেছিল কয়েকদিন খোঁজ নিতে। আর তোমার ওই কবি-বন্ধুটি রোজ এসেছে, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, তার আবার বাড়াবাড়ি, এক গাদা ফুল কিনে আনা কেন পয়সা খরচ ক'রে, আমাদের বাগানে ত কত ফুল পচছে। তোমার ওই হরিসাধন ছেলেটি বড় ভাল, সেই ত সব করলে, রাতজাগা—

—হরিসাধন? কে?

—দাদা যেন কি, হরিসাধন-দাদাকে তুমি চেন না, তোমার ক্লাসফ্রেণ্ড!

—খুব শুশ্রূষা করেছে ছেলেটি, কোন পাস-করা ডাক্তার অত করতে পারত না।

—আমাদের সঙ্গে যে পড়ে?

—হ্যাঁগো, হরিসাধন-দাদা।

অরুণ প্রতিমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার চোখ উজ্জ্বল, অধর আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

অরুণের মনে পড়িল হরিসাধনের সহিত তাহার ভাব করিবার ইচ্ছা হইলেও পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া ওঠে নাই। সে প্রায়ই ক্লাসে আসে না। নিঃশব্দে আসে ক্লাসের শেষ বেঞ্চিতে বসে, বড় চুপচাপ থাকে। শুধু-পা, মোটা কাপড় ও সাদা টুইলের শার্ট পরা, বেশভূষার কোথাও একটু বাহুল্য নাই। স্কুলে সে যেরূপ অতি সহজ বেশে আসিত কলেজেও ঠিক সেইরূপ ভাবে আসে। কিন্তু কাঁচা সোনার মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণের জন্য অতি সাধারণ বেশভূষাতেও তাহাকে চোখে পড়ে। মুখখানি অতি শান্ত, চোখ দুইটি মাঝে মাঝে জ্বলজ্বল্ করিয়া ওঠে। নম্র দীনতার সহিত অপূর্ব্ব তেজভরা মূর্ত্তি। সে ছেলেটি হঠাৎ কিরূপে প্রতিমার রোগ-গৃহে প্রবেশ করিল ও দাদা হইয়া উঠিল! অরুণ উৎসুক ভাবে ঠাকুরমার মুখের দিকে চাহিল।

ঠাকুমা বলিলেন—হ্যাঁ, হরিসাধন তোমার সন্ন্যাসী-মামার উপযুক্ত শিষ্য বটে!

—জানো দাদা, সন্ন্যাসী-মামা এসেছেন।

—সত্যি! কোথায়, কোথায় তিনি!

—বোধ হয় গঙ্গাস্নান করতে গেছেন।

—বহুদিন পর এলেন।

—তিনি যে দামোদরের বন্যাপীড়িতদের সেবা করবার জন্তে কাশ্মীর থেকে এসেছেন দু-বছর হ'ল। বর্দ্ধমানের কোন গ্রামে হরিসাধন-দাদার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

—জানিস অরু, সেবানন্দ এসে আমায় রক্ষা করেছেন। সেদিন দুপুরে হঠাৎ মেয়ের জ্বর গেল বেড়ে, মেয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আমি ত ভয়ে মরি। তোর কাকাকে জানিস্ ত, সে বললে, আমি মেমসাহেব নার্স এনে দিচ্ছি, ভাল নার্সিং দরকার। সেদিন বিকেলে হঠাৎ তোর সন্ন্যাসী-মামা এসে হাজির হলেন। আমি বুঝলুম, ঠাকুর এযাত্রা রক্ষা করেছেন, আর ভয় নেই। সেবানন্দ কিছুতেই মেমসাহেব নার্স আনতে দিলেন না। তিনি হরিসাধনকে ডেকে পাঠালেন। ওদের নাকি এক সেবক-সমিতি আছে। সবার বাড়ি-বাড়ি গিয়ে শুশ্রূষা করা তাদের কাজ।

—হরিসাধন-দাদা এখনও এল না ঠাকুমা, আমায় যে ব'লে গেল সকালে আসবে।

—ওই তোর সন্ন্যাসী-মামা আসছেন অরু।

নগ্নপদ, গেরুয়া রঙের বস্ত্র ও আলখাল্লা-পরা, সুঠাম দীর্ঘ দেহ, শান্ত শ্যাম মুখশ্রী, শান্ত চোখে একটু ক্লান্তির ছায়া, কালো চুলের রাশি ঘাড়ে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সহস্র লোকের মধ্যে একটি বিশেষ ব্যক্তিরূপে সন্ন্যাসী-মামাকে প্রথমেই চোখে পড়ে, কর্ম্ম-সেবকের সম্মুখে মাথা ভক্তিতে নত হইয়া আসে।

অরুণ সন্ন্যাসী-মামার নগ্নপদের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। সেবানন্দ অরুণকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন—খোকা, খুব বড় হ'য়ে উঠেছিস্

ত, মাথায় আমার সমান-সমান; বা গোঁফের রেখাটি বড় সুন্দর, তবে এখনও তা' দেবার মত হয় নি। খুব পড়াশোনা করছিস শুনলুম।

প্রতিমার মাথায় হাত বুলাইয়া তিনি বলিলেন—বা, মা, জ্বর ত নেই, জ্বর চলে গেছে,—দূর হ, দূর হ জ্বর—আর অসুখ আসবে না, কিন্তু কুইনাইন খেতে হবে, মনে আছে।

—আমি কুইনাইন খাব না।

—আমি কুইনাইনের ওপর মন্তর পড়ে দেব, সন্দেশের মত মিষ্টি হয়ে যাবে। বড় বড় আপেল এনেছি! চল্ খোকা, তোর পড়ার ঘর দেখি গে।

সন্ন্যাসী-মামা অরুণের মাতার সহোদর। তিনি শিবপ্রসাদের সহপাঠিও ছিলেন। কলেজে পাঠের সময়েই তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। বি-এ পড়ার সময় হঠাৎ তিনি একদিন সকলের অজ্ঞাতে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তখন কেহ বলিয়াছিল, পরীক্ষা দিবার ভয়ে তিনি পলাতক; কেহ বলিয়াছিল, কোন তরুণীর প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি উদাসী। সেদিন যে মুক্তিকামী যুবক জগৎ জীবন, মানবাত্মা সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া পরম বেদনায় দিশাহারা হইয়া গৃহ-পরিবার সুখ-সম্পদ ত্যাগ করিয়. অজানা পথে বাহির হইয়াছিলেন, দশ বৎসর পর তিনি সন্ন্যাসী 'সেবানন্দ' রূপে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে যাহারা পূর্ব্বে উপহাস করিয়াছিল, তাঁহার নামে নানা মিথ্যা গুজব রটনা করিয়াছিল তাহারাই তখন ভক্তিভরে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া নানা প্রার্থনা জানাইল, কেহ চাহিল আপন সন্তানের ব্যাধির জন্য ঔষধ, ধনসম্পদলাভের সহজ উপায় কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কেহ প্রশ্ন করিল, মুক্তি কোন্ পথে। সেবানন্দ স্মিতমুখে বলিয়াছিলেন, তিনি মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিতে আসেন নাই, তিনি নিজে

মুক্তিলাভ করিতে আসিয়াছেন, সকলকে সেবা করিয়া। মানব-সেবাই পরম ধর্ম্ম।

দীর্ঘ জীবন ধরিয়া তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সাধু ভক্তের সঙ্গলাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আর যখনই বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ বন্যা কোন দুর্দ্দিন আসিয়াছে, তখনই তিনি দেশে ছুটিয়া আসিয়াছেন, দুঃস্থ গ্রামবাসিগণের সেবা করিবার জন্য।

ভারতে যুগে যুগে যে সাধক-সন্ন্যাসীগণ সত্য ধর্ম্মের সন্ধানে গৃহ-পরিবার ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন, নির্জ্জনে নিজ সাধনায় ধর্ম্মের কোন মহিমান্বিত রূপ উপলব্ধি করিয়া আবার লোকসমাজে ফিরিয়া আসিয়াছেন, কোন বিশেষ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতে বা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে নয়, ধর্ম্মের সহজ সত্যগুলি সরল কথায় বলিয়া মানব-সেবা ও নির্ম্মল জীবনযাপন করিয়া গৃহবাসীর জীবন ধর্ম্মময় করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, সন্ন্যাসী-মামা সেই সাধকদের দলের।

অরুণ তাঁহাকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিল। বাল্যকালে তাঁহাকে সে এক রহস্যময় পুরুষ, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যাদুকর বলিয়া জানিত, আজ তিনি দুঃখীর সেবকরূপে, সত্য পথের যাত্রীরূপে, আত্মার আত্মীয়রূপে নব-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া উঠিলেন।

আষাঢ়ের অন্ধকার রাত্রি। অরুণের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মনে হইল, মধ্যরাত্রি হইবে। ঝম্-ঝম্ বৃষ্টির শব্দ।

বারিধারার ঝর-ঝরধ্বনি মৃদু হইয়া আসিল। কোথা হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীত ধ্বনি আসিতেছে!

সচকিত হইয়া অরুণ বিছানা হইতে উঠিল, বারান্দায় বাহির হইল।

বৃহৎ প্রাচীন প্রাসাদ নিদ্রা-ভরা অন্ধকারময়। এ বৃষ্টি-মুখর অন্ধকার রাত্রে কে গান গাহিতেছে নীড়ে-জাগা পক্ষীশাবকের মত। অরুণ দক্ষিণের প্রশস্ত বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল। বিমুগ্ধ হইয়া দেখিল বারান্দার পূর্ব্ব কোণে পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া এক কম্বলের আসনে বসিয়া সন্ন্যাসী-মামা মুদিত নয়নে ভজন-গান করিতেছেন। এ গান অপরূপ। এ কণ্ঠ দিয়া গান-গাওয়া নয়, প্রদীপের তৈলময় সলিতা যেমন আপনাকে পুড়াইয়া আলো জ্বালায় তেমনি এ সুরের শিখায় সাধকের আত্মার আনন্দ ও বেদনা মূর্ত্তিলাভ করিতেছে। ঊষার বাতাসে বিকচোন্মুখ পদ্মের মত অরুণের মন কাঁপিতে লাগিল। ভিজে মেজেতে সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল। এ কি পবিত্র গভীর অনুভূতি। তাহার সমস্ত দেহ-মন কোন্ অতল রসের তিমিরে ডুবিয়া যাইতেছে।

সংস্কৃত মন্ত্র, হয়ত বেদের কোন গান। হিন্দী ভজন। ধ্যানী গায়ক গাহিয়া চলিয়াছেন, যেন সমস্ত সৃষ্টি একটি সুর-শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিতে চায়।

আর্দ্র বাতাসে ভিজে মাটির গন্ধ, জুঁইফুলের গন্ধ। কালো মেঘের ফাঁকে সোনার ধারার মত সূর্য্যের আলো। তামসী রাত্রি প্রভাত হইল। অরুণ অনুভব করিল তাহার অন্তরেও যেন নব সূর্য্যোদয় হইতেছে।

গান শেষ করিয়া সেবানন্দ যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অরুণের চক্ষু অশ্রুতে ঝকমক করিতেছে, সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

—তুই এখানে বসেছিলি? শুন্‌ছিলি গান!

—হ্যাঁ মামা, কি সুন্দর আপনার গলা।

—আমার গলা সুন্দর নয় রে, চেয়ে দেখ, কি সুন্দর এই প্রভাত, কি সুন্দর এই পৃথিবী, চির-সুন্দরের স্পর্শ মনে পেলে সব সুন্দর হয়ে ওঠে।

—এখন কি গঙ্গা-স্নানে যাবেন ?

—হ্যাঁ রে।

—আমিও যাব।

—আমি হেঁটে যাব, অত হাঁটতে পারবি ?

—খুব পারব।

—আচ্ছা চল্, বিষ্টি থেমেছে।

পথে যাইতে যাইতে অরুণ গানগুলি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিল। মামার রহস্যময় জীবনের নানা তথ্য জানিতেও সে উৎসুক, কিন্তু সে-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না।

—এই ভজনটি আমায় শিখিয়ে দিতে হবে।

—আচ্ছা রে আচ্ছা, গলায় শুধু সুর থাকলে হবে না রে, ভক্তি চাই।

—ঐ গান কে লিখেছেন ?

—এ গান কে লিখেছেন, তা কেউ জানে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ভক্তের পর ভক্তের মুখে ও গান চলে এসেছে। যিনি প্রথম লিখেছিলেন তিনি সব সময় তাঁর নাম দিয়ে যান নি। তিনি প্রেমদাস ছিলেন, না জ্ঞানদাস ছিলেন, অথবা কোন অখ্যাত ঋষি, অজ্ঞাত বাউল ছিলেন, তাতে কি আসে যায়। তিনি তাঁহার হৃদয়ের যে ভক্তি দিয়ে গেছেন, সেই গানের প্রাণ।

—মামা, আপনার কি সুন্দর আনন্দের জীবন। আমারও ইচ্ছে করে—

—খোকা, বড় হ'লে বুঝবি, এ জীবনে আনন্দ যেমন দুঃখ-বেদনাও তার চেয়ে কম নয়, শরীরের দুঃখ নয় রে, মনের দুঃখ, মনের। কতটুকু আমরা মানবকে সেবা করতে পারছি, কতটুকুই বা আলো জ্বালাতে পারলুম।

২৯

অপরাহ্ণে জয়ন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল, মলিন মুখ, মলিন বেশ। জয়ন্তের মূর্তি দেখিয়া অরুণ বিস্মিত হইল। সুসজ্জিত কবিয়ানা নাই। অরুণের হাত ধরিয়া জয়ন্ত বলিল—চল ভাই, তোমার ছাদের ঘরে। এ যেন স্কুলের সেই সরল ছেলেমানুষ জয়ন্ত, কলেজের উদীয়মান আধুনিক কবি নয়।

জয়ন্ত একটু হতাশ স্বরে আবেগের সহিত বলিল—আমি ঠিক করেছি, আর কবিতা লিখব না, কবিতা-লেখা ছেড়ে দিলুম।

অরুণ একটু ভীত হইয়া বলিল—কি হ'ল তোমার; এ তোমার সাময়িক অবসাদ। না, না কবিতা-লেখা ছাড়বে কেন, তোমার মধ্যে খুব প্রমিস রয়েছে।

—হাঁ, আমার হৃদয়টা কবির বটে, কিন্তু যা বলতে চাই তা ঠিক মত বলতে পাচ্ছি কি? আমার চেয়ে তুই ভাল কবিতা লিখিস। তোর যে 'সমুদ্রের মেয়ে' কবিতা আমায় পাঠিয়েছিস, চমৎকার হয়েছে, বিশেষতঃ ওই তরুণীর চলার ভঙ্গীর উপমাটি।

—কোন্ উপমা?

—সোনালী বালুকার উপর খস্-খস্ শব্দে অলসগতিতে সে চলে যায়, তাহার গতি-ভঙ্গীতে কোন কবিতা-ছন্দের তরঙ্গায়িত আন্দোলন, ধ্বনির কম্পন মূর্ত্তি লাভ করে।

—কিন্তু তোর কি হয়েছে বল্ দেখি?

—বললুম ত, বিদায় কবিতা, বিদায়।

—কিন্তু, কাব্য-লক্ষ্মী তোকে ছাড়বেন কেন ?

—সে ত ছেড়ে চলে গেছে।

—বুঝেছি, সেই পাশের বাড়ির মেয়েটি, কি হ'ল ?

—দশ দিন হ'ল, তার বিয়ে হয়ে গেছে।

—ও, তাই বল্। তারা ত বৈদ্য। তোর সঙ্গে ত বিয়ে হ'তে পারত না! একদিন ত তার বিয়ে হ'তই, যত শীগগীর তার বিয়ে হয়ে যায় ততই ভাল।

—একটা গল্প লিখব ভাবছি। এ-সব সামাজিক কুসংস্কার ভাঙতে হবে।

—আত্মচরিত লিখবি ? ব্যর্থ প্রেম !

—প্রতি গল্পই কি লেখকের আত্মানুভূতি নয়।

—যাক্, ও নিয়ে আর মন খারাপ করিস না।

পাশের বাড়ির একটি মেয়ের সহিত জয়ন্তের প্রেমের একটা অস্পষ্ট ধারণা অরুণের ছিল ; জয়ন্ত সবিস্তারে সে কাহিনী বলিতে সুরু করিল। প্রতিদিন বিভিন্ন রঙের শাড়ী পরিয়া বেণী দুলাইয়া কিশোরীটি জয়ন্তের ঘরের সম্মুখ দিয়া স্কুলের গাড়ীতে উঠিতে যায়, গাড়ী সরু গলিতে আসিতে পারে না, গলির পথ হাঁটিয়া যাইতে হয় ; এই মুহূর্ত্তটির জন্য জয়ন্ত সমস্ত প্রভাত প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। কখনও তাহাকে সে দেখিয়াছে, ছাদে চুল দোলাইয়া বেড়াইতেছে, কখনও দেখিয়াছে, জানলার গরাদে মাথা ঠেকাইয়া পথের দিকে চাহিয়া আছে, যেন কোন অনাগত পথিকের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছে। মাঝে মাঝে চোখে চোখ পড়িয়াছে, মেয়েটি হাসিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কখনও কথা বলা হয়

নাই। প্রেম মনে-মনে হইলেও, মেয়েটি যে তাহাকে ভালবাসিয়াছে, এ-বিষয়ে জয়ন্তের সন্দেহ নাই। মেয়েটি আশ্চর্য্য সুন্দরী।

অরুণ মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, জয়ন্ত যে গর্ব্ব করিয়া বেড়াইত তাহার কবিতা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতামূলক, ইহা সেই অভিজ্ঞতা!

অরুণ গম্ভীর ভাবে বলিল—দেখ ভাই, প্রেম ও সৌন্দর্য্য কবির আত্মার সৃষ্টি। মেয়েটি উপলক্ষ্য মাত্র।

জয়ন্ত হতাশভাবে বলিল, আমি কি আর ভালবাসতে পারব ভাবিস্! পারব না।

—ভালবাসা হচ্ছে প্রেমিকের অন্তরের। যেমন ধর, সূর্য্যালোকে আছে সাত রং। আজ প্রভাতে সূর্য্য যে-মেঘ রাঙিয়ে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করলে, সে-মেঘ যদি জল হয়ে ঝরে পড়ে যায়, তাহ'লে কি সূর্য্য আর কোন নূতন মেঘ রাঙাবে না, নব সৌন্দর্য্যলোক সৃষ্টি করবে না, সে কি বলবে, আমার রঙের ভাণ্ডার উজাড় হয়ে গেল? যত দিন তোর অন্তরে প্রেম থাকবে, ততদিন তোকে ভালবাসতেই হবে, কবিতা লিখতেই হবে।

—ঠিক বলেছিস্। তোর উপমাগুলি বড় সুন্দর। পুরীর খবর কি বল?

—আমার কি আর সে বরাত।

পুরীর কথা জানিতে জয়ন্ত বিশেষ কিছু উৎসাহ প্রকাশ করিল না; আপন ব্যথিত হৃদয়ের কাহিনী আবার সুরু করিল। অরুণ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, জয়ন্ত তাহার পাশের বাড়ির মেয়েটিকে যতটুকু জানিতে পারিয়াছে তাহা অপেক্ষা কত ঘনিষ্ঠভাবে মল্লিকার সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে, মল্লিকার কথা ভাবিলে তাহার অন্তর উদাস হইয়া যায়; এই বাড়ির সারি, এই নগর পথ সব বড় ছোট,

বড় চাপা মনে হয়; সে কোন্ অনন্তের আভাস পাইয়াছে প্রেম কি?

হরিসাধনের আর দেখা নাই। ঠাকুমা চিন্তিত হইয়া উঠিলেন; প্রতিমা একদিন কাঁদিয়া ফেলিল। সন্ন্যাসী-মামা বলিলেন—ভাবিস্ না, অসুখ হ'লে আমি জানতে পেতুম।

সকালে উঠিয়াই অরুণ হরিসাধনের সংবাদ লইতে চলিল। ছোট গলির ভিতর পুরাতন ছোট দোতালা বাড়ি। দরজার কড়া নাড়িতেই হরিসাধন বাহির হইয়া আসিল।

—অরুণ! এস এস।

—বেশ ভাই, তোমার দেখাই নেই, আমরা ভেবে মরি, অসুখ হ'ল বুঝি।

—আমি খবর পেলুম, তুমি এসেছ, প্রতিমারও জর ছেড়ে গেছে।

—বা, সেজন্যে আর আসবে না। বড় অন্যায় করেছ।

—আরে ভাই, আমার কি সামাজিকতা করবার সময় আছে। এ দু-দিন এক কলেরা-রোগী নিয়ে পড়েছিলুম, বাঁচাতে পারলুম না, এই দু-ঘণ্টা হ'ল শ্মশান থেকে আসছি।

—তাহ'লে তোমার ত এখন বিশ্রাম দরকার। তুমি বিকালে নিশ্চয় এসো, রাতে খাবে।

—না, না, আমার বিশ্রাম করা হয়ে গেছে। তুমি চল, ঘরে বসবে, তুমি না খেয়ে গেলে দিদি রক্ষা রাখবেন না।

মাটির অঙ্গন। মধ্যে একটি চাঁপা-ফুলের গাছ ঘেরিয়া সান্-বাঁধান বেদী।

উঠান পার হইয়া সরু সিঁড়ি দিয়া অরুণ দোতলায় উঠিল। হরিসাধন তাহাকে একটি ছোট ঘরে বসাইল। ঘরে চেয়ার-টেবিল আসবাব কিছুই নাই। তকতকে মেজের উপর মাদুর পাতা! জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিতে হইল। ঘরের এক কোণে কাঠের ছোট বেদীর উপর রামকৃষ্ণ পরমহংসের বাঁধানো ছবি ফুলের মালা জড়ানো, বেদীর সম্মুখে ধূপাধারে কয়েকটি ধূপকাঠি অর্দ্ধেক জ্বলিয়া নিবিয়া গিয়াছে। দেওয়ালে শ্রীচৈতন্য, বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র, নানা মহাপুরুষের ছবি ও দেবদেবীর পট ঝুলিতেছে। দক্ষিণ দিকে দেওয়ালে-সংযুক্ত কাঠের তাকগুলিতে কলেজের বইগুলি সাজান।

—তোমার ঘরটি ভারী সুন্দর, মন্দিরের মত মনে হয়।

—এর মধ্যে সাজানোর যা সৌন্দর্য্য দেখ্‌ছ, সে-সব আমার দিদির হাতের। দিদিকে ডাকি, তিনি কতদিন তোমায় দেখতে চেয়েছেন।

বয়স বাইশ-তেইশ হইবে। মুখখানি তারুণ্য ও প্রসন্নতায় পূর্ণ, অথচ এমন স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য আছে যে তাঁহার সম্মুখে কোন চপলতা করিতে সাহস হয় না। দুই চোখে গভীর মমতার সহিত করুণা মেশান। হাতে সোনা-বাঁধান শাঁখা ও তিন গাছি করিয়া সোনার চুড়ি, কালপাড়-ওয়ালা কাপড়খানি ধপ্‌ধপ্‌ করিতেছে, আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা বেশ ভারী। সদ্যস্নাতা দিদি যখন ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, প্রভাতের আলো-ভরা ঘরখানি আরও উজ্জ্বল নির্ম্মল হইয়া উঠিল। বয়সে দিদি অরুণের অপেক্ষা কয়েক বৎসর বড় মাত্র; অরুণের মনে হইল, দিদি যেন তাহার চেয়ে অনেক বড়, তাহার অতি পূজনীয়া, দেখিলেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। তাড়াতাড়ি উঠিয়া অরুণ দিদিকে প্রণাম করিল।

—থাক্ ভাই, অত ঘটা ক'রে দিদিকে প্রণাম করতে হবে না।

অরুণের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

হরিসাধন বলিল—বা তুমি যে দিদি হ'লে।

—বস ভাই, দাঁড়িয়ে রইলে যে। সাধনকে কতদিন বলেছি, তোমায় একবার নিয়ে আসতে। 'অরুণ' ব'লে আমার এক ভাই ছিল, তোমার মতই সুন্দর দেখতে ছিল, আজ মনে হচ্ছে আমার সেই হারানো ভাইকে আবার পেলুম।

—আমার দিদি নেই, আমিও দিদি পেলুম।

—এ দিদি বড় গরিব, দুঃখিনী; এ দিদিকে পেয়ে লাভ নেই, লোকসান হবে।

হরিসাধন বলিল—আচ্ছা, দিদি চুপ কর দিকি।

—ঠিক বলেছিস, নিজের দুঃখের কথাই বলতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। বস ভাই, আমি খাবার নিয়ে আসি।

—আমি খেয়ে এসেছি।

—তা কি হয়, দিদিকে প্রণাম করলে, খেতে হয়।

নানা প্রকারের খাবার ও ফল-সাজান কাঁসার বড় থালা হাতে লইয়া দিদি আবার আসিলেন।

—এত আমি খেতে পারব না, দিদি।

—খুব পারবে ভাই, আমি বস্‌ছি তুমি গল্প করতে করতে খাও।

—বা, হরিসাধনের খাবার কই? আমরা ভাগাভাগি ক'রে খাই, কেমন।

—ও এখন খাবে, তাহলেই হয়েছে। ওর এখনও পূজো করা হয় নি।

নিমন্ত্রিত অতিথির মত বসিয়া অরুণকে সব খাবার খাইতে হইল। বিদায়ের সময় দিদি বলিলেন—মাঝে মাঝে এস ভাই।

হরিসাধনের গ্রন্থস্তূপ হইতে একখানি বই লইয়া অরুণ বলিল—এই বইখানি পড়তে নিচ্ছি।

—কি, ম্যাৎসিনির Duties of Man, বইখানি তুমি পড়নি, নিয়ে যাও। বইখানি আমি রোজ খানিকটা পড়ি, চমৎকার বই।

—তাহ'লে ত বইখানি নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

—না, না, তুমি পড়। তা না হ'লে দুঃখিত হব।

অরুণকে হরিসাধন গলির মোড় পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিল। বলিল, দিদিকে কেমন লাগল? দিদি তাহার গর্ব্বের জিনিষ।

—এ রকম দিদি পাওয়া মহা সৌভাগ্য। খুব ভাল লাগল।

—তবে দিদির জীবন দুঃখের, একদিন সে-গল্প তোমায় বলব। মাঝে মাঝে এস ভাই। ধার্ম্মিকদের, পুণ্যবতীদের ঈশ্বর এত দুঃখ দেন কেন জানি না। দিদি বলেন, তিনি দুঃখ দেন বলেই ত সুখ সময়ে তাঁর নাম করি, তাঁকে ভুলে যাই না।

পথে চলিতে চলিতে অরুণ ম্যাৎসিনীর বইখানি উল্টাইতে লাগিল, একটি লাইন তাহার চোখে পড়িল, Your first duties are to humanity.

পরদিন প্রভাতে অরুণ অজয়দের বাড়ি গেল। চার-পাঁচ দিন কলিকাতায় আসিয়াছে, একবার অজয়দের বাড়ি যায় নাই, এ-কথা ভাবিয়া যেমন লজ্জিত তেমনই ভীত হইয়া উঠিল।

বাড়িতে ঢুকিতেই চন্দ্রা তাহার হাত ধরিয়া বলিল—অরুণদা, আমার ঝিনুক কই—ঝিনুক। এ মা, কি কালো হয়ে গেছ!

অরুণ লজ্জিত হইয়া বলিল—ঝিনুক ত আনা হয় নি, একেবারে ভুলে গেছি।

—কি ভোলা মন তোমার বাপু! তোমাকে নিয়ে পারা গেল না।

—আচ্ছা, একটা ভাল পুতুল কিনে দেব।

—পুতুল কে চায়। তার চেয়ে—আচ্ছা সে বলব'খন।

চন্দ্রা বুঝিল, একটি দামী উপহার আদায় করিবার এই মহাসুযোগ। কোন তুচ্ছ জিনিষের নাম হঠাৎ না বলিয়া, সে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিতে চায়।

—জানো, দিদি স্কলারশিপ পেয়েছে, কলেজে ভর্ত্তি হবে, সব কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে অরুণ চন্দ্রার নিকট রায়-পরিবারের সকল খবর সংগ্রহ করিতে লাগিল।

উমা হাসিয়া বলিল—কি সৌভাগ্য, এতদিন পরে মনে পড়িল।

উমার হাসি অরুণের বড় ভাল লাগিল। সে ভয় করিয়াছিল, হয়ত উমা গম্ভীর মুখে কোন ব্যঙ্গ করিবে।

অরুণ হাল্কাসুরে বলিল—বা এতদিন কি?

—এসেছ ত পাঁচদিন হ'ল। জানি।

—খবর ত সব ঠিক জান দেখছি।

—চাও ত পুরীর খবরও কিছু বলতে পারি।

আজ উমা কৌতুকময়ী, পরিহাসচঞ্চলা।

অরুণ গম্ভীরভাবে বলিল—পুরীর আবার খবর কি, চারিদিকে ধূধূ করছে বালি, আর সমুদ্রের তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে।

—তাই নাকি, নেকী মেয়েটির সঙ্গে খুব ত ভাব জমিয়েছিলে।

—মরুভূমিতে সঙ্গীর অভাবে মানুষ সিংহের সঙ্গেও ভাব করে। হার্টি কন্‌গ্রাচুলেশন্। কত টাকার স্কলারশিপ?

—শোন, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে। কলেজে আমি পড়বই। মা এক রকম রাজী হয়েছেন, কিন্তু বাবা আপত্তি করছেন।

—কেন ?

—সে আমি জানি না। তোমায় একটু বুঝিয়ে রাজী করাতে হবে তাঁকে।

হেমবাবুর ইচ্ছা, কোন সুপাত্র দেখিয়া উমার শীঘ্র বিবাহ দেওয়া। তাঁহার শরীরের অবস্থা ত কিছুই বলা যায় না। উমা এখন বিবাহ করিতে চায় না। হেমবাবুর ভয়, কলেজে পড়িলে উমা আরও স্বাধীনতা-প্রিয় হইয়া উঠিবে।

—চল, কি কি পড়ব, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। একটা খুব ভাল গান শিখেছি।

উমার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় এক বেতের চেয়ারে অরুণ বসিল। উমা একটি ছোট টুলে তাহার মুখোমুখি বসিল।

বর্ষার আকাশে মেঘ সূর্য্যালোকের লীলা। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি হয়, আবার ঝলমল আলোয় চারিদিক ভরিয়া যায়। এক অবর্ণনীয় অলৌকিক পুলকে অরুণের অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল।

২২

সেকেণ্ড ইয়ার আরম্ভ হইল বর্ষার অবিশ্রাম ধারাবর্ষণে। পুরী হইতে আসার পর সমুদ্রের অসীমতার আভাসে অরুণের অন্তর পূর্ণ ছিল; কলিকাতা বড় ছোট, ঘরবাড়ি বড় চাপা, পথগুলি বড় সঙ্কীর্ণ মনে হইত। যখন কালো মেঘের স্তূপে আকাশ অন্ধকার, দিনের আলো ম্লান, রাত্রির তমিস্রা সজল গভীর হইল, অরুণের নিকট পৃথিবী আরও ক্ষুদ্র হইয়া আসিল বটে, কিন্তু অন্তরে কোন্ অজানা শক্তির আলোড়ন।

ফার্ষ্ট ইয়ারের নবাগত ছাত্রগুলির দিকে চাহিয়া অরুণ ভাবিল সে কত বড় হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ, এই এক বৎসরে তাহার দেহমনের বিকাশ অতি দ্রুত হইয়াছে। নিত্য নব অনুভূতি, অভিজ্ঞতা; রহস্যময় পৃথিবী, বিচিত্র মানবজীবন।

সহস্র সহস্র প্রবাল পুঞ্জীভূত হইয়া যেমন অতল সমুদ্রের উপর প্রবাল-দ্বীপের সৃষ্টি হয়, তেমনই দেহে মনে নব নব অনুভূতির সম্মিলনে মানস-সমুদ্রে সত্তার যে অপরূপ সৃজন চলিতেছে এই অত্যাশ্চর্য্যকর সৃষ্টিরহস্য অরুণ যখন অস্পষ্ট অনুভব করে, সে দিশাহারা হইয়া যায়, অপূর্ব্ব পুলক, অজানা বেদনা, অনাগত ভবিষ্যতে কোন্ অলক্ষ্য দুরাশা।

সমুদ্রস্তনিত পুরীর দিনগুলিতে ছিল আকাশভরা আলো, জলধির অনন্তসুনীল বিস্তার, মল্লিকার কলহাস্য গল্প গুঞ্জরণ।

শ্রাবণের মেঘকজ্জল দিবসগুলির ঝরঝর গানে সেই দিনগুলির স্মৃতি মিশিয়া গেল, গানের শেষে যেমন গানের সুর ঘরের নীরবতায় বাজিয়া মন উদাস করিয়া তোলে। সমুদ্রের স্মৃতি অরুণের অন্তরে অসীমতার

বিহ্বলতা জাগায়। মল্লিকার কলকথা শুদ্ধ, কিন্তু অরুণের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে ভালবাসিবার, ভালবাসা পাইবার তৃষ্ণা। তাহার নয়নে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, নারীর গতিভঙ্গীতে কি সৌন্দর্য্য, নারীর কৃষ্ণনয়নের দৃষ্টিতে কি রহস্য, কণ্ঠের স্বরে কি মাধুর্য্য!

বর্ষা যখন তাহার মেঘময়ী কবরী গুটাইয়া শ্রাবণের শেষরাত্রে ছলছল গীতে বিদায় লইল, শরতের বৃষ্টিধৌত নির্ম্মলাকাশে কোন্ জ্যোতির্ম্ময়ের রূপ প্রকাশিত হইয়া উঠিল। কলেজের দিনগুলি কাটিতে লাগিল স্বপ্নের মত।

ভোরবেলায় পাখীর ডাকে অরুণের ঘুম ভাঙিয়া যায়। তাহাদের বাগানে পাখীর সংখ্যা যেন বাড়িয়া গিয়াছে। কত বিচিত্র বর্ণের পাখী, উষায় কোথা হইতে আসে, আবার আলোর সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া চলিয়া যায়।

বাগান অন্ধকারময়। অরুণ শিশির-ভেজা ছাদে যায়। কোনদিন পূর্ব্বাকাশ বিদীর্ণ ডালিমের মত রক্তিম বর্ণ, কোন দিন বা হাল্কা ধূসর মেঘে ঢাকা। উষার অস্পষ্ট আলো বড় নির্ম্মল, বড় স্নিগ্ধ, চারিদিকে অপূর্ব্ব শুব্ধতা, মাঝে মাঝে উড্ডীয়মান পক্ষিগণের কাকলি ও পক্ষ-সঞ্চালন-ধ্বনি।

অরুণ গুন্ গুন্ করিয়া গান গায়, সন্ন্যাসীমামার নিকট হইতে শেখা কোন ভজন, বাউলের গান, রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাতী সঙ্গীত। সন্ন্যাসীমামার কথা তাহার মনে পড়ে। ঘন বর্ষার মধ্যেই তিনি সুদূর কাশ্মীরে পাড়ি দিলেন। এক স্থানে বহুদিন তিনি থাকিতে পারেন না। তাঁহার মনে কোন যাযাবর বিহঙ্গ অশান্ত ডানা নাড়িয়া ছট্‌ফট্ করিয়া

ওঠে। অরুণ ভাবে, হয়ত এই প্রভাতে সন্ন্যাসীমামা কাশ্মীরের কোন হ্রদের তীরে দেওদারবনবেষ্টিত পর্ব্বতে বসিয়া পূর্ব্বদিকে চাহিয়া গান ধরিয়াছেন, স্বর্য্যের প্রথম স্বর্ণরশ্মি তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ রাঙাইয়া তুলিয়াছে, সন্ন্যাসীমামার ধ্যানরত আনন দীপ্ত করিয়াছে, হ্রদের জল ঝিকিমিকি করিতেছে। অরুণের ইচ্ছা করে, সে-ও পরিব্রাজক হইয়া বাহির হইয়া পড়ে।

প্রভাতের আলোক দীপ্ত হইয়া ওঠে। পরিব্রাজকের স্বপ্ন মিলাইয়া যায়। অরুণ প্রতিমার সন্ধানে যায়। প্রভাতে তাহার যে পথ্য ও ঔষধের ব্যবস্থা আছে তাহার তদারক করে। ডাক্তার কডলিভার অয়েল খাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, ঔষধটির গন্ধ বা স্বাদ প্রতিমার মনোরঞ্জক নয়; অরুণ উপস্থিত না থাকিলে ঔষধ খাইতে প্রতিমা ইচ্ছাপূর্ব্বক ভুলিয়া যাইবে।

সকালে অরুণ সিঁড়ির পাশে ছাদের ছোট ঘরে পড়িতে বসে। পড়িতে হয়, পরবলয় অতিপরবলয়ের বর্ণনা; বায়নোমিয়াল থিওরেম; এথেন্সের গৌরব-যুগ, পলোপনেসিয় সংগ্রাম, আলেকজান্দারের বিজয়-যাত্রা; সিলজিস্‌ম্, টেনিসনের কবিতা।

কোন প্রভাতে পড়ায় মন বসে না। শরতের আকাশে মেঘগুলি বলাকাশ্রেণীর মত আনাগোনা করে। জলস্থল আকাশে কি চঞ্চলতা, কি আকুলতা, বহিঃপ্রকৃতি হাতছানি দিয়া আহ্বান করে। অনন্ত আলোক-সমুদ্র হইতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ভাঙিয়া পড়ে পৃথিবীর বুকে, সবুজে হরিতে চঞ্চলা ধরিত্রী সৌন্দর্য্যে উপছিয়া ওঠে।

ক্যামেরার সাহায্যে কোন বস্তুর কিরণকেন্দ্র স্থির করার পর বস্তুটি দূরে সরিয়া গেলে ফটোগ্রাফারকে যেমন আবার নূতন করিয়া কিরণকেন্দ্র নির্দ্ধারণ করিতে হয়, অরুণকে সেইরূপ প্রতিবৎসর বিশ্বপ্রকৃতির সহিত

নূতন করিয়া সম্বন্ধ পাতাইতে হয়, তাহার তরুণ অন্তর যে সুদূরের পথিক।

কোনদিন সে লাইব্রেরীর কোন গ্রন্থ পড়িয়া সকাল কাটাইয়া দেয়—টুর্গনিভের অন দি ইভ, বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ, মেটারলিঙ্কের ব্লু বার্ড, ভিক্টর হুগোর টয়লার্স অফ্ দ সি। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের নানা রস-সাহিত্য।

সকালের পড়া বেশীক্ষণ হয় না। কলেজ এগারটায়; কোন দিন দশটায় অঙ্কের ক্লাস থাকে। তাড়াতাড়ি খাইয়া ছুটিতে হয়। খাবার সময় ঠাকুমা তদারক করিতে আসেন।

—অরুণ, আস্তে খা। ঠাকুর আর একটা মাছভাজা দিয়ে যাও।

—না, ঠাকুমা, আর দরকার হবে না।

—ব'স্ দই আন্‌ছে। আজ দইটা ভাল জমে নি।

—আবার পায়েস আছে নাকি?

—হাঁ করলুম পায়েস। টুলির যা খাওয়া হয়েছে, তবু পায়েস খেতে ভালবাসে।

প্রতিমা আসিয়া বলে—দাদা, গাড়ী ক'রে যাও। হীরা সিং ত দিব্যি গেটে ব'সে বিড়ি টানছে। তোমার ত এগারটায় ক্লাস।

—না, না, গাড়ীর দরকার নেই।

অতবড় গাড়ী হাঁকাইয়া কলেজে যাইতে অরুণের কেমন লজ্জা করে। হয়ত দেখিবে, সে গাড়ী হইতে নামিতেছে আর হরিসাধন নগ্নপদে কলেজের গেটে ঢুকিতেছে।

২৩

প্রথম ঘণ্টা অঙ্কের ক্লাস। অনেক সময় আই-এ ও আই-এস্‌সি ছাত্রদের একসঙ্গে ক্লাস হয়। এই সময় অজয়ের দেখা পাওয়া যায়। অজয়কে ডাকিয়া অরুণ পিছনের বেঞ্চে বসে। প্রফেসার বোর্ডে অঙ্ক লিখিয়া দেন। তাড়াতাড়ি অঙ্কটি কষিয়া অরুণ খাতাটি অজয়ের দিকে ধরে, অজয় টুকিয়া লয়। তারপর দুই জনে গল্প করে। অজয়ের সহিত গল্পের বিষয় বেশী খুঁজিয়া পায় না। অজয় যে-সকল সস্তা ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়ে অরুণ সেগুলিকে সাহিত্য-পর্য্যায়ভুক্ত মনে করে না। ফুটবল হকি খেলার গল্প হয়।

ইংরেজীর ক্লাসে অরুণের একদিকে বসে শিশির সেন, অপরদিকে দ্বিজেন মিত্র। দুই জনেই স্কলারশিপ-পাওয়া ভাল ছেলে। শিশির সেন অনর্গল বইপড়ার গল্প করে। টেনিসন সম্বন্ধে ব্রাডলে কি লিখিয়াছেন, শেলীর কতগুলি জীবনী সে পড়িয়াছে, ম্যাথু আর্ণল্ডের কোন্ মতের সহিত সে একমত হইতে পারে না ইত্যাদি। শিশিরের আর লাজুকতা নাই, এখন তাহার প্রগল্‌ভতায় ক্লাসের সকলে অস্থির, নির্লজ্জভাবে সে আপন বিদ্যা জাহির করে। দ্বিজেন চুপচাপ থাকে, মাঝে মাঝে বিদ্রূপাত্মক টিপ্পনি দেয়, পড়াশোনায় সে শিশির অপেক্ষা কিছু কম নয়। এই দুই জনের মধ্যে বসিয়া অরুণ হাঁপাইয়া ওঠে; ইংরাজীর ক্লাসগুলি তাহার ভাল লাগে না।

একদিন অরুণ নিজের ক্লাসে না গিয়া, থার্ড ইয়ারের ছাত্রদের দলে

মিশিয়া কবি মনোমোহন ঘোষের ইংরেজী ক্লাসে প্রবেশ করিল। ছাই-রঙের স্যুট-পরা, সুঠাম দীর্ঘ দেহ, শ্যামল শীর্ণ মুখ রাত্রির মত রহস্যময়, রেখাঙ্কিত প্রশস্ত ললাট, বিরল কুঞ্চিত কেশ, স্বপ্নছায়াঘন ক্লান্তিময় চোখ দুইটি অদ্ভুত। মনোমোহন ঘোষ যখন ক্লাসে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন, সকলে স্তব্ধ মন্ত্রমুগ্ধ, এ যেন কোন সৌন্দর্য্যস্বর্গচ্যুত অভিশপ্ত কবি মলিন পৃথিবীর বাস্তবতায় ব্যথিত, বিচ্ছিন্ন, একাকী, গম্ভীর মহিমায় বসিয়া আছেন। কবিতা পড়িতে পড়িতে তাঁহার শ্রান্ত বিষণ্ণ চোখ দুইটি জ্বলিয়া ওঠে, বুঝি হৃতসৌন্দর্য্যালোকের কোন আনন্দ-ছবি ক্ষণিকের জন্য ভাসিয়া ওঠে। হৃদয়শতদলবাসিনী কবিতালক্ষ্মী সাধকের নয়নে মূর্ত্তি ধরিয়া ওঠে। অরুণের মানসনয়নে সেই জ্যোতির্ম্ময়ীর আনন্দরূপ একটু ঝলসিয়া যায়। কীট্‌সের কবিতা।

"Yes, I will be thy priest, and build a fane
In some untrodden region of my mind,
Where branched thoughts, new grown
with pleasant pain
Instead of pines shall murmur in the wind."

অরুণ হইবে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর পুরোহিত, দুঃখময় পৃথিবীতে সে রচনা করিবে মানবাত্মার জয়গান।

মনোমোহন ঘোষের ক্লাস স্বপ্নের মত শেষ হইয়া যায়। তার পর লজিকের ক্লাস বা ইতিহাসের।

মধ্যে এক ঘণ্টা ছুটি থাকিলে অরুণ কমন্-রুমে গিয়া বসে। লাইব্রেরীতে সারাক্ষণ পড়িতে ভাল লাগে না। জয়ন্ত তাহাকে দেখিতে পাইলেই নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া যায়, তাহার নানা পারিবারিক দুঃসংবাদ বলে। জয়ন্তের পিতা হরিদ্বার হইতে পত্র দিয়াছেন, সেখানে তিনি

কোন মঠে পীড়িত। পীতাম্বর কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন বটে, কিন্তু দিন দিন তিনি অত্যন্ত কঞ্জুস হইয়া যাইতেছেন, অবশ্য জয়ন্তের সকল খরচের টাকা তিনি চাহিলেই দেন, কিন্তু সানন্দচিত্তে দেন না। এদিকে দোকানের কিছুই ব্যবস্থা হইতেছে না, পীতাম্বর তাহাদিগকে যে-কোন দিন তাড়াইয়া দিতে পারেন। অরুণ নীরবে জয়ন্তের দীর্ঘ কাহিনী শোনে, সমবেদনা প্রকাশ করে। জয়ন্তের প্রতি তাহার সপ্রেম করুণা জাগে। পাশের বাড়ীর মেয়েটির বিবাহ হইয়া যাওয়াতে জয়ন্ত মুষড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার মত তরুণ কবিপ্রকৃতির যুবক কোন-না-কোন মেয়েকে মনে মনে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না।

কলেজে দুই ঘণ্টা ছুটি থাকিলে বা শীঘ্র কলেজ ছুটি হইয়া গেলে সকলে দল বাঁধিয়া হিন্দু হোষ্টেলে শিশির সেনের ছোট ঘরে যায়। শিশির দোতলায় একটি ছোট ঘর পাইয়াছে। অন্ধকার ঘর, পূর্ব্বদিকে একটি জানালা, সেদিকে ঘারভাঙ্গা বিল্ডিং অতিকায় দৈত্যের মত অন্ধকার ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া; দুই দিকে কাঠের দেওয়াল; পশ্চিম দিকের দরজা অন্ধকার করিডরের ওপর।

এই ঘরটি নেশার মত সকলকে টানে। এ নেশা গল্প করিবার, তর্ক করিবার, অবিশ্রাম ধূমপান ও চা পান করিবার নেশা ও হল্লা করিয়া উচ্ছ্বসিত হাস্য করিয়া প্রফেসারগণের সম্বন্ধে নানা মন্তব্য করিবার নেশা। সকলে জমাট হইয়া গল্প চীৎকার করিবার সুবিধা কলেজে নাই।

অরুণ বাণেশ্বরকে টানিয়া লইয়া যায়, জয়ন্ত দ্বিজেন সুহাসও আসে। শিশিরের ইচ্ছা কেবলমাত্র অরুণ তাহার ঘরে গিয়া তাহার বক্তৃতা শোনে, কিন্তু অন্য সকলে আসিলে আপত্তি করিতে পারে না, সকলে তাহার ঘরে আসিয়া গল্প করিতেছে ভাবিয়া গর্ব্বও অনুভব করে।

কোন বিষয়ে তর্ক সুরু হইলে আর থামিতে চায় না। বাণেশ্বর

তর্কনিপুণ, শ্লেষবাণসিদ্ধ; শিশিরেরই শেষে হার হয়, রাগিয়া সে উল্টা-পাল্টা কথা বলিতে আরম্ভ করে; বাণেশ্বর যে কিরূপে না-রাগিয়া তর্ক করিতে পারে ভাবিয়া সে অবাক হয়।

নানা বিষয়ে অকারণে তর্ক—মোহনবাগানের খেলা, শরৎচন্দ্রের নূতন উপন্যাস, প্রফেসারের পড়ান, মোটর গাড়ীর কি দাম, থিয়েটারের অভিনয়, অভিনেত্রীদের রূপ, ক্রিকেটের রেকর্ড, রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতা, কোন্ সিগারেট উৎকৃষ্ট।

প্রতি বিষয়ে বাণেশ্বরের মত স্থির, অতি স্পষ্ট, যেন সে সকল বিষয় ভাবিয়া শেষসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে।

একদিন অরুণ বাণেশ্বরকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিল—আচ্ছা, বাণেশ্বর তুই কি সত্যি বিশ্বাস করিস, ঈশ্বর নেই?

বাণেশ্বর অরুণের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বক্র হাসি হাসিল, এ যেন কোন পাদ্রীসাহেব মানবকে নরক হইতে ত্রাণ করিতে আগত।

অরুণ হাসিয়া বলিল—এটা তোর pose, নয়?

বাণেশ্বর বলিল—তার চেয়ে সহজ কথায় বল্ না, আমার চাল্। দেখ, চাল্ আমি দিই না। এ বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে। তুই প্রমাণ করতে পারিস, ঈশ্বর আছেন? তোমরা বল, ঈশ্বর মঙ্গলময় আনন্দময়, তাহ'লে এত দুঃখ কেন? তুমি বলবে দুঃখ না থাকলে—ইত্যাদি। বাণেশ্বর উদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

অরুণ বলিল—রবীন্দ্রনাথের "ধর্ম্ম" বইখানা পড়েছিস্?

—দেখ অরুণ, রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন বা উপনিষৎ কি বলেছেন আমি শুনতে চাই না। এই গুরু-ভজার দল দেশের সর্ব্বনাশ করল। তুই নিজে ভেবে কি সিদ্ধান্তে আসতে পারিস, তাই বল। নিজের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি সবচেয়ে বড়।

—আমি বোঝাতে পারছি না, কিন্তু আমি অনুভব করতে পারি, যেমন গানের সুরের আনন্দ শুধু অনুভব করা যায়। তুই যদি আমার সন্ন্যাসী মামার গান শুনতিস্!

—আবার কোন সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়লি নাকি?

—তিনি আমার মামা হন।

অরুণের পাংশুমুখ দেখিয়া লজ্জিত হইয়া বাণেশ্বর বলিল, কিছু মনে করিস না। কিন্তু এই ভাবের কুহেলিকায় স্বপ্নের মায়াজালে সত্য ঢাকা পড়ে। পৃথিবীকে দেখতে হবে সত্যের আলোকে। সত্যকে জানতে পারলে শক্তি জাগবে। নীটসের একখানা বই তোকে পড়তে দেব।

—আচ্ছা, আমিও তোকে একখানা বই পড়তে দেব, দেখি কে কাকে convert করতে পারে।

—ওই ত তোদের ধর্ম্ম, দলভারি করা চাই। সত্যের পথে একা যেতে হবে; কোন বই তার পথ দেখাতে পারে না।

অরুণ সেদিন অনুভব করিল, বাণেশ্বরকে সে ভালবাসে, বাণেশ্বরের জন্য তার মনে ব্যথা লাগে। পিতার সহিত বিবাদ, পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাহার অশান্ত আত্মা নাস্তিক হইয়া গিয়াছে। নাকটি খাঁড়ার মত আরও উগ্র, দেহ আরও শীর্ণ, চোখ দুইটির দৃষ্টি আরও বক্র তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। স্নেহময় পরিবারের মধ্যে প্রেমপূর্ণ গৃহে বাস করিলে বাণেশ্বর বদলাইয়া যাইবে। অরুণ ভাবে, হয়ত যতীনের দিদির নিকট লইয়া যাইতে পারিলে, কোন স্নেহময়ী কল্যাণী নারীর স্পর্শ জীবনে লাভ করিলে বাণেশ্বর শান্তি পাইবে।

কলেজের ছুটির পর অরুণ কিছুক্ষণ টেনিস খেলে। খেলা বেশীক্ষণ হয় না। সন্ধ্যায় অজয়দের বাড়ি যাইতে হয়।

উমা কলেজ হইতে আসে শ্রান্ত; কোনদিন তাহার মাথা ধরে। মাথা ধরা লইয়াই সে মাতাকে সাহায্য করিবার জন্য রান্নাঘরের কাজে লাগিয়া যায়। অরুণ তাহাকে রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বাহির করে।

—উমা, তোমার বেড়ান দরকার, আজও মাথা ধরেছে নাকি?

—ফ্রি এয়ার, কি বল অরুণ? কিন্তু আমরা ত ফ্রি উইমেন নই।

—বল ত গাড়ীটা নিয়ে আসি, গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবে?

—থাক, শরীরের অত তোয়াজে দরকার নেই, আমাদের এই ছাদের হাওয়া খেলেই চলবে।

বাড়ির পিছন দিকের ছোট ছাদে দুই জনে ধীরে পায়চারি করিয়া বেড়ায়। পরস্পর কলেজের গল্প বলে, উপন্যাসের কোন নায়ক-নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ হয়, নূতন গানের সুর লইয়া আলোচনা চলে, প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘটনার কথা, অকারণে হাস্য, অপূর্ব্ব কৌতুক। মল্লিকদের বড় বাড়ির পিছনে সূর্য্য অস্ত যায়, ছাদের বালি-খসা হলদে দেওয়াল কাঞ্চন-বর্ণের হইয়া ওঠে, আকাশে অপরূপ মায়াময় আলো, গলির কদম্বরৃক্ষের পাতাগুলি বাতাসে কাঁপে, একে একে সন্ধ্যাতারা ফোটে, মিত্তিরদের বাড়িতে শাঁক বাজিয়া ওঠে। দিনের নানা তুচ্ছ কর্ম্মে ক্লান্ত চিন্তাক্লিষ্ট মন এই সন্ধ্যার আলোয় কল্পলোক রচনা করিতে চায়। কোন্ স্বপ্নে উমা জাগিয়া ওঠে। এই একসঙ্গে বেড়ানটুকু অরুণের বড় ভাল লাগে, মনে গভীর শান্তি আনন্দ অনুভব করে, এ অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তগুলি যেন স্বর্ণ-সন্ধ্যায় কণ্ঠহার হইতে খসা অমূল্য মণিমাণিক্য।

পড়ার ঘরে আলো জ্বলিলেই বেড়ানো বন্ধ করিতে হয়। প্রতিদিন কলেজের পড়া তৈরি করা সম্বন্ধে উমা অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠাবতী। অরুণের কোন অনুরোধ বা পরিহাস সে গ্রাহ্য করে না। শীঘ্র বাড়ি ফিরিতে অরুণের ইচ্ছা হয় না, রান্নাঘরের দ্বারের সম্মুখে বেতের মোড়ায় বসিয়া

সে মামীর সহিত গল্প করে, অথবা অকারণে প্রদোষান্ধকারময় পথে ঘুরিয়া বাড়ি ফেরে।

বেশী রাত করিয়া বাড়ি ফেরা চলে না। প্রতিমার সকাল-সকাল খাওয়া উচিত। অরুণ না বাড়ি ফিরিলে প্রতিমা খাইতে চায় না। কোন ছুতায় অনিয়ম করিতে পারিলে ছোট খুকীর মত সে খুশী হইয়া ওঠে!

রাত্রে খাওয়ার পর অরুণ প্রতিমার ঘরে গিয়া তাহার সহিত গল্প করে। প্রতিমাকে শীঘ্র শুইতে বলিয়া দোতলার পড়ার ঘরে যায়। শশির সেনের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সে নানা বই কিনিয়াছে। নিজের লাইব্রেরীটি মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখে। আরও কত বই কেনা দরকার। রাতে আর কলেজপাঠ্য পুস্তক পাঠ হয় না, কোন চিন্তাশীল প্রবন্ধ বা সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাস পড়িতে বসে। বেতের ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশয়ান-ভাবে অরুণ পড়ে রাস্কিনের সিসেম এণ্ড লিলিজ, কার্লাইলের ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন বা উইলিয়াম মরিসের নিউজ ফ্রম নো হোয়ার। পড়িতে পড়িতে তাহার মন কোন্ স্বপ্নলোকে চলিয়া যায়, মানব-সভ্যতার এক সুমহান্ আনন্দময় ভবিষ্যতের চিত্র মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠে। অরুণ ভাবে এক মহাবিপ্লব, তার পর পৃথিবীর শান্তিময় আনন্দময় যুগের আরম্ভ হইবে, ধনী-নির্ধন প্রভেদ থাকিবে না, প্রতি মানব স্বাধীন, প্রেমিক, আনন্দপূর্ণ।

পড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া সে দক্ষিণমুখী প্রশস্ত বারান্দার অন্ধকারে চুপ করিয়া বসে। মোটা আইয়োনিক থামগুলি পাষাণময় দৈত্যের মত স্তব্ধ দাঁড়াইয়া; ঝিলিমিলির মাথায় কোন পাখী বাসা বাঁধিয়াছে, সহসা জাগিয়া চমকিয়া ওঠে; তারাভরা নির্ম্মল আকাশে সাদা হাল্কা মেঘ ঘুরিয়া বেড়ায়; মৃদু বাতাস বয়, অন্ধকার বাগান

মর্ম্মরিত হইয়া উঠে, সরু গলিতে বরফওয়ালা হাঁকিয়া যায়—চাই কুলপি বরফ ; শরৎ-রাত্রি থমথম করে।

এই সময় অরুণের চিন্তা করিবার, স্বপ্নের জাল বুনিবার সময়, কত আজগুবি কল্পনা, অসম্ভব আশা, অপরূপ ভাবনা।

অরুণ ভাবে, বড় হইয়া সে কি করিবে। কত অদ্ভুত প্ল্যান মাথায় আসে, কিছুই সে স্থির করিতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে তাহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ নদীয়ার গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক গ্রাম হইতে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এক ধনী আত্মীয়ের বাঁড়ি থাকিয়া বহুকষ্টে সামান্য লেখাপড়া শেখেন, তার পর এক ইংরেজ বণিকের আপিসে সামান্য কাজ পান, অসামান্য বিষয়বুদ্ধি শ্রম কর্ম্মদক্ষতার গুণে ধীরে ধীরে তিনি বড় ইংরেজ কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দী হন, লক্ষপতি হইয়া উঠেন, এই পুরাতন বাড়ির প্রথমাংশ তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত। অরুণও কি সেই লক্ষপতি মহাভারত ঘোষের মত বড় ব্যবসাদার হইবে, এখন ত দেশে বুদ্ধিমান কর্ম্মপটু বণিকের প্রয়োজন, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়া অরুণ হয়ত আবার ঘোষ-বংশের নব গৌরবময় যুগ আনিবে। কিন্তু আপন বংশকে বড় করিয়া তুলিবার কথা, লক্ষপতি হইবার কথা সে ভাবিতে চায় না, সে ভাবে মানবজাতির কল্যাণময় যুগের ও শান্তির কিরূপে প্রতিষ্ঠা হইবে। মানব সভ্যতার মঙ্গলময় নবযুগ যাহারা আনয়ন করিবে, সে তাহাদের দলে থাকিতে চায়।

হয়ত সে বড় কবি হইবে। কবিতা সে লেখে না, কিন্তু যে-কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছে তাহা প্রশংসিত হইয়াছে। দু-একটি বিখ্যাত

পত্রিকার সহকারী সম্পাদক তাহার কবিতা ছাপাইতেও ইচ্ছুক। সে যাহা অনুভব করে তাহা ঠিকরূপে ব্যক্ত করিতে পারে না। পৃথিবীর বহু প্রসিদ্ধ কবি তাহার বয়সে কিরূপ কবিতা লিখিয়াছেন, নিজের কবিতার সহিত সেগুলি মিলাইয়া দেখে। কোন শরৎ-প্রভাতে কোন বসন্ত-মধ্যাহ্নে, মাঝে মাঝে তাহার মনে হয়, পৃথিবীর কোন নবযুগ যেন তাহার নিকট বাণী চাহিতেছে, মানবসন্তানরক্তকলুষিতা যুদ্ধাগ্নিদগ্ধা বিষাদিনী সভ্যতা-লক্ষ্মী যেন তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন—কবি, তুমি দাও সত্যবাণী, তুমি গাও প্রেমের গান, কামানের গর্জ্জনের উপর উঠুক তোমার ঐক্যের মৈত্রীর স্বপ্নকথা। অরুণ ভাবে সে হইবে জনগণের স্বাধীনতার মিলনের কবি।

কোথায় সে স্বাধীনতা? চারিদিকে কেবল জাতিতে জাতিতে ঈর্ষা, শক্তির লালসা, সংঘাত, রক্তপাত।

কোন রাতে নারিকেল বৃক্ষগুলির প্রান্তে চাঁদ ওঠে। আম নিম কদম্ব নানা বৃক্ষময় বাগানে জ্যোৎস্না মায়াজাল বোনে। অর্দ্ধভগ্ন শেওলা-ধরা মর্ম্মর-মূর্ত্তিতে হট্-হাউসের ফাটা কাঠগুলির উপর চন্দ্রালোক ঝিকমিক করে, পুষ্পসুরভিত আলোছায়াঘন প্রাচীন উদ্যান রূপকথার মায়াপুরীর মত।

অরুণ তাহার বেহালা লইয়া বসে। অতি হাল্কাভাবে ছড়ির টান দেয়, কর্কশ শব্দ হইলে এই অপূর্ব্ব শরৎ-নিশীথিনীর অতি সূক্ষ্ম মায়াজাল বুঝি ছিন্ন হইয়া যাইবে। শিবপ্রসাদের একটি পুরাতন গ্রামোফোন ও ইউরোপীয় অপেরা ও ক্লাসিক সঙ্গীতের বহু রেকর্ড আছে; সেইগুলি বাজাইয়া অরুণ কতকগুলি সুর ও গান শিখিয়াছে, ক্রাইসলারের লিবেস্

লাইড, ভাগনারের মাইষ্টারসিঙ্গারে প্রাইজ গান, বিটোফেনের সোনাটা। আচ্ছা, বিটোফেনের পঞ্চম সিম্‌ফনির প্রথমাংশে কে দ্বারে করাঘাত করিতেছে, সে প্রেম না মৃত্যু ?

কণ্ঠসঙ্গীত অপেক্ষা যন্ত্রসঙ্গীতে অরুণ গভীর আনন্দ পায়, কোন কথাতীত অতল সুরের সাগরে সত্তা ডুবিয়া যায়।

কোন রাত্রি তপ্ত, বায়ুহীন। গাছের পাতা নড়ে না। আকাশের তারাগুলি দপ্‌ দপ্‌ করে, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপশিখার মত। চারিদিক স্তব্ধ, মৃত্যুর মত। সম্মুখের আকাশ তারায় ভরা, পিছনের আকাশ কালো মেঘে ছাওয়া।

সহসা নিস্তব্ধ রাত্রি যেন শিহরিয়া উঠে, বৃষ্টি আরম্ভ হয়; কিন্তু বাতাস একটু নাই। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা নিষ্কম্প বৃক্ষপত্রগুলিতে ঝরিয়া পড়ে, শুষ্ক তৃণে বৃক্ষপত্রাচ্ছন্ন পথে পড়িয়া ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ হয়, কে যেন মল বাজাইয়া আসিতেছে। বৃষ্টির বেগ ধীরে কমিয়া আসে, ঝর ঝর শব্দ ক্ষীণ হয়; আবার বৃষ্টি প্রবল বেগে আসে, চারিদিকে ঝম্‌ ঝম্‌ আকুল ধ্বনি, মনে হয় কে যেন মল বাজাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, আবার চঞ্চল পদে ফিরিয়া আসিল, তাহার নূপুরধ্বনি, কঙ্কণের ঝঙ্কা আকাশে বাতাসে বাজিতেছে। অরুণের মনে পড়ে, মল্লিকার কলহাস্য, প্রাণের আনন্দোচ্ছ্বাস, সাগরের সঙ্গীত।

বৃষ্টি থামিয়া যায়, আবার চারিদিক স্তব্ধ। কিন্তু এ স্তব্ধতা বৃষ্টি-পূর্ব্বের স্তব্ধতার মত শূন্য তৃষ্ণাপূর্ণ বেদনামগ্ন নয়। এ সজল গভীর নীরবতা কোন অশ্রুত সঙ্গীতময়। বিশ্বের মর্ম্মস্থলে যে সঙ্গীত-সমুদ্র নিত্যকাল আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে, নীহারিকার শুভ্র ধারা হইতে লক্ষ লক্ষ গ্রহতারকায় যে সঙ্গীত-বন্যা প্রবাহিত, যে সঙ্গীতের ছন্দে সুরে বৃক্ষে তৃণে লক্ষ লক্ষ জীবে প্রাণ বিকশিত চঞ্চল, সেই বিশ্বব্যাপী সঙ্গীতের

একটু রেশ বুঝি অরুণ শুনিতে পাইল শরৎ-রাত্রির ক্ষণেক বৃষ্টিধারার ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দে।

সঙ্গীতলক্ষ্মী, তুমি জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হও। তোমার আনন্দ-লোকে সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব সকল বিভেদ সংঘাত সমস্যা দূর হইয়া যায়। তোমার অমৃতময় সুর-সমুদ্রতীরে আমাকে আহ্বান কর। বেদনাপীড়িত মানবাত্মার উপর নামিয়া আসুক তোমার সুরসুধা গ্রীষ্মতাপিত শুষ্ক ধরণীর উপর বর্ষার ধারার মত। নয়নে দাও সুরের মায়াকজ্জল, সৃষ্টি নব দিব্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

২৪

এক বৎসর কাটিয়া গেল। থার্ড ইয়ারের আরম্ভ।

সকলে আশা করিয়াছিল, অরুণ আই-এ পরীক্ষাতেও স্কলারশিপ পাইবে, কোনমতে সে প্রথম বিভাগে পাস করিল। সেকেণ্ড ইয়ারে সে কলেজ-পাঠ্য পুস্তক কিছুই পড়িত না, পরীক্ষার পূর্ব্বে দেড় মাস রাত্রি জাগিয়া নোট মুখস্থ করিয়া পাস করিল। শিশির সেন স্কলারশিপ পাইল, ইতিহাসে অরুণের অনেক উঁচুতে ভাল মার্ক পাইয়া পাস করিয়া গেল। অরুণ সেজন্য কিছুই ক্ষুণ্ণ নয়।

জয়ন্ত ইংরেজীতে ফেল করিল। তজ্জন্য সে-ও মোটেই দুঃখিত নয়। পৃথিবীর কোন্ বড় কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ঠিকমত পাস করিতে পারিয়াছেন?

আই-এ পরীক্ষার পর পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। অরুণ প্রেসিডেন্সীতেই বি-এ পড়িতে লাগিল, ইতিহাসে অনার্স লইল। শিশির সেন ইংরেজীতে অনার্স লইল। জয়ন্ত রিপন কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারে গিয়া ভর্ত্তি হইল, পড়াশোনা করিবার ইচ্ছা তাহার বিশেষ নাই। ভুঁদো বৃন্দাবন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইল, সে বড় সার্জ্জন হইবে, ইহাই তাহার জীবনের স্বপ্ন। চালিয়াৎ চট্টো সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করিয়া সেন্ট-জেভিয়ার কলেজে বি-এ পড়িতে গেল; কলেজের ফাঁদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া যদি ইউরোপে যাইবার সুবিধা হয়। তাঁদের নিকট সে ফরাসী ভাষাও শিখিবে। দ্বিজেন খুব ভাল পাস করিয়া ইংলণ্ডে পড়িতে চলিয়া গেল, তাহার পিতার ইচ্ছা, লণ্ডনে ম্যাটিক দিয়া

লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবে, আই সি-এস-এর জন্য চেষ্টা করিবে। অরুণের স্কুল-সহপাঠিগণের মধ্যে প্রেসিডেন্সীতে বি-এ ক্লাসে রহিল সুহাস, মোহিত, বাণেশ্বর ও হরিসাধন।

অজয় আই-এস্‌সি পাস করিয়া বি-এস্‌সি ক্লাসে ভর্ত্তি হইল। তাহার ইচ্ছা শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি হয়, কিন্তু ইহাতে হেমবাবুর বিশেষ অমত। তিনি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, অজয় কোনমতে গ্রাজুয়েট হইতে পারিলে বড় সাহেবদের ধরিয়া গভর্ণমেণ্টের কোন চাকরির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ইহাতে অজয়ের আপত্তি। মাঝে মাঝে পিতাপুত্রে বচসাও হইয়া গিয়াছে। সে স্বাধীন ব্যবসা করিতে চায়। বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়ার হইবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ, বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার সে হইবে বাহক, পুরোহিত। ঘরবাড়ি তৈরি নয়, দুর্গম বনপথে গিরিগাত্রে রেল-লাইন পাতা, ঝর্ণার নদীর জল বাঁধিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরি করা, লোহা-তৈয়ারির বড় কারখানা চালান, চাষীর লাঙল হইতে ধনীর মোটরকার, এরোপ্লেন সকল জিনিষ প্রস্তুত হইবে। অতি অনিচ্ছার সহিত অজয় বি-এস্‌সি ক্লাসে ভর্ত্তি হইল। মনে মনে ঠিক করিল, বি-এস্‌সি পাস করিয়াই ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে ভর্ত্তি হইবে।

ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সম্বন্ধে অরুণের সহিতও অজয়ের বহু তর্ক হইয়া গিয়াছে। অরুণ এই যান্ত্রিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিরোধী। সে বলে এই যন্ত্রপ্রধান বণিকসভ্যতা মানবাত্মার অমঙ্গলকর, তাহার বীভৎস কদর্য্যতা, হিংস্র লোলুপতায় পৃথিবী পীড়িত, তাহার চরম ফল জাতিতে জাতিতে মহাযুদ্ধ। অরুণের মতে, এই ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অজয়কে সে এই যন্ত্র-দানবের পূজারী হইতে দিতে চায় না। অরুণের

যুক্তি শুনিয়া অজয় হাসে, বলে, স্বপ্নবিলাসী কবি, বাস্তব পৃথিবীতে একবার নেমে এস।

বস্তুতঃ, থার্ড ইয়ারে উঠিয়া অরুণের যেন নবজীবন আরম্ভ হইল। কলেজের বইপড়া সে ছাড়িয়া দিল, বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত যোগও বিশেষ রহিল না। সে হইয়া উঠিল কল্পলোকের অধিবাসী, নানা যুগের নানা দেশের কাব্য-সাহিত্যের চিরন্তন রসসমুদ্রে সুধাপান করিয়া কল্পনার পাল উড়াইয়া তরী ভাসাইয়া দিল, সাহিত্যলোকের সহিত বাস্তব পৃথিবী মিশিয়া একাকার হইয়া সূক্ষ্ম রঙীন হইয়া উঠিল।

পরবর্ত্তী জীবনে অরুণ ভাবিয়া দেখিয়াছে, তাহার উনিশ বছরটার মতন এমন আনন্দময় স্বপ্নময় কাল জীবনে আর কখনও আসে নাই, কখনও আসিবে না। উনিশ বৎসর বয়সে সতেজ তরুণ শালবৃক্ষের মত সে সুঠাম দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কল্পনাশক্তি অতি প্রখর, অনুভূতি অতি সূক্ষ্ম, হৃদয়াবেগ অত্যন্ত আকুল হইয়াছে। জলে স্থলে জীবনধারায় পরমানন্দ পরিব্যাপ্ত।

মহাকাব্য, কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস, পৃথিবীর নানা কালের নানা জাতের সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাগণের সুখ দুঃখের সহিত তাহার জীবন সমবেদনায় জড়িত হইয়া যায়।

বাল্মীকি, বেদব্যাস, মম্‌সেন, টুর্গেনিভ, টলষ্টয়, হার্ডি, হোমার, বিদ্যাপতি, শেলী, সকলে তাহার ঘরে ভিড় করিয়া আসে।

শকুন্তলার দুষ্মন্তচিন্তা, দময়ন্তীর বিরহকাতরতা, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ, অর্জ্জুনের বৈরাগ্য, শ্রীকৃষ্ণের সারথ্য, রঘুর দিগ্বিজয়। হেলেনের রূপবহ্নি, ইউলিসিসের সমুদ্র-ভ্রমণ, ফিডিয়াসের পারথেনন, সক্রেটিসের বিষপান। চণ্ডীদাসের পদাবলী, চেঙ্গিস খাঁর রক্তনদী, রবসপিয়ারের গিলোটিন, গুরুগোবিন্দের তপস্যা, সেণ্ট হেলেনায় নেপোলিয়ান।

সিডনি কার্টনের প্রেম, নেলুডফের নবজন্ম, বাজারফের মৃত্যু, টেসের আত্মসমর্পণ, চেঙ্কির পাপ লালসা, রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী। বিটোফেনের বধিরতা, বায়রণের যুদ্ধযাত্রা, সমুদ্র-ঝঞ্ঝায় শেলীর প্রয়াণ।

ছবির পর ছবি তাহার চারিদিকে বাস্তব, মূর্ত্তিময় হইয়া ওঠে, বাস্তব-জীবন ছায়াছবি হইয়া যায়।

পদ্মনিভেক্ষণা সুকেশিনী শকুন্তলা কণ্বের আশ্রমে মনোরমা তরঙ্গিনী মালিনী তীরে পুষ্পিত শালতরুতলে দুষ্মন্তবিরহকাতরা ক্ষীণনিতম্বিনী। নলবিচ্ছেদবিহ্বলা কমললোচনা দময়ন্তী অর্জ্জুন, শাল্মলী, কিংশুক, ইঙ্গুদ নানা বৃক্ষপূর্ণ জনশূন্য ব্যাঘ্রভল্লুকসঙ্কুল গহন অরণ্যে একাকিনী।

মহাভারত বন্ধ করিয়া অরুণ ইলিয়ড খুলিয়া বসে : Sing, goddess the wrath of Achilles Peleus' son, the ruinous wrath that brought on the Achaians woes innumerable,

অন্ধকার রাত্রে ট্রয়ের প্রাসাদ গবাক্ষ হইতে হেলেন যখন দূরে সমুদ্রতীরে গ্রীকসৈন্যগণের তাঁবুর আলোগুলি দেখিতেন, তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইত ?

ইলিয়ড অপেক্ষা ওডেসি পড়িতে ভাল লাগে, অজানা ভীতিসঙ্কুল সমুদ্রে যেন নিরুদ্দেশ-যাত্রা :

Onward thence as we sailed, our hearts sore
laden with sorrow
Spent was the soul of the men by the grievous
labour of rowing.

লোটাস-ইটার ও সাইক্লোপস্দের দেশ ছাড়াইয়া 'সারসি'র বাড়ি ছাড়াইয়া অকূল সিন্ধুপথে যাত্রা, স্বদেশের সন্ধানে। এই ভ্রমণের দুঃখ-বেদনা অরুণ অনুভব করে না, যাত্রার দুঃসাহসিকতার নবদেশ-দর্শনের আনন্দে সে মুগ্ধ হইয়া যায়।

টেল অফ টু সিটিজের আরম্ভটি বড় সুন্দর। প্যারিসের পথে একটি মদের পিপে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ফরাসী-বিপ্লবের প্যারিস! অরুণ ভাবে, যদি সে ফরাসী-বিপ্লবের প্যারিসে জন্মগ্রহণ করিত, দেমুল্যাঁর মত সে প্যালে রয়ালের বাগানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিত।

নেলুডফের আত্মার জাগরণ কি চমৎকার! মাস্লোভার সহিত সে সাইবেরিয়ার বন্দী-জীবন বরণ করিয়া লইল। সে যে এক পতিতা নারীর সহিত সকল সুখসম্পদ ত্যাগ করিয়া চলিল, তাহা কি কেবল নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে, অথবা মাস্লোভাকে সে ভালবাসে? ভাল না বাসিলে এমন আত্মত্যাগ, দুঃখবরণ কি সম্ভব?

প্রেমের মিলনের সুখসম্ভোগের রূপ নয়, আত্মত্যাগের মৃত্যু-বরণের রূপ অরুণকে মুগ্ধ করে।

এমনি নানা উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্রের সুখদুঃখসমস্যা, অরুণের নিজ জীবনে সুখদুঃখের প্রশ্ন হইয়া ওঠে। কোন্ অত্যাশ্চর্য্যকর প্রক্রিয়ায় ইহাদের জীবনধারা তাহার জীবনের সহিত মিশিয়া তাহার সত্তাকে মহিমান্বিত করিয়া তোলে, বই পড়িবার পূর্ব্বে সে যে-মানুষ ছিল, বই পড়িবার পর সে মানুষ থাকে না, তাহার ব্যক্তিত্ব গভীরতর হয়। কিন্তু ইহা কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার মত নয়। বিভিন্ন চরিত্রবিরুদ্ধ মতবাদ, বিচিত্র সভ্যতা তাহার মনে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষমামণ্ডিত ঐক্য লাভ করে না, কারণ সে কিছুই বর্জ্জন করে না, সকলই গ্রহণ করিয়া জমা করিয়া রাখিতে চায়। বাণেশ্বরের মনের সহিত অরুণের মনের এইখানে প্রভেদ। সত্য ও সভ্যতার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে বাণেশ্বরের একটি স্পষ্ট ধারণা, নিজ মত আছে; কিছু পাইলেই সে বিচার করে, বিশ্লেষণ করে। সে নিজ মতের প্রভাবে পরিবর্ত্তন ঘটাইতে চায়, নিজে পরিবর্ত্তিত হইতে চায় না।

অরুণের মধ্যে দুইটি মানুষ যেন ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল, একটি প্রতিদিনের কলেজে-পড়া সাধারণ অরুণ, আর একটি নিত্যকালের স্বপ্ন-দ্রষ্টা কল্পলোকবাসী অরুণ; তাহার বাস্তব জীবনের খাদের উপর কল্প-লোকের রসধারা প্রবাহিত হইয়া চলিল, স্বর্ণশস্যভরা মাঠের মধ্য দিয়া ভাদ্রের ভরা নদী যেমন বহিয়া যায়। আর এই কল্পনাজগতের উপর জাগিয়া রহিল উমার আনন্দকর সপ্রেম দৃষ্টি, শরতের আলোভরা আকাশের সুনির্ম্মল স্বচ্ছ নীলিমার মত।

প্রেম ছিল বলিয়া অরুণের দ্বৈতজীবনে কোন সংঘাত ছিল না; নতুবা বাস্তব তটভূমিতে ভাবধারার আঘাতে ঘোর আবর্ত্তের সৃষ্টি হইত, অরুণকে কোন্ অশান্ত অতলতায় ডুবিয়া মরিতে হইত!

উমার একটু হাসিভরা চাউনিতে সমস্ত দিনটি প্রসন্নতাভরা হয়, উমার মুখের একটু বিষণ্ণতায় সূর্য্যের আলো ম্লান হইয়া আসে। উমা যেদিন ভাল করিয়া কথা কয় না, অরুণের দিনরাত্রি নিরানন্দময়, উমা যেদিন ডাকিয়া গান শোনায়, অরুণের ইচ্ছা করে কোন মহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া দেয়।

সে চণ্ডীদাস খুলিয়া বসে—

> "পীরিতি বলিয়া, এ তিন আঁখর
> এ তিন ভুবন সার।"

অরুণ বুঝিতে পারে না, কেন একদিন উমা গল্পোচ্ছ্বাসে হাস্যময়ী, আবার অন্যদিন গম্ভীরা স্বল্পভাষিণী। উমা তাহার কাছে রহস্যময়ী হইয়া ওঠে। নদীর স্রোতের জোয়ার-ভাঁটার মত উমার মানসলোকে যে আনন্দস্রোত কখনও প্রবল, কখনও মৃদু হয়, তাহার রহস্য অরুণ কিছুই জানে না। অরুণ ভাবে উমা দিন দিন বড় 'মুডী' হইয়া উঠিতেছে। তাহার মন খারাপ হইয়া যায়।

অরুণের অন্তরও মধ্যে মধ্যে বিষণ্ণতার ভারে আনত হইয়া পড়ে। এ বিষাদের সে কারণ খুঁজিয়া পায় না। সৃষ্টির মূলে কোন্ না-পাওয়ার বেদনা আছে, এ বুঝি 'এলিমেণ্টাল মেলান্‌কলি', গভীর আনন্দের সহিত এ বেদনা ছায়ার মত জড়িত; এই বিষণ্ণতা কবি শেলীর জীবনেও ছিল।

শেলী অরুণের অতি প্রিয়, শেলীকে তাহার পূজা করিতে ইচ্ছা করে—শেলীর প্রেম, সমাজ-বিদ্রোহ, ভাবুকতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, উদাসতা, আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তৃষ্ণা—শেলীর মনের সহিত তাহার মনের গভীর মিল আছে, সে যদি শেলীর মত কবিতা লিখিতে পারিত!

যৌবনের উচ্ছলিত আনন্দে বিষাদের অন্ধকার কাটিয়া যায়। চারিদিকে যেন কোন অভাবনীয় রহস্য, মাধুর্য্যের আবর্ত্ত।

দিন অপেক্ষা রাত্রি তাহার ভাল লাগে। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সে বই পড়ে। ঠাকুমা মাঝে মাঝে আসিয়া বলিয়া যান, এখনও পড়ছিস, যা ঘুমোতে যা।

অরুণ বই বন্ধ করে, কিন্তু ঘুমাইতে যায় না। বারান্দায় চুপ করিয়া বসে অথবা বাগানে নামিয়া যায়।

মেঘহীন আকাশে চন্দ্র একাকী, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত নীলিমার বিস্তার, ফাল্গুন রাত্রির নিস্তব্ধ উদার শুভ্রতা, ছায়াস্নিগ্ধ তরুশ্রেণীর গন্ধভরা অন্ধকার, জ্যোৎস্নানিশীথের নৈঃশব্দে সে নিজ হৃদয়ের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া যায়, বাহিরের সকলে অজানা, কোন্ রহস্যময় জীবনপথে সে একাকী পথিক। আম্রবন তালবন মর্ম্মরিত হইয়া ওঠে, সমস্ত আকাশ যেন কি কথা বলিতে চায়, অব্যক্ত বেদনায় পাণ্ডুর। অরুণের চোখে জল আসে।

কোন চৈত্রের রাত্রে যৌবনের মত্ততা লাগে। ইচ্ছা হয়, সমস্ত রাত্রি নিদ্রাহীন কাটাইয়া দেয়। মধ্যাহ্নরৌদ্রের প্রখর শুভ্রতার মত

জ্যোৎস্না। কোন্ বিশ্বব্যাপিনী মায়াবিনী অবগুণ্ঠন খসাইয়া তাহাকে ইঙ্গিত করে। প্রাচীন উদ্যানের ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার খুলিয়া অরুণ মাঝে মাঝে সুপ্তসৌধ কলিকাতার জনবিরল স্তব্ধ পথে বাহির হইয়া যায়। কল্পনা করে, এই বুঝি কালিদাসের উজ্জয়িনীর রক্তাশোক ও বকুলতরুর বীথিকা, কুসুম্ভরঞ্জিত বস্ত্রপরিহিতা কোন অভিসারিকা কুঙ্কুমপুষ্পরঞ্জিত অঙ্গবাসে চন্দনলিপ্ত বক্ষ ঢাকিয়া তাহার পার্শ্ব দিয়া চঞ্চল পদে চলিয়া যাইবে, কণ্ঠে নবকর্ণিকার মালা, কেশে নবমল্লিকার হার দুলিবে, মুখমণ্ডল লোধ্ররেণু-মাখা। অথবা এ বুঝি হারুন্-অল্-রশিদের বোগদাদ, বক্র সঙ্কীর্ণ ষড়যন্ত্রসঙ্কুল পথ, পথপার্শ্বের কোন রহস্যাবৃত প্রাসাদের গোপনদ্বার খুলিয়া সুন্দরী শাহারজাদী তাহাকে উপন্যাস শোনাইতে আহ্বান করিবে, জাফ্রান-রঙের পায়জামা-পরা কাফ্রী খোজার উন্মুক্ত তরবারী অন্ধকারে ঝিকিমিকি করিবে।

স্বপ্নাবিষ্টের মত ঘুরিতে ঘুরিতে অরুণ কোন রাত্রিতে অজয়দের বাড়ির নিকট আসিয়া চমকিয়া ওঠে, কোন রাতে বা জয়ন্তকে ডাকিয়া বাহির করে, দুই জনে নিরুদ্দেশ হাঁটিতে হাঁটিতে গঙ্গার তীর পর্যন্ত চলিয়া যায়। নিস্তরঙ্গ নদীজলে নৌকাগুলি যেন সমুদ্রগামী বিহঙ্গের দল ডানা মুড়িয়া নিদ্রিত, জলস্থলে শুভ্র গভীর শান্তি। যৌবনবেদনাস্পন্দিত অন্তরে অরুণ এই গভীর শান্তি অনুভব করে, অতলস্পর্শ আনন্দ। ফিরিবার সময় জয়ন্ত জোরে চলিতে পারে না, ফিটন-গাড়ী ভাড়া করিয়া বাড়ি ফিরিতে হয়।

কোন রাতে সে লিভিংষ্টোনের জীবনী, নেপোলিয়নের জীবনী বা ইনসারফ ও এলেনার করুণ প্রেমকাহিনী পাঠে নিমগ্ন হইয়া যায়।

রাত্রে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরিলে, শিবপ্রসাদ অরুণকে গল্প করিতে

ডাকেন। আইয়োনিক থামওয়ালা আলোছায়াময় প্রশস্ত বারান্দায় বসিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত গল্প হয়।

—কিন্তু পড়ছিস্ খোকা, ডাওডেনের শেলী, বইখানা আমার ভাল লাগে না। শেলীর ঠিক বিচার হয় নি।

—কিন্তু অক্সফোর্ডে তোমরা তাঁর যা বিচার করেছিলে!

—শেলী অক্সফোর্ডে ছিলেন, ঠিক, ইউনিভারসিটি কলেজে, পাগল শেলী!

—পাগল বই কি! অত বড় কবিকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিলে!

—আরে তখন কে জানত ওই পাগল অত বড় কবি হবে।

—ওই ত, যৌবনকে তোমরা সম্মান কর না। আচ্ছা, তোমার কোন্ কলেজ ছিল কাকা?

—বেলিয়ল। তোরা শুধু বই পড়েই মরিস, ইউনিভারসিটি-জীবনের আনন্দের স্বাদ পেলি না।

শিবপ্রসাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল, বেলিয়লের তোরণ-দ্বার, বুরুজ, গীর্জ্জার চূড়া। যৌবনের অক্সফোর্ড স্বপ্নের মত মনে হয়।

—আমার ভারি ইচ্ছে করে কাকা, অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে গিয়ে পড়ি। দ্বিজেন কেম্ব্রিজে ভর্ত্তি হয়েছে।

—এখানকার পড়া আগে শেষ কর। আমার মোটেই ইচ্ছে নয় তুমি ইংলণ্ডে যাও।

—কেন কাকা?

—ইউরোপ যেন মোহিনীর মত সবাইকে ডাকে, তুমিও একদিন যাবে জানি। শোন অক্সফোর্ডের গল্প বলি।

অক্সফোর্ড! কত স্বপ্ন কত স্মৃতি; ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে স্থাপিত প্রাচীন কলেজগুলি! সুন্দর প্রাচীন, গীর্জ্জাগৃহ, তোরণ,

কলেজ-হল ! ক্ষুদ্র নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়াছে, এদেশ ও নদীকে খাল বলিবে, ওই ছোট নদীতে নৌকা বাহিবার কি ধুম ! সেণ্ট মেরী দি ভার্জ্জিন গীর্জ্জার চূড়াটি বড় সুন্দর, শীতের প্রভাতে কুয়াসার মধ্যে পাথরের গীর্জ্জা স্বপ্নের মত দেখায়। সন্ধ্যায় হাই ষ্ট্রীট !

অক্সফোর্ডের গল্প বলিতে শিবপ্রসাদ মাতিয়া ওঠেন। ঘড়িতে বারটা বাজে, অরুণ শুইতে চলিয়া যায়। শিবপ্রসাদের ঘুম আসে না।

ষ্টেলা ছিল তাঁহার সহপাঠী বন্ধু মরিসের ভগ্নী। অক্সফোর্ডে এইট উয়িক্সের উৎসবে তাহাদের প্রথম দেখা হইয়াছিল। সকলে তাঁহার ঘরে লাঞ্চ খাইয়াছিল। সে যেন কোন্ পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি। তখন কত উত্তম, কত আশা, কত প্রেমস্বপ্ন। জীবন যে এরূপ ভাবে ব্যর্থ তুচ্ছ হইবে, কে ভাবিয়াছিল !

২৮

সর্ব্বক্ষণ কল্পলোকে বাস করা চলে না। সংসারে রোগ দুঃখ নানা সমস্যা রহিয়াছে।

পূজার ছুটি শেষ হয়-হয়। শেষরাতে প্রতিমা আসিয়া অরুণকে ঠেলিয়া জাগাইল।

—দাদা, দাদা, শীগগীর ওঠ।

চমকিয়া জাগিয়া অরুণ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—কি হয়েছে, কি ডাকাত পড়ল নাকি!

—ঠাকুরমার বড় অসুখ।

—ঠাকুমার?

ঠাকুমাকে কখনও অসুস্থ হইতে দেখা যায় নাই। প্রতিমার পাংশু মুখের দিকে অরুণ ভীতভাবে চাহিল।

—হাঁ, ঠাকুরমার শেষরাত থেকে বমি হচ্ছে।

—জ্বালালে।

অরুণ বিছানা হইতে উঠিয়া চোখ মুখ ধুইয়া পাঞ্জাবীটা খুঁজিতে লাগিল।

—ডাক্তার এসেছে?

—না, কাকাকে এখনও জাগান হয় নি। তুমি একবার হরিসাধন-দাদাকে ডেকে পাঠাও।

—হরিসাধন কি করবে?

বিরক্তির সহিত অরুণ প্রতিমার দিকে চাহিল। প্রতিমা কি

তাহাকে অপদার্থ মনে করে! হরিসাধনের উপর তাহার এত নির্ভর বিশ্বাস। অবশ্য হরিসাধন রোগীর সেবা করিতে অত্যন্ত পারদর্শী।

অরুণ দারোয়ানকে ডাকিয়া ডাক্তার বসুর নিকট চিঠি পাঠাইল, কাকাকে জাগাইয়া তুলিল, হরিসাধনকেও একটি চিঠি লিখিতে হইল। প্রতিমার মনে সে ব্যথা দিতে পারে না।

সমস্ত বাড়িতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

বয়সবৃদ্ধির সহিত ঠাকুমা লোভী হইয়া পড়িয়াছেন। গত রাত্রে কোন দোকানের বাসী মিষ্টান্ন অধিক পরিমাণে খাইয়াই এই কাণ্ড।

ঠাকুমা সারিয়া উঠিলেন, শিবপ্রসাদের অসুখ হইল।

কিছুদিন হইতেই তাঁহার শরীর ভাল যাইতেছিল না। পূজার সময়ে সকলে চেঞ্জে যাবার কথা ছিল, কেন যে যাওয়া হইল না, অরুণ বুঝিতে পারিল না।

জ্বর কয়েকদিন ধরিয়া চলিল, ছাড়িতে চায় না। রক্তপরীক্ষা করিয়া দেখা গেল ম্যালেরিয়া নয়। টাইফয়েড নয় ত?

শিবপ্রসাদ হাসিয়া হাসিয়া বলেন—জ্বরটা কি জন্যে জানি, লিভার। কিন্তু কোন উপায় নেই ডক্টর বোস্।

ডাক্তার বসু বলিলেন—এবার মদটা ছাড়তে হবে।

শিবপ্রসাদ বলিলেন—তার চেয়ে আত্মহত্যা করতে বলুন।

শিবপ্রসাদ অসুস্থ হওয়াতে অরুণ তাঁহাকে অত্যন্ত নিকটে পাইল। অন্য সময় তাঁহার সহিত দেখা, গল্প করা অধিকক্ষণ হইয়া উঠে না।

অবসর পাইলেই অরুণ শিবপ্রসাদের রোগশয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিত, গ্রামোফোন বাজাইত, বই পড়িয়া শোনাইত, বেহালা বাজাইত নানা

গল্প হইত। অরুণের মনে হইত, শিবপ্রসাদের জীবনে কোথায় ব্যর্থতা, গভীর বেদনা আছে, অল্প বয়সে সে তাঁহার জীবনের রহস্য বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। কাকার প্রতি তাহার গভীর প্রীতি ও সমবেদনা জাগিত।

রাত বারটা হইবে। অরুণ শুইয়াছিল, ধীরে বিছানা হইতে উঠিল। ঘুম আসিতেছে না। অন্ধকার আকাশ। সমস্ত দিন অবিশ্রাম বৃষ্টি হইয়াছে। এখন বৃষ্টি থামিয়াছে। বারিসিক্ত বৃক্ষশাখাগুলিতে ঝোড়ো বাতাস ক্ষ্যাপা কুকুরের মত আর্ত্তনাদ করিতেছে, সাশীর কাচ ঝন্ ঝন্ শব্দে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

সহসা ছকু খানসামা দরজায় টোকা মারিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

—খোকা বাবু, সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

—কাকা? আমায় ডাকছেন?

—হাঁ জল্‌দি আসতে বললেন।

অরুণের বুক কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ কাকার কি অসুখ বাড়িল। আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সে কাকাকে নিদ্রিত দেখিয়া আসিয়াছে।

বৃহৎ শয়নগৃহ অল্পালোকিত। পুরাতন পঙ্খের কাজ-করা মলিন দেওয়ালে খাটের, চেয়ারের, আলমারীর কালো ছায়া পড়িয়াছে। ক্লারেট-রঙের ভারী পর্দ্দাগুলি কালো দেখাইতেছে।

শিবপ্রসাদ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—খোকা আয়, একটা বিশেষ কথা আছে। ছকু খানসামাকে তিনি চলিয়া যাইতে বলিলেন। অরুণ ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে হতভম্বের মত দাঁড়াইল। শীতল স্তব্ধ গৃহ। বাহিরে জলো বাতাসের একটানা হু হু শব্দ।

—আয় কাছে আয়।

অরুণ শিবপ্রসাদের মাথার নিকট আসিয়া বলিল—শরীরটা কি খারাপ মনে হচ্ছে?

—না, না, ভালই আছি। এই চাবিটা দিয়ে আমার ডেস্কের নীচের ড্রয়ারটা খোল্ ত।

রোল-টপ বৃহৎ ডেস্ক। চাবি দিয়া অরুণ নীচের ড্রয়ার খুলিল।

—চিঠির বাণ্ডিলের তলায় একটা ফটো দেখ্‌বি, নিয়ে আয় ত—ওই ফ্রেমে-বাঁধানোটা নয়, আর একটা ছোট ফটো।

অরুণ একটি পোষ্টকার্ড ফটো বাহির করিল।

—হাঁ, ওইটা, মাথার আলোটা জেলে দে।

শিবপ্রসাদ ফটোটি দৃঢ়হস্তে ধরিয়া কিছুক্ষণ দেখিলেন, তারপর অরুণের হাতে দিলেন।

সমুদ্রতীর। তটভূমিতে তরঙ্গগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সমুদ্রতীরে নীলনয়না সুরূপা এক ইংরেজ-ললনা একটি ছোট পাথরের পাশে দাঁড়াইয়া, বাতাসে তাহার চুল উড়িতেছে, স্কার্ট উড়িতেছে। তাঁহার পার্শ্বে কোটপ্যাণ্ট-পরিহিত একটি ভারতীয় যুবক।

—ওই তোর কাকী।

—কাকী?

—হাঁ, আমার স্ত্রী। এটা ওর বিয়ের আগের ফটো, আমরা টকিতে তুলেছিলুম।

অরুণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—ওই রূপার ফ্রেমে বাঁধান ছবিটাও নিয়ে দেখ।

চিঠির বোঝা হইতে অরুণ ফটোটি আনিল। আলোকের তলায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, ওই ইংরেজ-মহিলার ফটো. মাথায় কৃত্রিম

ফুলভরা টুপি, কলকাওয়ালা কাশ্মীরী শাল হইতে তৈরী জামা ও স্কার্ট। ইনি অরুণের কাকীমা!

এখন কোথায় ইনি? কেন ইনি কাকার সঙ্গে আসেন নাই? হয়ত ইনি জীবিত নাই।

অরুণ কিন্তু কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—ছবিগুলো রেখে দে ডেস্কের ভেতর। কথাটা তোকে জানিয়ে রাখলুম, যদি হঠাৎ মরে যাই।

—কি যে বলো কাকা!

—না, এ অসুখটা কিছু না, সেরে উঠব, কিন্তু আমার হঠাৎ মৃত্যু হবে দেখ্‌বি। জীবন ত এই বুকের ধুকধুকানি, পাম্পের মত হার্ট সারাক্ষণ চলছে, কল একটু যদি বিগড়ায়, ব্যস্‌,—ফিনিস্‌—সব আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেম স্বপ্ন শেষ!

—কাকা!

—ডেস্কটা বন্ধ কর। চাবিটা ওইখানেই রাখ। আচ্ছা, শুতে যা। আমি বেশ ভালই আছি। ভয় নেই। আর দেখ্‌ এ-কথা কাউকে আর জানাবার দরকার নেই।

—নিশ্চয়।

—আর ছকু খানসামাকে ডেকে দে। ওই জানালাটা খুলে দে।

—বাইরে বড় ঠাণ্ডা বাতাস, আবার বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল দেখছি।

—আচ্ছা ছকুকে ডেকে দে। গুড্‌ নাইট।

অরুণ ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইল। ছকুকে ডাকিল না। ছকু গেলেই, মদ আনিবার হুকুম হইবে।

২৬

শুধু নিজ পরিবারের নয়, বন্ধুবান্ধবদের পরিবারের নানা সমস্যার সমাধান করিতে হয়।

এক সন্ধ্যায় মামীমা অরুণকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন—উমা ত কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না।

অরুণ বিস্মিত জিজ্ঞাসুভাবে মামীমার দিকে চাহিল, যেন উমার এ মতের জন্য অরুণ দায়ী।

—ওঁর ইচ্ছা, উমার শীগগীর বিয়ে দিয়ে দেন। একটি ভাল ছেলেও পাওয়া গেছে।

ছেলেটি কে অরুণ জিজ্ঞাসা করিল না। একটি নূতন উকীল তাহার মামার মোটর হাঁকাইয়া প্রায়ই আসে। কালো, মোটা, বেঁটে, মুখে কথার খই ফুটিতেছে, সে যে অত্যন্ত চালাক, ইহাই সবাইকে বোঝাইতে চায়। সে হইবে উমার স্বামী!

অরুণ ধীরে বলিল—কি বলে উমা?

—ও বলে বি-এ পাস না ক'রে বিয়ে করবে না। আর উনি বলছেন, বি-এ পাস করলে উমার পছন্দ হয়ে যাবে উঁচ. সে আর সহজে বিয়ে করতে চাইবে না।

—তোমার কি মত মামী?

—বাবা, আমার আবার মত? তবে ও মেয়ে যা একগুঁয়ে, ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া চলবে না।

অরুণ ধীরে বলিল—উচিতও হবে না। ওকে পড়তে

দাও মামী, বিয়ে ত সবাই করছে, ওর হয়ত জীবনের অন্য কোন আদর্শ আছে।

মামী বলিলেন—আমারও তাই মনে হয়। সব মেয়ে যে ঘরসংসার করবে এমন কোন কথা নেই। তবে, তার চেয়ে বড় কাজ যদি থাকে, তবেই ত বিয়ে না-করা ঠিক হবে।

সংসারের নানা দুঃখ চিন্তা কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া যাইবার একটি অপূর্ব্ব স্থান অরুণ একদিন অত্যাশ্চর্য্যকরভাবে আবিষ্কার করিল।

শীতের সন্ধ্যা। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হইতেছে। পথ কাঁদায় ভরা। অরুণ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট যাইতেছিল, কোন নূতন ইংরেজী উপন্যাস বা ম্যাগাজিন কিনিবে।

সহসা ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। জলসিক্ত ধুমকুণ্ডলী নিরানন্দ নগরের উপর আতঙ্কের মত।

সম্মুখে একটি বায়স্কোপ-হল দেখিয়া অরুণ তাহার বারান্দায় উঠিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইল। বড় একা, বড় মন খারাপ লাগে।

টিকিট কিনিয়া সে বায়স্কোপ-গৃহে প্রবেশ করিল। ছবি দেখান কিছুক্ষণ সুরু হইয়াছে।

অন্ধকার বিরাট গৃহ। সাদা পর্দ্দার ওপর সাদায়-কালোয় নানা ছায়াছবি—মানবের কামনা, লালসা, ঈর্ষা, বেদনার অত্যাশ্চর্য্যকর মূক অভিনয়। অর্দ্ধনগ্না নারীদের সিন্ধু-তরঙ্গে স্নানলীলা, রসভারাক্রান্ত দ্রাক্ষাফলের মত যুবতী-তনু! তন্বী নটিগণের রঙ্গমঞ্চে নৃত্যোৎসব; প্রেমিক-প্রেমিকার মত্ত উল্লাস; আবেগময় ভঙ্গী, ভাবের অত্যুক্তি অতিরঞ্জিত অভিনয়। এ যেন এক মদিরামত্ত অবাস্তবলোক। প্রতি-

দিনের তুচ্ছতা, বিষাদ, বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে এই অন্ধকার গৃহে ছায়াচিত্রের জগৎ অনাস্বাদিত চঞ্চল পুলকময়।

কোন দিন মন খারাপ হইলে অরুণ বায়স্কোপে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল।

সবদিন একা যাইতে ভাল লাগে না।

একদিন সে উমাকে নিরালায় বলিল—উমা, চল, বায়স্কোপ যাবে?

উমা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিল—কি বলছ?

—বলছি, বায়স্কোপ দেখতে যাবে, একটা ভাল ফিল্ম এসেছে।

কলেজের এক সহপাঠিনীর কাছে ফিল্মটির খুব সুখ্যাতি শুনিয়াছে। উমা চুপ করিয়া রহিল।

—শোন, গাড়ী এনেছি, মামীমাকে ব'লে আসি তুমি আমার সঙ্গে মার্কেটিং করতে যাচ্ছ, তোমার ত কি সব কেনবার ছিল।

—লোভ হচ্ছে বটে।

—চল, বেশ ভাল লাগবে।

বায়স্কোপ দেখিয়া তাহারা বহুক্ষণ মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে ঘুরিল, কেক, ফল কিনিল, ইংরেজী সচিত্র মাসিক পত্রিকা কিনিল। তাহারা যেন কোন স্বপ্নের ঘোরে চলিয়াছে। আলোক বড় উজ্জ্বল, জীবন উল্লাসময়।

বাড়ির সিঁড়িতে চন্দ্রা অরুণকে বলিল—অরুণদা, জানি তোমরা কোথায় গেছলে?

উমা একটু ভয় পাইয়া বলিল—কোথায় রে?

চন্দ্রা গম্ভীর ভাবে বলিল, বায়স্কোপ।

অরুণ চন্দ্রার হাতে কেক ও ডালমুটের ঠোঙা দিয়া বলিল—বা, আমরা ত মার্কেটিং করছিলুম।

ডালমুট পাইয়া চন্দ্রা বলিল—আচ্ছা, আমি মাকে বলব না, আমায় এক দিন নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

উমা বলিল—কি পাকা মেয়ে।

চন্দ্রা বলিল—তাই ত! কেকগুলি বেশ!

ইহার পর অরুণ উমাকে একা বায়স্কোপে লইয়া যাইতে সাহস করিত না, অজয় ও শীলাকেও লইয়া যাইতে হইত। একা বায়স্কোপ যাইতেও তাহার ভালো লাগিত না।

২৭

শিবপ্রসাদ সারিয়া উঠিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সজীবতা, সহজ আনন্দহাস্য আর রহিল না। হঠাৎ তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। শুধু তাঁহার দেহের নয়, তাঁহার মনেরও যেন কোথাও ভাঙন ধরিয়াছে। কোন-কোন দিন তিনি বাড়ি হইতে কোথাও বাহির হন না, পাজামার ওপর হলদে-কালো ডোরা-কাটা ড্রেসিং গাউন পরিয়া শীতের দিনগুলি বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুইয়া কাটাইয়া দেন। হাতে কোন ফরাসী বা ইতালীয়ান উপন্যাস বা কবিতার বই থাকে বটে কিন্তু বই পড়াতে মন থাকে না। অরুণ শঙ্কিতভাবে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, কাকা তোমার শরীরটা আজ ভাল নেই? শিবপ্রসাদ হাসিয়া বলেন, না, না, আমি বেশ আছি, আজ কোর্টে যেতে ইচ্ছে করছে না। তুই কারদুচি পড়েছিস? Hymn to Satan কবিতাটি চমৎকার।

অরুণ শিবপ্রসাদের সহিত নানা গল্প করিতে চায়, গল্প জমে না, কথা কহিতে কহিতে শিবপ্রসাদ অন্যমনস্ক হইয়া যান। কখনও অরুণের মুখের দিকে চুপ করিয়া বিষন্ন নয়নে চাহিয়া থাকেন, অরুণের কেমন ভয় করে।

সন্ধ্যার সময় প্রায়ই মাড়োয়ারী, ইহুদী নানা প্রকারের লোক আসে। নীচে লাইব্রেরী-ঘরে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়। কখনো শিবপ্রসাদ রাগিয়া যান, কখনো তাহারা চেঁচাইয়া ওঠে। অরুণ ভাবে, তাহারা শিবপ্রসাদের মক্কেল। কিন্তু পূর্ব্বে কাকাকে মক্কেলের সহিত এরূপ বাকবিতণ্ডা করিতে সে কখনও দেখে নাই।

সন্ধ্যার পর কিন্তু শিবপ্রসাদ বাড়ি থাকেন না, সান্ধ্য-সজ্জা করিয়া মোটর চড়িয়া বাহির হন। গভীর রাত্রে মত্তাবস্থায় বাড়ি ফেরেন। পূর্ব্বে অরুণ শিবপ্রসাদের আসিবার পূর্ব্বেই শুইয়া পড়িত। কিন্তু এখন শিবপ্রসাদ বাড়ি না ফিরিলে তাহার ঘুম হয় না। তাহার কেমন ভয় করে।

থার্ড ইয়ারের শেষ ভাগে হঠাৎ এক অসুস্থতায় অরুণের জীবনের গভীর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

শীতের শেষে ঋতুপরিবর্ত্তনের সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া অরুণের জ্বর হইল, বুকে সর্দ্দি বসিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এখন নিউমোনিয়া হয়ে না দাঁড়ায়।

সমস্ত দেহে অসহনীয় বেদনা, স্নায়ু ও মাংসপেশীগুলি যেন কে টানিয়া পাকাইয়া মোচড়াইয়া কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়। নিদারুণ ব্যথায় তিন দিন অর্দ্ধঅচৈতন্যভাবে কাটিয়া গেল। চারিদিকে অবাস্তব কালো ছায়া; মলিন দেওয়ালে কাহাদের বিভীষিকাময় কৃষ্ণমূর্ত্তিগুলি নাচিয়া বেড়ায়! বৃহৎ খাটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অরুণ গোঙাইয়া পাক খাইয়া ঘোরে, ছায়াগুলি অট্টহাস্যে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে। ভীত হইয়া অরুণ উঠিয়া বসিতে চায়, ঠাকুমা তাহাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দেন, ব্যথিত স্বরে বলেন, অরু বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা? অসুখ হওয়ার পর হইতে ঠাকুমা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অরুণের নিকট বসিয়া আছেন। ভয়ে তাঁহার বুক দুরু দুরু কাঁপে। বড় দুর্ভাগিনী তিনি।

অরুণের বাষ্পভরা বেদনাবিহ্বল চোখের উপর ঠাকুমার করুণ শীর্ণ মুখের আবছায়া মাঝে মাঝে ভাসিয়া ওঠে, আরও কত মুখ প্রেতের মত বহিয়া যায়। কাকার শুষ্ক শঙ্কিত মুখ, প্রতিমার ভীতিবিহ্বল মুখ,

দিদির অশ্রুসিক্ত মুখ, মামীমার স্নেহস্নিগ্ধ মুখ, নানা মুখের ছায়ামূর্ত্তি। কখন কখন অরুণ স্থির নয়নে চাহিয়া থাকে, এই বুঝি উমার অনুপম চিরবাঞ্ছিত মুখকান্তি। সে মুখ দেখিতে পায় না, চোখ বুজিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে গোঙাইয়া ওঠে। অরুণের কাতরধ্বনি শুনিয়া ঠাকুমা চোখের জল রাখিতে পারেন না। খাটের মাথায় দক্ষিণ দেওয়ালে অরুণের মাতার বৃহৎ অয়েল-পেন্টিঙের দিকে চাহিয়া তিনি মনে মনে প্রার্থনা করেন, বৌমা তোমার অরু ঘোষবংশের শেষ-প্রদীপ, একে তুমি এত শীগগির ডেকে নিও না।

চতুর্থ দিনে জ্বর ছাড়িয়া গেল, বেদনারও উপশম হইল। সপ্তম দিনে অরুণ রুটি ও মুরগীর সুপ খাইল। দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল! ডাক্তার বলিলেন, হার্ট একটু খারাপ হয়েছে, কোনরূপ নড়াচড়া করলে চলবে না, কিছুদিন বিছানাতে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে।

ক্ষীণদেহে কর্ম্মহীন রোগশয্যায় শুইয়া থাকিয়া অরুণ এক নব জীবনানুভূতি লাভ করিল। অতি ক্ষীণদেহ হইতে তাহার তীক্ষ্ণ কল্পনাপ্রবণ মন যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তেমনি তাহার সত্তা চারিদিকে প্রবহমান জীবনস্রোতের তীরে স্থির, একাকী, অচঞ্চল দ্রষ্টার মত বসিয়া। ঠাকুমা ঔষধ খাওয়ান, ছকু খানসামা সুপ লইয়া আসে, প্রতিমা গান গায়, অজয় আসিয়া গল্প করে, পলাশ গাছে একটি পাখী ডাকে, একটি বোলতা ঘরে ভন্ ভন্ করিয়া ঘোরে, তালগাছের ওপর চাঁদ ওঠে, এ সকল ঘটনা যেন কোন বৃহৎ রঙ্গমঞ্চে পুতুলনাচের মত ঘটিয়া যায়, সে শুধু স্তব্ধ দর্শক।

এই বিজনতা, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবজীবনধারা হইতে বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্বের অনুভূতি অরুণের চিত্তে অসুস্থতার পর হইতে গভীরভাবে জড়াইয়া গেল ঃ

সন্ধ্যার সময় অনেক বন্ধুবান্ধব দেখিতে আসে, ঘরে আড্ডা বসিয়া যায়,—জয়ন্ত, অজয়, বাণেশ্বর, হরিসাধন, দিদি, মামীমা, চন্দ্রা, রীতিমত ভীড় হয়। উমাও মাঝে মাঝে আসে। ইহাদের মধ্যে বাণেশ্বর ও চন্দ্রা নিয়মিত ভিজিটর।

চন্দ্রা ঘরে প্রবেশ করিলেই অরুণ জিজ্ঞাসা করে, মামী এলেন না?

চন্দ্রা গম্ভীরভাবে বলে, মা বলেছেন আজ আর আসতে পারবেন না, অনেক কাজ, বাবার শরীর ভাল নেই কি না।

অরুণ তখনও খোলা দরজার দিকে চাহিয়া থাকে। মামীমার সহিত উমা প্রায়ই আসে। আজ সে আসিল না।

চন্দ্রা অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া বলে, দিদির ত কলেজ থেকে এসেই মাথা ধরেছে, তার ঘরে শুয়ে আছে। কেমন আছ আজ অরুণদা?

অরুণ আনমনা হইয়া যায়। উমার ঘরের দরজার খয়ের রঙের পর্দাটি তাহার চোখের সম্মুখে দুলিতে থাকে। ওই পর্দার আড়ালে ছোট ঘরটিতে সে কখনও প্রবেশ করে নাই। ইচ্ছা করে একবার সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া চুপ করিয়া একটু বসিয়া থাকিবার অধিকার পায়।

চন্দ্রা বলে, অরুণদা, তুমি আরব্যোপন্যাস আনতে বলেছিলে, এই নাও।

রোগশয্যায় শুইয়া অরুণের কোন আধুনিক উপন্যাস পড়িতে ভাল লাগে না। ছেলেবেলায়-পড়া রূপকথা উপকথা অসম্ভব উপাখ্যান সব পড়িতে ভাল লাগে।

রাতে অরুণের ঘুম ভাঙিয়া যায়। অন্ধকার স্তব্ধ গৃহ। চাঁদের আলো শার্সীর কাচে ঝক্‌মক্ করে। মাকড়সার জালের মত অতি সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া কল্পনা কি মায়াজাল বুনিতে চায়! অরুণ ভাবে, প্রেম কি?

কেন এক যুবক এক তরুণীকে ভালবাসে? কেন ভালবাসি? এ যেন কোন অন্ধ নির্ম্মম শক্তি, হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, জীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, তবু ভালবাসি। প্রেমের রহস্য যে জানিতে পারিবে সে জীবনের রহস্য জানিতে পারিবে। ভাবিতে ভাবিতে সে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

একদিন অরুণ বলিল, বাণেশ্বর বলতে পার প্রেম কি?

বাণেশ্বর হাসিয়া উঠিল, কার মত জানতে চাও, বাৎসায়ন না ফ্রয়েডের?

—আমি তোমার মত জানতে চাই।

—Love is a divine mystery.

—বল কি তুমি, এ যে জয়ন্তের কথা, কবির কথা। আচ্ছা তুমি কখনও প্রেমে পড়েছ?

—কেন, আমি তর্ক করি ব'লে কি কাউকে ভালবাসতে পারি না।

—প্রেমে যে বিচার তর্ক চলে না। এ এক বিচারহীন হৃদয়াবেগ। ঠিক বলেছ, প্রেম মহারহস্য, মৃত্যুর মত।

—এ সব কথা না ভেবে, তোমার বোনকে ডাক, গান শোন।

—না, আজ গান নয়। গান মনকে বড় উদাস করে তোলে।

—কিন্তু আমাকে ভাবতে সাহায্য করে।

বাণেশ্বর খোলা দরজার দিকে বার-বার চাহিতে লাগিল।

অরুণ নিজ চিন্তায় এত মগ্ন ছিল যে সে লক্ষ্য করিল না, প্রতিমা ঘরে প্রবেশ করিতে বাণেশ্বরের মুখ কিরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

২৮

পুরাতন বাড়ির সিমেণ্ট-ওঠা বড় উঠান ঘেরিয়া তিন দিকে ঘরের সারি। দোতলায় পূর্ব্বদিকে কোন ঘর নাই, খোলা ছাদ, ছাদের দেওয়াল উঁচু উঠিয়া গিয়াছে।

উমার ঘরটি দোতলায় পূর্ব্ব-উত্তর কোণে, ছোট্ট ঘর। পূর্ব্বে উহা বাক্স-পেটরা রাখিবার ঘররূপে ব্যবহৃত হইত। দোতলায় আর খালি ঘর নাই। একতলার ঘরগুলি স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার। সেজন্য এই ছোট ঘরখানিই উমাকে লইতে হইয়াছে। স্কুলে পড়িবার সময় তিন বোন এক বড় ঘরে শুইত। কলেজে ভর্ত্তি হইয়া উমা বলিল, তাহার আলাদা ঘর না হইলে পড়ার অসুবিধা হয়, তাহাকে অধিক রাত্রি জাগিয়া পড়িতে হয়, ঘরে আলো জ্বলিলে শীলার ঘুম হয় না।

সরু ছোট ঘরটিতে এক ছোট তক্তপোষ, এক ছোট টেবিল একখানি চেয়ার ও একটি নীচু আলমারী ঠাসাঠাসি করিয়া রাখা। আলমারীতে অর্দ্ধেক বই ও অর্দ্ধেক শাড়ী ভরা। পূর্ব্বে ও উত্তরে দুই ছোট জানালায় পুরাতন সিল্কের শাড়ীর সোনালী পাড়-দেওয়া নীল পর্দ্দা টাঙান। উত্তরের জানালা দিয়া পাশের বাড়ীর ভাঁড়ার-ঘর দেখা যায়, সেজন্য জানালাটি সারাদিন বন্ধ থাকে। পূবের জানালা দিয়া দেখা যায়, খানিকটা পোড়ো জমি, সরু গলির প্রান্তে ল্যাম্প-পোষ্ট, একটি অযত্ন-বর্দ্ধিত আমগাছ। দক্ষিণমুখী দরজায় খয়ের রঙের পর্দ্দা সব সময়ে ঝোলে। এই পর্দ্দা তুলিয়া ঘরে প্রবেশের অধিকার কাহারও নাই, এই পর্দ্দা সরাইয়া প্রিয়া তরুণীর আশা-ভরা খুশী-ভরা সাজানো ঘরটিতে

ক্ষণিকের জন্য শান্তভাবে বসিয়া থাকিবার আনন্দলাভ করিতে অরুণ তৃষিত। অরুণ কিন্তু ঠাট্টা করিয়া বলে, উমার 'ডেন্'।

উমা এই ক্ষুদ্র গৃহটি অধিকার করিয়াছে কেবলমাত্র পড়াশোনা করিবার জন্য নয়। গৃহের সম্মুখে চওড়া ঢাকা বারান্দাতেই বেশীক্ষণ পড়াশোনা করিতে হয়। এই গৃহটি উমার শান্তির আশ্রয়, স্বাধীনতার প্রতীক, a room of one's own. এই গৃহে সে আপন খুশীমত বসিতে, শুইতে, ভাবিতে, পড়িতে পারে। পূবের জানালা খুলিয়া দিয়া বিছানায় এলাইয়া .শুইয়া নানা আজগুবি চিন্তা করিতে পারে। এখানে সে হঠাৎ গান গাহিয়া ওঠে, মুখ গম্ভীর করিয়া বসে, আয়নায় নিজের মুখ যতক্ষণ ইচ্ছা দেখে, আপন মনে হাসিয়া ওঠে, চুলের বিনুনী খুলিয়া যেমন ইচ্ছা চুল বাঁধে, হাসি পাইলে হাসে, কান্না পাইলে মন খুলিয়া কাঁদিতে পারে, কেহ প্রশ্ন করিবে না, বারণ করিবে না, অযথা সহানুভূতি দেখাইয়া বা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে না তাহার কি হইয়াছে। যুবতী-চিত্তের নানা চাঞ্চল্য প্রকাশের এখানে কোন বাধা নাই। এখানে মা আসিয়া বলিতে পারেন না, কি ব'সে ব'সে ভাবছিস; শীলা গলা জড়াইয়া বলিতে পারে না, দিদি শরীর ভাল নেই বুঝি, মাথাটা টিপে দেব; চন্দ্রা আসিয়া জ্বালাতন করিতে পারে না, দিদি অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও। এ ছোট ঘরে সে স্বতন্ত্র, স্বাধীন।

মাঝে মাঝে উমার বড় শ্রান্তি বোধ হয়, চারিদিকের লোকজন বিরক্তিকর মনে হয়, নিজ পরিবারের জীবনধারা হইতে সে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চায়। কলেজ-জীবন আরম্ভ হইবার পর হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্যবোধ উগ্র হইয়াছে! সে এই ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে। অকারণে তাহার কান্না পায়। আবার কোনদিন তাহার মন অজানা খুশীতে ভরিয়া ওঠে, হৃদয় আনন্দে উপছিয়া পড়িতে চায়। তাহার কোন

চিত্তচাঞ্চল্য বাহিরে প্রকাশ করিতে চায় না, ছোট ঘরখানি সে মোছে, ঝাড়ে, গান গাহিয়া ওঠে।

মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা-গাড়ীর চাকার ঝন্‌ঝনানিতে বা গলিতে জল-দেওয়ার শব্দে উমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। বাহিরে তখন অন্ধকার, জানালার গরাদের কাছে তারাগুলি দপ্‌দপ্‌ করে, আমগাছে কয়েকটি কাক ডাকিয়া ওঠে, পশ্চিম দেওয়ালে ঝুলান ফরাসী চিত্রকর মিলের "গ্লিনারস্‌" ছবিখানির উপর ভোরের আলো ঝক্‌মক্‌ করে। উমা চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসে, বড় ঘড়ির কাঁটাগুলির দিকে তাকায়, চুলগুলি কুণ্ডলী পাকাইয়া বাঁধিয়া লয়, একটা চটি খুঁজিয়া পায় না, শুধু-পায়েই বারান্দায় বাহির হইয়া যায়।

সমস্ত বাড়ি নিদ্রিত, নিস্তব্ধ। পূর্ব্বাকাশে রাঙা আলো। কবিত্ব করিবার সময় নাই। লজিকের নোট মুখস্থ করিতে হইবে। আই. এ. পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করিয়া স্কলারশিপ্‌ পাইতে হইবে। স্কলারশিপ পাইয়াছিল বলিয়াই ত সে পড়িতে পারিতেছে। বারান্দায় ও ছাদে ঘুরিয়া উমা লজিকের নোট মুখস্থ করে।

পাশের বাড়ির রান্নাঘরে আগুন পড়ে। উত্তরের জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। চাকর যদু একতলায় উনানে আগুন দেয়, ছাদ ধোঁয়াতে ভরিয়া ওঠে, দরজার পর্দ্দা ফেলিয়া উমা তাহার ঘরে প্রবেশ করে। এই যে পর্দ্দা পড়ে, সারাদিন আর পর্দ্দা ওঠে না; গভীর রাতে শোবার আগে সে পর্দ্দা তোলে।

লজিকের নোট মুখস্থ শেষ করিয়া অঙ্কশাস্ত্র চর্চ্চার পূর্ব্বে একবার চা খাওয়ার তদারকে যাইতে হয়। স্বর্ণময়ীর শরীর ভাল নয়, সর্দ্দি হইয়াছে, ডাক্তার সকালে উঠিতে বারণ করিয়াছেন। রঘু ঠিকমত চা করিতে পারে না। চন্দ্রাকে একবার ডাকিলে ওঠে না, ঠেলিয়া তুলিতে

হয়। সকলে ঠিক সময়ে না উঠিলে, ঠিক সময়ে সকালে চা না খাইলে, সমস্ত দিনের কাজ বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। হেমবাবুর ঔষধ ও পথ্য সম্বন্ধে শীলার কিছুই মনে থাকে না, কিন্তু পিতাকে সেবা করিবার উৎসাহ তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উমাকে গিয়া ঔষধ খাওয়াইতে হয়। চা খাইবার টেবিলেও তাহার উপস্থিতি প্রয়োজন। হেমবাবুর বিশেষ ইচ্ছা সকল পুত্রকন্যা তাঁহার সহিত একসঙ্গে চা খায়। পিতার এ ইচ্ছা উমা যথাসম্ভব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করে। তাড়াতাড়ি সকলকে চা খাওয়াইয়া রঘুকে বাজারে পাঠাইতে হয়।

তার পর উমা নিজ ঘরে আসিয়া অঙ্কশাস্ত্রে মনোনিবেশ করে। নির্ম্মল নীলাকাশ প্রভাতের আলোয় ভরিয়া ওঠে, আমগাছের পাতাগুলি ঝিক্‌মিক্ করে, ছোট ঘর তাতিয়া ওঠে। ঘড়ির কাঁটাগুলি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলে।

সকালে বেশীক্ষণ পড়া হয় না। কলেজের গাড়ী দশটার আগেই আসে। তাড়াতাড়ি স্নান করিতে যাইতে হয়। সকল রান্না হইয়া ওঠে না। উমা অতি অল্প আহার করে। এই অল্পাহার লইয়া স্বর্ণময়ী প্রথমে বকাবকি করিতেন, এখন হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। চন্দ্রা কিন্তু প্রতিবাদ করিতে ভোলে না, দিদি আজ কিছু খেলে না মা। হেমবাবু বলেন, মা, একটু দুধ খেয়ে যা। উমা বলে, দুধ খেলে আমার গা ঘিন-ঘিন করে বাবা, আমি দই দিয়ে খাচ্ছি। কলেজের গাড়ী অনেক বাড়ি ঘুরিয়া যায়, যেন কলিকাতা শহরে চকিপাক খায়, বেশী খাইয়া গেলে গাড়ীতে উমার গা-বমি করে।

কলেজের ঘণ্টাগুলিতে উমার যেন নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় থাকে না। লেকচার শোনা, নোট টোকা, লাইব্রেরীতে পুস্তকের সন্ধান করা, ছাত্রী-জীবনের কঠোর জ্ঞান-সাধনা। মাঝে মাঝে সে হাঁপাইয়া ওঠে,

ক্লান্তি লাগে। ছুটি পাইলে উমা অমলাদিদির ঘরে চলিয়া যায়। অমলাদিদিকে তাহার বড় ভাল লাগে।

কলিকাতার বহু পল্লী প্রদক্ষিণ করিয়া অপরাহ্নে যখন সে বাড়ি ফেরে, অতি শ্রান্ত, প্রায়ই মাথা ধরে। কিছু খাইতে ইচ্ছা করে না। তাড়াতাড়ি চা খাইয়া সে নিজের ছোট ঘরে আশ্রয় লয়, বিছানায় এলাইয়া শুইয়া পড়ে। কাহারও সহিত কথা কহিতে বিরক্তি লাগে। মাথা দপ্ দপ্ করে। প্রফেসারের বক্তৃতা, অমলাদিদির গল্প-হাস্য, মায়ের বকুনী, নানা কথা মাথায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, জানালা দিয়া তারা দেখা যায়। ধীরে উমার মাথাধরা সারিয়া যায়, শরীর খুব হাল্কা বোধ হয়, খিদেও পায়। পর্দ্দা সরাইয়া সে দেখে, অরুণ ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কি না।

সন্ধ্যার সময় অরুণ প্রায় প্রতিদিনই আসে। গত অসুখের পর হইতে সে যেমন রোগা তেমনি চঞ্চল হইয়াছে। পূর্ব্বে সে হেমবাবু বা স্বর্ণময়ীর সহিত বহুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া গল্প করিত। এখন সে চঞ্চলভাবে এঘর-ওঘর ঘুরিয়া বেড়ায়, অধিকক্ষণ থাকে না, মাঝে মাঝে ছাদে ঘুরিয়া যায়, দেখিয়া যায় উমা তাহার 'ডেন্' হইতে বাহির হইল কি না।

বেচারা অরুণ!

ছাদে অরুণের পদশব্দ শুনিলেই উমা ঘর হইতে বাহির হয়।

—হ্যালো অরুণ, গুড্ ইভনিং।

অরুণ ম্লান হাসে। উমার এই ক্লান্তকরুণ মুখখানি দেখিয়া তাহার

বুকের রক্ত দুলিয়া ওঠে। সে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কি বলে, উমা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

—কি, চা খাবে?

উমার সুন্দর মুখের দিকে অরুণ চায়, এই অনুপম মুখে কি যাদুমন্ত্র আছে।

অরুণ আবেগের সহিত উত্তর দেয়, নিশ্চয় খাব, তুমি খেয়েছ?

—একবার খেয়েছি, তবে তোমার সঙ্গে আর একবার খেতে আপত্তি নেই।

চায়ের সঙ্গে নানা খাবার আসে। উমাকেও খাইতে হয়। উমা বলে, আশ্চর্য্যি, তোমার সঙ্গে চা খেতে বসলে, আমার ভয়ানক খিদে পায়।

—অর্থাৎ সন্ধ্যেবেলায় তোমার খিদে পায়। খাও বেশী ক'রে।

—হাঁ, এখন বেশী ক'রে খেলে রাতে খেতে পারব না, তখন মা বকাবকি করবেন।

—তা এখনই রাতের খাবার খেলে পার।

—তা আর হচ্ছে কই।

সন্ধ্যাটি অরুণের নিকট বড় মধুর মনে হয়।

গ্রীষ্মের রাতে ছোট ঘরে পড়া অসম্ভব। বাহিরের বারান্দায় উমা পড়ার বন্দোবস্ত করে। অরুণ নিঃশব্দে বিদায় লইয়া চলিয়া যায়। অরুণ যে কখন নীরবে চলিয়া যায় উমা বুঝিতেও পারে না।

কোনদিন উমা বলে, অরুণ, ব'স, আজ পড়তে মন লাগছে না, একটু গল্প করা যাক।

—না বাপু, শেষকালে স্কলারশিপ কম টাকার হ'লে আমাকে দোষ দেবে।

—খুব ঠাট্টা যে। তোমার শরীর কেমন?

—কেন বেশ ভালই ত।

অরুণ বেশীক্ষণ বসে না। সে যেন স্থির হইয়া বেশীক্ষণ বসিতে পারে না; তাহার দেহে মনে এ কি চাঞ্চল্য। তাহার সহজ স্বাভাবিক শান্তভাব কোথায় গেল?

অরুণ নীরবে চলিয়া যায়। তাহার জন্য উমার বুক কেমন টন্‌টন্‌ করিয়া ওঠে। কেন অরুণ এত বিমর্ষ? তাহার কিসের বেদনা, অসুখের পর তাহার চোখ বড় কালো দেখায়। ঐ গভীর কালো টানা চোখ দুইটিতে কোন্ অজানা জীবনের কাতরতা ভরা।

বেশীক্ষণ এ-সব ভাবিলে চলে না। ইংরেজীর নোট মুখস্থ করিতে হয়।

খাওয়ার পর উমা ঘরে পড়িতে বসে। ভয়ানক ঘুম পায়। চেয়ারে সোজা হইয়া বসে। চোখে ঘুম ভরিয়া আসে।

কিন্তু মজা এই, বিছানাতে শুইলে ঘুম কোথায় চলিয়া যায়। কত অসম্ভব আশা, অদ্ভুত কল্পনা, আজগুবী চিন্তা। বাতাসে পর্দাটা কাঁপে, জানালার গরাদের মধ্য দিয়া দেখা যায় সপ্তমীর চন্দ্র শাণিত বক্র তরবারির মত।

উমা ভাবে, বড় হইলে সে কি করিবে; বি-এ পর্য্যন্ত ত পড়িবে, তার পর? কোন স্বাধীন জীবিকা অথবা সেই সনাতন বিবাহ? হয়ত বিবাহ করিবে, কিন্তু মায়ের মত সমস্ত দিন ডাক্তারি করিবে না। বিবাহ করিবে কিনা, পরে ঠিক করিলেই হইবে। এখন সে কিছুতেই বিবাহ করিতেছে না। One must see life. দেশভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করে। সে যদি অক্সফোর্ডে বা প্যারিসে গিয়া পড়িতে পারিত! সে ইউরোপ দেখিবে, আমেরিকা দেখিবে, সাউথ সি'র দ্বীপগুলিতে ঘুরিবে।

রূপার্ট ব্রুকের কবিতাটি বড় সুন্দর। যদি কোন বড় য়্যাভিয়েটারের সহিত তাহার বিবাহ হয়, এরোপ্লেনে করিয়া তাহারা দু জনে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে। সে কি মাথামুণ্ড ভাবিতেছে। ঘুম যে চোখে আসে না।

উমা ভাবে, অরুণ তাহাকে ভালবাসে। অরুণকে তাহারও ভাল লাগে, কিন্তু অরুণকে তাহার প্রেমিকরূপে, তাহার স্বামীরূপে কল্পনা করিতে পারে না। তাহার কৈশোর যৌবনের দিনগুলির সুখ-দুঃখের সহিত অরুণ বড় বেশী জড়াইয়া গিয়াছে। অরুণ তাহার বন্ধু। 'কমরেড' কথাটি বেশ। রাশিয়ায় এখন সকলে কমরেড বলে। গর্কীর "মাদার" উপন্যাসখানি অরুণকে কাল ফেরৎ দিতে হইবে। কিন্তু অরুণের মধ্যে কি একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

চোখে ঘুম আসে না। উমা ধীরে উঠিয়া পর্দ্দা তুলিয়া অন্ধকারে নির্জ্জনে ছাদে আসিয়া দাঁড়ায়। একটা অব্যক্ত বেদনা বুক ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। অরুণের অশান্ত হৃদয়াবেগ কি তাহারও হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল! তাহার বুক দুলিয়া ওঠে। রাত্রির তারাভরা অনন্ত আকাশ ঝিমঝিম করে। অরুণের হৃদয়ের বেদনা সে কিছু বুঝিতে পারে কি?

২৯

ছুটির দিন। আতপ্ত দিনের শেষে দক্ষিণসমীরস্নিগ্ধ সন্ধ্যা রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বাকাশ সিঁদুর-রঙের মেঘে ভরা।

বাড়িটি নিস্তব্ধ। উমার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় অরুণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

উমা ঘরের ভিতর হইতে স্নিগ্ধস্বরে ডাকিল—অরুণ!

—এই যে আমি, বারান্দায়।

—এস, ঘরে এস।

—যাব?

—হাঁ, এস ঘরের ভেতর।

খয়ের-রঙের পর্দ্দার দিকে অরুণ চাহিয়া রহিল। ওই পর্দ্দার আড়ালে উমার ছোট ঘরটি দেখা, যেন তাহার স্বপ্ন। আজ উমার আহ্বান শুনিয়া সে কম্পিত পদে অগ্রসর হইল।

—কই, এস!

ধীরে পর্দ্দা তুলিয়া অরুণ ছোট ঘরটিতে প্রবেশ করিল।

—অসুখ করেছে নাকি?

—অসুখ করতে যাবে কেন? ব'স চেয়ারটায়। ঘরে খুব বেশী স্থান নেই, দেখতেই পাচ্ছ।

—বাঃ, কি সুন্দর ঘর।

—বল, স্বপ্নের মত, ওইটি'ত তোমার ফেবারিট্ উপমা।

—সত্যি, এই রকম বেশ ছোট সাজান ঘর আমার বড় ভাল লাগে।

—বা, দাঁড়িয়ে রইলে যে, ব'স। মিলের ছবিখানা তুমিই ত দিয়েছিলে। এর কাচটা ফেটে গেছে।

—কাল দিও, সারিয়ে দেব।

—কি এত হাঁ করে দেখছ। লক্ষ্মীটি, আমার বইগুলি ঘেঁটো না, খুলো না খাতা। ওই জন্যেই ত তোমায় ঘরে আস্‌তে দিই না। বই-ঘাঁটা তোমার রোগ।

—আচ্ছা, এই চুপ করে বসলুম।

—চুপ ক'রে বসতে কে বলছে।

জীবনের গভীর কাতরতা তৃষ্ণায় ভরা অরুণের কালো চোখ দুইটির দিকে চাহিয়া উমার কেমন ভয় হইল।

স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বলিল, তোমার কি হয়েছে বল ত অরুণ, কি একটা তোমার হয়েছে।

রক্তিম মুখে অরুণ বলিল, কি হবে, কিছুই না, শরীর তেমন ভাল নেই।

ব্যগ্রকণ্ঠে উমা বলিল, না, আরও কিছু, আমি বুঝতে পারছি।

অরুণ ধীরে বলিল, যদি বুঝতে পেরে থাক, তবে বলার আর দরকার কি?

—কি যে কবিত্ব করো?

—কবির কাছে কবিত্ব তার সত্যিকার জীবন নয় কি?

অরুণের রক্তহীন মুখের দিকে উমা ছলছল চোখে চাহিয়া রহিল। মুখে কোন কথা আসিল না।

দুই জনে স্তব্ধ বসিয়া রহিল।

অরুণ ভাবিতে লাগিল, উমা কি শুনিতে চায়? উমা কি শুনিতে চায়, অরুণ বলিবে, উমা তোমাকে আমি ভালবাসি, আমার সমস্ত আত্মা

দিয়া তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু এ কথা ত উমা জানে, এ কথা ত উমা বুঝিতে পারিতেছে।

অরুণ কিছু বলিতে পারিল না। এ তাহার ভীরুতা, তাহার লজ্জা নয়। অরুণ ভাবিতেছিল, 'তোমাকে ভালবাসি' এই দুইটি কথায় জীবনের গভীরতম হৃদয়াবেগকে কতটুকু প্রকাশ করা যায়? যাহাকে ভালবাসি, সে-কথা নিজ অন্তরে সে যদি না অনুভব করিয়া থাকে তবে কথা দিয়া তাহাকে কি বুঝাইব! কথা ত অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করে না, না-বোঝার আড়াল সৃষ্টি করে।

আর উমা কি ভাবিতেছিল তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতে ছিল না। শুধু বুকে একটা অজানা বেদনা অনুভব করিতেছিল, হৃৎপিণ্ডের রক্তচলাচলের ছন্দ যেন বারবার কাটিয়া যাইতেছে!

বিহ্বলমুখে অরুণের দিকে চাহিয়া উমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

—চল ছাদে, ঘরে বড় গরম।

—তোমার ঘরটি বড় ভাল লাগল। মাঝে মাঝে আসতে ডেকো।

সুসময় বহিয়া গেল। আমগাছের আড়ালে চতুর্দ্দশীর চন্দ্র উঠিল। বাতাসে কালো পর্দ্দা কাঁপিতে লাগিল।

অরুণ চুপ করিয়া রহিল। কোন কথা বলা হইল না।

৩০

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই তিন মাসে অরুণের জীবনে ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। যে-চৈত্রসন্ধ্যায় সে উমার ছোট ঘরের নিভৃত নির্জ্জনতায় ক্ষণিকের জন্য প্রবেশ করিবার অধিকার পাইয়াছিল, সে-সন্ধ্যা কাল-সমুদ্রের অতলতায় মুক্তার মত বিলীন, কিন্তু অরুণের জীবনে সে-সন্ধ্যার রক্তিম লেখা দীপ্ত ম্লানহীন হইয়া রহিল। ঘটনাটি সামান্য। 'কিন্তু এই ঘটনার আঘাতে তাহার জীবনধারা যেন এক বাঁকে আঘাত পাইয়া দিশাহারা হইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিল।

সে-সন্ধ্যায় উমার সহিত অরুণের যদি একটা বোঝাপড়া হইয়া যাইত, হয়ত ভাল হইত। অরুণ ত শুধু পর্দ্দা সরাইয়া উমার ছোট ঘরটি দেখিতে চাহে নাই, সে চাহিয়াছে উমার রহস্যময় হৃদয়ের কথা জানিতে, উমা ত তাহার হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিল না।

অরুণ ভাবে, সে যদি বলিত, উমা তোমাকে আমি ভালবাসি, উমা কি উত্তর দিত? উমাও কি মন খুলিয়া তাহার হৃদয়ের কথা বলিত? উমা কি তাহাকে ভালবাসে? হয়ত উমা হাসির সুরে বলিত, আজ যে খুব রোমাণ্টিক মুড্ দেখছি, আজকাল বুঝি খুব নভেল পড়ছ, অত নভেল প'ড়ো না। অথবা ব্যঙ্গের সুরে বলিত, ভালবাসা কা'কে ব'লে বল ত অরুণ, ডিফাইন্ করতে পার? একে তুমি ভালবাসা বল!

অরুণ ভাবে, উমার মানস প্রকৃতিতে কোথায় নিষ্করুণ কঠোরতা আছে, তাহার হৃদয় স্ফটিকের মত যেমন স্বচ্ছ তেমনই দৃঢ়। হৃদয়াবেগকে সে দুর্ব্বলতা ভাবে। শীলার মত তাহার যদি হৃদয়োচ্ছ্বাস থাকিত।

অরুণ স্থির করিল, ভালবাসাকে যে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ভাবে, সেন্টিমেণ্ট্যাল মুড্ বলে, তাহাকে প্রেমের কথা বলিলে প্রেমকে অবমাননা করা হয়। প্রেম থাকুক অন্তরে অন্তঃশীলা, বাহিরে তাহার আর প্রকাশ যেন না হয়, জীবনের এই সত্যতম হৃদয়াবেগকে দমন করিয়া চলিতে হইবে।

অরুণ বুঝিতে পারে, উমা অরুণকে সুহৃৎ রূপে চায়, প্রেমিকরূপে নয়। সৌহার্দ্দ্যকে সে ক্ষুণ্ণ করিবে না। অরুণ উমার নিকট হইতে সরিয়া থাকিতে চায়, নিঃসঙ্গ থাকিতে চায়। উমা তাহাকে নিজ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে দেয় না। অরুণের উপর তাহার যেন দাবি, অধিকার আছে। নানা ফরমাশে সে অরুণকে খাটায়, নানা প্রকার হুকুম করে, মাঝে মাঝে ছোট মেয়ের মত আবদার করে, নানা জিনিষ উপহার দেয়। উমার সঙ্গ অরুণকে যেমন আনন্দ দেয় তেমনই হৃদয় উদাস করিয়া তোলে। এ সব ছোটখাট কাজ সে করিতে চায় না, সে চায় হৃদয় উজাড় করিয়া দিতে। সে হৃদয়ের তৃষ্ণা উমা বুঝিতে পারে কি?

অরুণের দ্বৈত জীবন আরম্ভ হইল। জীবন একটা অভিনয়। মুখ দেখিয়া কেহ যে মনের কথা জানিতে পারে না, ইহা বড় সুবিধার। মুখোস পরিয়া পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া যাইতে হইবে। ভালবাসি, কিন্তু তুমি জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ভালবাসা কাহাকে বলে? উমার প্রতি তাহার হৃদয়ের গভীর ভাব কি ভালবাসা, অথবা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে প্রবল যৌন-আকর্ষণের কথা বলেন, তাহাই ভালবাসা? কোন্‌টা সত্য?

অরুণের সত্তা যেমন কল্যাণময় ঐক্য হারাইল, তাহার প্রেমময় ভিত্তিভূমি খণ্ডিত হইয়া গেল, তেমনই তাহার ধীশক্তি অতি তীক্ষ্ণ, বিশ্লেষণ-প্রবণ হইয়া উঠিল। প্রতি হৃদয়াবেগ, অনুভূতিকে সে বিশ্লেষণ,

বিচার করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে মানসিক আবেগের তীব্রতা রহিল না, পূর্ব্বে যাহা বহুমূল্য ভাবিত, তাহা তুচ্ছ মনে হইতে লাগিল। জীবন তরঙ্গহীন শান্ত নদীধারার মত প্রবাহিত হইয়া চলিল বটে, নদীর গভীরতলে যে দুর্নিবার প্রমত্ত স্রোত তটভূমির নীচের মাটি ধীরে ধীরে ভাঙিয়া চলিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

শুধু মাঝে মাঝে সে অনুভব করিত, জীবন বুঝি অর্থহীন অভিনয়, ইহার কোন সার্থকতা নাই। বইপড়া, বন্ধুদের সহিত তর্ক গল্প করা, তাহার ভাল লাগিত না। কোন বিজন সন্ধ্যায় সে ভাবিত, সে বড় একা, তাহার জীবনের পথ একা চলার পথ। কোন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া যাইত, বুকে একটা বেদনা খচ্‌খচ্‌ করিয়া উঠিত। হৃৎপিণ্ডের এই স্নায়বিক ব্যথা শারীরিক কোন অসুস্থতার জন্য নয়, ইহা সম্পূর্ণ মানসিক। অরুণ ভাবিত, এ ব্যথা হয়ত তাহার গত ইনফ্লুয়েঞ্জার জের।

মনের অবসাদ অধিকক্ষণ থাকিত না। বিষাদকে সে রঙীন করিয়া তুলিত। মধুর বিষণ্ণতায় হৃদয় ভরিয়া উঠিত। উমার সম্মুখে সে কোনরূপ হতাশা প্রকাশ করিত না। বস্তুতঃ, এই আনন্দময় জীবন-কল্লোলপূর্ণ সুন্দরী পৃথিবীতে মানববিদ্বেষী হইয়া উঠিবার মত বয়স তাহার হয় নাই। জীবনের সহজ সুখে, মধুর স্বপ্নে তাহার অন্তর পূর্ণ।

কিন্তু দ্বৈত জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তে তাহার সত্তার ধীরে ধীরে ভাঙন ধরিল। মাঝে মাঝে সে দিশাহারা হইয়া যাইত। জীবনকে সে গ্রহণ করিয়াছিল সাধনারূপে, জ্ঞানের সাধনা, প্রেমের সাধনা, মানবকল্যাণের সাধনা। সে-সাধনায় সন্দেহ আসিল, হয়ত এ তপস্যা শূন্যের তপস্যা। তাহার মধ্যে যে তাপস এতদিন একাগ্র মনে সাধনা করিয়া আসিয়াছে, সে সকল নিয়ম-সংযমের শৃঙ্খল ভাঙিয়া বে-হিসাবী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে চাহিত।

বৈশাখের শেষে উমারা কলিকাতা ছাড়িয়া দার্জ্জিলিঙে চলিয়া গেল, অরুণ বাঁচিয়া গেল। উমার সান্নিধ্যে সে যে বেদনা অনুভব করিত, দূরত্বে সে বেদনা মধুর রঙীন হইয়া উঠিল।

হেমবাবু সারিয়া উঠিয়াছেন। ডাক্তার বসু বলিলেন, এখন একটা চেঞ্জ দরকার, বহুদিন কলিকাতায় আছেন। সৌভাগ্যক্রমে দার্জ্জিলিঙে এক বন্ধুর বাড়ি বিনা-ভাড়ায় পাওয়া গেল।

মামীমা অরুণকে তাঁহাদের সহিত দার্জ্জিলিং যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অরুণ রাজী হয় নাই। মামীমাও পীড়াপীড়ি করেন নাই। উমা কিন্তু অরুণকে কোন কথা বলিল না। উমা বলিলেও, অরুণ তাহাদের সহিত দার্জ্জিলিং যাইত না। কিন্তু উমা যে একবার অনুরোধও করিল না, এই ভাবিয়া অরুণ ব্যথিত হইল।

অরুণ দার্জ্জিলিঙে না-যাওয়াতে চন্দ্রা বড় দুঃখিত হইল। সে ভাবিয়াছিল, অরুণ নিশ্চয় তাহাদের সহিত যাইবে। চন্দ্রা যাইবার সময় বলিল,—বা, অরুণদা, তুমি না গেলে আমরা কিছু এঞ্জয়ই করব না, আচ্ছা, আমরা আগে যাই, তুমি পরে আসবে, কেমন! আর উমা গম্ভীরভাবে বলিয়াছিল, অরুণ বেশী টো-টো ক'রে ঘুরো না, তুমি কোথাও বেড়াতে গেলে পারতে, যা গরম পড়েছে এবার।

৩১

আষাঢ়ের ছিন্নমেঘাবৃত প্রভাত। সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়াছে। খোলা জানালা দিয়া এক ঝলক সূর্য্যালোক পঙ্খের কাজকরা বিবর্ণ দেওয়ালে আলমারীর কাঠে ঝক্‌মক্ করিতেছে। অরুণ বিছানাতে পাশ ফিরিয়া একবার ঘড়ির দিকে চাহিল। পুরাতন ফ্রেঞ্চ ঘড়িটি একটা বাজিয়া বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঘড়িটি কিছুদিন হইল খারাপ হইয়াছে, সারাইতে পাঠান হয় নাই। এলার্ম ঘড়িটিও বিকল হইয়া গিয়াছে। এখন আর ঘড়িতে এলার্ম বাজে না। অরুণ ভোরে উঠিয়া পাঠ মুখস্থ করে না। এখন সে যখন খুশী ওঠে, যখন খুশী শুইতে যায়; কলেজে যাইতে প্রায়ই দেরি হয়। ভাল না লাগিলে, কোন কোন দিন সে কলেজেও যায় না। প্রতিদিন নিয়মানুবর্ত্তী জীবন যাপন করিতে শ্রান্তি লাগে।

দেওয়ালে রৌদ্র দেখিয়া অরুণ ক'টা বাজিয়াছে, স্থির করিতে চেষ্টা করিল। বোধ হয় সাতটা হইবে। এখনও আধ ঘণ্টা শুইয়া থাকা যাক। ছুটির দিন।

চাদরটা গায়ে টানিয়া লইয়া অরুণ ভাবিতে লাগিল, দার্জ্জিলিঙে এখন ত প্রায় সাতটা হইবে। উমা নিশ্চয় জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার সদ্যজাগরণফুল্ল অনুপম আননে প্রভাতের আলোক আসিয়া পড়িয়াছে। জানালা খুলিয়া দেখিতেছে, পাইন-বন সূর্য্যালোকে ঝলমল, রজতকান্তি কাঞ্চনজঙ্ঘা অরুণালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে, মেঘের সমুদ্রে বিচিত্র বর্ণের লীলা। উমা কি তাহার কথা ভাবিতেছে?

হাঁ, দার্জ্জিলিং যাইতে ইচ্ছা করে, উমাকে দেখিতে নয়, টাইগার

হিল হইতে এভারেষ্ট পর্ব্বতশৃঙ্গে সূর্য্যোদয়, মেঘলোকে অপরূপ বর্ণোৎসব দেখিতে। অরুণ আবার ভাবিতে লাগিল, না, সূর্য্যোদয় দেখিতে, নয়, উমাকে দেখিতে দার্জ্জিলিং যাইতে ইচ্ছা করে।

অরুণ পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিয়া শুইল। প্রভাতালোকদীপ্ত দার্জ্জিলিঙের একটি অপরূপ দৃশ্য কল্পনায় ভাবিতে চেষ্টা করিল।

প্রতিমা চঞ্চলপদে ঘরে প্রবেশ করিল।

—বা, দাদা এখনও ঘুমুচ্ছ, আটটা বাজে।

—ঘুমুচ্ছি কোথায়, শুয়ে আছি।

—ওঠ, না হ'লে এখুনি ঠাকুমা আসবেন। অত রাত জাগ কেন, কাল রাত দু'টোয় দেখি তোমার ঘরে আলো জ্বলছে।

—কটা বেজেছে ?

—বললুম ত আটটা। তোমার সব ঘড়ি বন্ধ। কি, শরীর ভাল নেই ?

—না, অসুখ নয়, আমি উঠছি।

—তোমার চা এখানে এনে দেব ?

—লক্ষ্মী-মেয়ে! প্লীজ্। কিন্তু শুধু চা।

—না, তাহ'লে আবার ঠাকুমা ব'কবেন। আমি সব আনছি, তুমি বরঞ্চ লুচিগুলো খেও না, বাগানে কোথাও ফেলে দিও। আর খাবে নাই বা কেন ?

—আচ্ছা নিয়ে আয়।

রবীন্দ্রনাথের একটি প্রভাতী গান গাহিতে গাহিতে প্রতিমা চলিয়া গেল। স্নেহকরুণ নয়নে প্রতিমার দিকে চাহিয়া অরুণ বিছানা হইতে উঠিল।

প্রতিমাকে দেখিলে সে যেন নবজীবন লাভ করে। জীবনের সহজ সুখে, কৌতুকময় আনন্দে প্রতিমার অন্তর কানায় কানায় ভরা, কোন দ্বন্দ্ব নাই, আবেগের ঘূর্ণাবর্ত্ত নাই। ব্রাউনিঙের Pippaর কথা মনে পড়ে। অরুণ আবৃত্তি করিয়া উঠিল :

Day!
Faster and more fast,
O'er night's brim, day boils at last;
Boils, pure gold, o'er the cloud-cup's brim
Where spurting and suppressed it lay;

রাত্রির নিকষকৃষ্ণ পাত্র ভাঙিয়া সোনার আলো যেমন চারিদিকে উপচাইয়া পড়িতেছে তেমনই তাহার হৃদয়ের পেয়ালা ভরিয়া আনন্দবর্ণ কবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে! কবিতাটির কিয়দংশ আবৃত্তি করিতে অরুণের মনের অবসাদ চলিয়া গেল। তাহার বক্ষে যেন কোন পাখী ডানা ঝট্‌পট্ করিয়া জাগিয়া উঠিল, এখন সে সোনার আলো ভরা সুনীল গগনে দুই পক্ষ মেলিয়া উর্দ্ধে উড়িয়া যাইতে চায়।

প্রতিমা চা ও খাবার লইয়া আসিয়া বলিল, দাদা সকালে বেরুচ্ছ নাকি?

—হাঁ, একটু কাজ আছে।

—কাজ ত ছাই। শীগ্‌গির ফিরো বাপু।

—শীগ্‌গির?

—হাঁ, কাল ঠাকুমার একাদশী গেছে, তুমি না খেলে ত তিনি খাবেন না।

—ও, দেখ্, টুলি, ঠাকুমাকে ব'লে দিস্ আমি দুপুরে বাড়িতে খাব না, তিনি যেন শীগ্‌গির খেয়ে নেন।

—কোথায় খাবে শুনি ?

—সে খাব'খন।

—কি যে তোমার টো-টো করতে ভাল লাগে, তা হ'লে বাপু দুপুরে খেয়ে বেরিও।

—না, না, আমায় এখনই বেরুতে হবে।

—দিদির ওখানে যাবে ? হরিসাধন-দা ত অনেক দিন আসেন নি।

—হাঁ, দিদির ওখানেও একবার যেতে হবে। বা, বিষ্টি-ধোওয়া আকাশে কি সুন্দর আলো হয়েছে দেখ্। চল, কোথাও বেড়াতে যাবি ?

—মোটর গাড়ী ত বিগড়ে ব'সে আছে, তোমরা সারাতে পাঠাও না।

—মোটর গাড়ীতে কেন, ট্রেনে কোথাও চ'লে যাব, কোন অজানা গ্রামে।

—না, আমার অত টো-টো ভাল লাগে না।

—আচ্ছা, আমার বোধ হয় ফিরতে রাত হবে।

—দাদা, কোথাও যাও ত একা যেও না, তোমার কোন বন্ধুকে সঙ্গে নিও। আর এই নাও ছাতা, পরশু যা ভিজে এসেছিলে।

ছাতা-হাতে অরুণ বাড়ি হইতে বাহির হইল। বৃষ্টি-ধোত আকাশে সুনির্ম্মল আলোকধারা তরুণীর দীপ্ত চাউনির মত।

ছুটির দিনগুলি অরুণ নিরুদ্দেশ ভাবে কলিকাতার বাহিরে ঘুরিয়া কাটায়। বাড়িতে স্থিরভাবে থাকিতে পারে না। ট্রেনে বা ষ্টীমারে সে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র শহরে বা গ্রামে চলিয়া যায়, কোনদিন একাই চলিয়া যায়, কল্পনা তাহার সঙ্গিনী হয়। প্রতিমাকে লইয়া একদিন সে ষ্টীমারে কোলাঘাট গিয়াছিল, এক দিন ট্রেনে চন্দননগর গিয়াছিল, প্রতিমা সহজ কৌতুকভরা চোখে পথদৃশ্য, জনতা-

স্রোত দেখিয়া বড় আনন্দ পায়। কিন্তু প্রতিমা সহজে যাইতে চায় না। রোদে তাহার মাথা ধরে। সে বাড়িতে বসিয়া গল্প করিতে, উপন্যাস পড়িতে ভালবাসে।

অরুণ জয়ন্তের বাড়ির দিকে চলিল। তাহার মেসোমহাশয়ের অসুখ। পীতাম্বর কিছুতেই ডাক্তার দেখাইবেন না, পাড়ার এক কবিরাজ চিকিৎসা করিতেছেন বটে, কিন্তু কি অসুখ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন না, বোধ হয় তিনি ঠিক নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। জয়ন্তের দেখা পাওয়া যায় না। সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া রাধাবাজারে তাহাদের ঘড়ির দোকান দেখিতেছে।

পথে যাইতে যাইতে অরুণ ভাবিল, একটি নূতন ঘড়ি কিনিতে হইবে, জয়ন্তের যে ঘড়ির দোকান আছে, একথা কখনও পূর্ব্বে মনে হয় নাই।

জয়ন্তদের বাড়ির সম্মুখে আসিতে মণ্টু চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিয়া আসিল—দাদা বাড়ি নেই!

—কোথায় গেছে?

—ডাক্তারের বাড়ি।

—ডাক্তার?

হাঁ, মাসীমা বড় কান্নাকাটি করেছেন, তাই মেসোমহাশয় বলেছেন, আচ্ছা, ডাক্তার নিয়ে এস, কিন্তু তার ঔষধ খাব না আর দু-টাকার বেশী তাকে দেওয়া হবে না। তুমি ব'স অরুণদা, দাদা এক্ষুণি আসবেন।

অরুণ অনুভব করিল, দোতলার ঘরের জানলা হইতে কে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, তাহার কালো চক্ষের দৃষ্টি বড় স্নিগ্ধ। সে একটু উপরে চাহিল। দুর্গা জানলা হইতে সরিয়া গেল না, পাখীর ফাঁক দিয়া দেখিতে লাগিল। অরুণ মাথা একটু নত করিল। দুর্গা মণ্টুকে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

—ওই দিদি আমাকে ডাকছেন, আমি এক্ষুণি আসছি। মণ্টু ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—দিদি তোমাকে বসতে বললেন, মেসোমশায় তোমার সঙ্গে কি কথা কইতে চান।

—না, আমার এখন সময় নেই। তোর দাদাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস আজ সন্ধ্যেবেলা।

—আচ্ছা, শোন অরুণ-দা, একটা যুদ্ধের জাহাজ কলকাতায় এসেছে নাকি, সেটা কোন্ ঘাটে লেগেছে?

—আমি ত জানি না।

—তুমি কোন খবর রাখ না। আচ্ছা, এরোপ্লেনগুলো কোন্ জায়গায় নামে? খুব দূর এখান থেকে, হেঁটে যাওয়া যায়?

—ট্রামে গিয়েও অনেকখানি হাঁটতে হবে।

—সে আমি পারব, তুমি ব'লে দাও আমাকে।

—আচ্ছা, আমি নিয়ে যাব একদিন।

—ঠিক নিয়ে যাবে, এরোপ্লেনে চড়াতে হবে কিন্তু।

—আচ্ছা ভাই।

জয়ন্তের বাড়ি হইতে অরুণ হরিসাধনের বাড়ির দিকে চলিল। দিদির সঙ্গে বহুদিন দেখা হয় নাই। দিদির কাছে যাইতে আহার কেমন ভয় হয়। দিদি মুখে কোন তিরস্কার করেন না, কিন্তু তাঁহার করুণ চক্ষের স্নেহময় চাউনিতে নীরব ব্যথাভরা ভৎর্সনা জড়িত; বর্ত্তমান বিষাদময় উদাসীন জীবন-যাপনের জন্য অরুণ লজ্জিত হইয়া ওঠে। সমস্ত দিন দিশাহারা হইয়া যখন সে এই পুণ্যবতী তাপসী নারীর পাশে গিয়া বসিয়াছে, দিদি সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়াছেন, সে যেন গভীর শান্তি লাভ করিয়াছে। অরুণ ভাবে, দিদির চরণপ্রান্তে বসিয়া সে যদি হরিসাধনের মত সেবাধর্ম্মে দীক্ষা লইতে পারে, হয়ত সে জীবনে

শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহার সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। মানবকল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করা। কিন্তু তাহার সাহস হয় না। বোধ হয় তাহার মনের সে শক্তি নাই। সেবার পথে নয়, প্রেমের পথেই তাহাকে জীবনের সন্ধান করিতে হইবে।

শেয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট আসিয়া অরুণ ট্রাম হইতে হঠাৎ লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। দিদির কাছে সে যাইবে না। নগরের এ জনকল্লোলে রথঘর্ঘরে সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। নগরের বাহিরে উদার আকাশের তলে স্বর্ণশীর্ষ শস্যক্ষেত্রের পার্শ্বে নির্ম্মল নদীতটে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নির্জ্জনে মুখোমুখি বসিতে চায়। এখন যদি সে কোন সমুদ্রতীরে একা বসিয়া থাকিতে পারিত! সমুদ্র দেখিবার অদম্য বাসনায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্ত নীল জলরাশির উপর অসীম নীল আকাশ নত হইয়া পড়িয়াছে।

অরুণ ভাবিল, ডায়মণ্ডহারবার গেলে সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যাইবে, লোকে বলে, সমুদ্র তাহার খুব কাছেই। সে ডায়মণ্ডহারবার যাওয়া স্থির করিল।

বেলেঘাটা ষ্টেশনে গিয়া অরুণ ডায়মণ্ডহারবারের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিল। তৃতীয় শ্রেণীতে বড় ভিড়। সে নিঃসঙ্গ থাকিতে চায়।

ট্রেন প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ীতে বসিতেই ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি আসিল।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়া ট্রেন ছুটিয়া চলিল। এঞ্জিনের গর্জ্জন বারিপতন শব্দের সহিত মিশিয়া গেল।

বালীগঞ্জ ষ্টেশন পার হইবার পর বৃষ্টি প্রায় থামিয়া আসিল। মধ্যগগনে কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের যবনিকা সরাইয়া সূর্য্যালোকধারা হরিৎ শ্যামল

দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে ঝরিয়া পড়িয়া চারিদিক অপূর্ব্ব দ্যুতিময় করিয়া তুলিল। নব নব সৌন্দর্য্যপ্রকাশিনী বিশ্বপ্রকৃতি রহস্যময় অবগুণ্ঠন খুলিয়া দীপ্ত চক্ষে অরুণের দিকে চাহিয়া রহিল।

অরুণ যখন ডায়মণ্ডহারবারে আসিয়া পৌছিল, টিপি টিপি বৃষ্টি সুরু হইয়াছে।

ষ্টেশনে নামিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, সমুদ্র কত দূর?

টিকিট-চেকার হাসিয়া বলিল, সমুদ্দুর এখান থেকে বহুদূর, তবে এখানে নদী এত প্রশস্ত যে সমুদ্রের মতই মনে হয়। নদীর তীরের নিকটে, একটি ডাকবাংলোও আছে।

অরুণ ছাতা মাথায় দিয়া নদীর দিকে চলিল। টিকিট-চেকারটি চেঁচাইয়া বলিল, মশাই, আজই যদি কলকাতায় ফিরতে চান ত দু' ঘণ্টার মধ্যে ট্রেন।

পথে চলিতে চলিতে অরুণ অনুভব করিল, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। এক মুদির দোকানে মুড়ি ও মোয়া ব্যতীত খাদ্যদ্রব্য বিশেষ কিছু মিলিল না।

নদীর তীরে এক বৃহৎ ঝাউগাছের তলায় সে বসিল। ভাবিতে লাগিল, উমা যদি এখন তাহার পাশে আসিয়া বসিত। দুইজনে পাশাপাশি প্রাচীন বৃক্ষতলে এই দিগন্তবিসারী চঞ্চল নদীজলধারার দিকে চাহিয়া আষাঢ়ের অপরাহ্ণে স্তব্ধ বসিয়া থাকিত। উমা তাহার সঙ্গে নাই, কিন্তু নবপ্রস্ফুটিত কদম্বের মত প্রফুল্লিত নববর্ষার প্রকৃতিলক্ষ্মীর স্পর্শে তাহারই সঙ্গ, মেঘের কজ্জলে তাহারই নয়নের অঞ্জন। উমাকে সে কখনও এত নিকটে এমন গভীরভাবে পায় নাই।

গভীর রাতে অরুণ যখন বাড়ি ফিরিল, তাহার হৃদয় কোন্ আনন্দ-সুধার কানায় কানায় ভরা।

দেখিল, পড়িবার টেবিলের ওপর একটি হাল্কা রঙের নীল খাম, উমার চিঠি। উমা সত্যই চিঠি লিখিয়াছে, উমাকে সে যতখানি হৃদয়হীনা ভাবিয়াছে সে তত নিষ্করুণ নয়।

আকাশে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। দ্বাদশীর চন্দ্র নির্ম্মল গগনে। বহুদিন পর অরুণ পুরাতন বেহালাটি বাক্স হইতে বাহির করিয়া ছাদে বাজাইতে গেল।

সঙ্গীতলক্ষ্মী, আমাদের দুঃখময় পৃথিবীতে তুমি আন নন্দনের সুধাধারা। কথাতীত গভীর বেদনাময় হৃদয়কে তোমার আনন্দ-স্পন্দিনী সুরস্রোতে স্নিগ্ধ কর। আমাদের আত্মার প্রেমের ব্যাকুলতাকে তোমারই সুর-ঝঙ্কারে অনন্ত তারালোকের অশ্রুত সঙ্গীতের সহিত সঞ্চারিত করিয়া দাও।

৩২

ফোর্থ ইয়ারের আরম্ভ।

অজয়রা যখন দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় ফিরিল তখন সব কলেজ খুলিয়া গিয়াছে।

দার্জ্জিলিঙে হেমবাবুর আশাতীত উপকার হইয়াছিল। স্বর্ণময়ীর ইচ্ছা ছিল, সকলে আরও কিছুদিন দার্জ্জিলিঙে থাকেন। অজয়ের ইহাতে কোন আপত্তি ছিল না। সে সকালে ব্রেকফাষ্ট খাইয়া বাহির হইত, সারাদিন ঘোড়ায় চড়িয়া বা বন্ধুদের বাড়ি ব্রিজ খেলিয়া, লাঞ্চ বা চা খাইয়া দল বাঁধিয়া পিক্‌নিক করিয়া কাটাইয়া দিত। একটি য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারের এক সুন্দরী তরুণীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা একটু অধিক হইয়া গিয়াছিল।

কলেজ খুলিয়া গেলে উমা অধিক দিন থাকিতে রাজী হইল না। সে বলিল, তোমরা সবাই দার্জ্জিলিঙে থাক, আমি কলেজের বাড়িতে গিয়ে থাকি; অমলাদিরা যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে আমি বেশ যেতে পারব। ইহা লইয়া মাতা ও কন্যায় বোধ হয় একটা বিবাদ হইত। অত্যধিক বৃষ্টি সুরু হওয়াতে বাধ্য হইয়া সকলকে নামিয়া আসিতে হইল।

অজয়দের বাড়ি পৌছিতে চন্দ্রা ছুটিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। তাহার গলায় দার্জ্জিলিঙে-কেনা রঙীন কৃত্রিম পাথরের মালা। মালা দোলাইয়া সে বলিল—অরুণদা, দার্জ্জিলিঙে আমরা কেমন 'এনজয়' করলুম, তুমি এলে না কেন?

অরুণ তাহার হাত ধরিয়া বলিল—খুব সুন্দর জায়গা ?

চন্দ্রা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

—ও চমৎকার, মেঘের রাজ্য, সে বর্ণনা করা যায় না। তোমার জন্য প্রজাপতি এনেছি।

অরুণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—প্রজাপতি ?

—হাঁ, এক বাক্স প্রজাপতি, অবশ্য মরা। কি সুন্দর সব রং।

'সুন্দর' কথাটি সে এমন স্বর করিয়া টানিয়া বলিল যে অরুণ হাসিয়া উঠিল।

—বা হাসলে যে ?

—মরা প্রজাপতি দিয়ে আমি কি করব রে ?

—নেবে না ? দিদি বললে, তোর অরুণদার জন্যে কিছু নিয়ে যাবি না, তাই কিনলুম।

—নেব, নিশ্চয় নেব।

—বড় বাক্সে ভাল ক'রে বাঁধিয়ে রেখ, খুব সুন্দর দেখাবে।

—দিদি কোথায় ?

—দিদি এই কলেজ থেকে ফিরল।

উমাকে দেখিয়া অরুণ বিস্মিত বিমুগ্ধ হইল। এ কোন্ লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি ! তরুণী-তনুতে অপরূপ সৌন্দর্য্যচ্ছটা। এ তিন মাসে উমা যেন আরও লম্বা হইয়াছে। মুখখানি ছিল অনতিপক্ক পেয়ার ফলের মত, সে-মুখ এখন রসভারাক্রান্ত দ্রাক্ষাফলের মত। গণ্ডের পাণ্ডুরতা, চিবুকের শীর্ণতা আর নাই। প্রভাতসূর্য্যের রক্তিম আলোকে শ্বেত তুষারকিরীট কাঞ্চনজঙ্ঘা যেমন অপূর্ব্ব দ্যুতিময় হইয়া ওঠে, সেই কাঞ্চনদীপ্তি উমার আননে।

—হ্যালো অরুণ, দু-দিন হ'ল এসেছি, আজ মনে পড়ল।

অরুণের ইচ্ছা হইল সে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলে, তুমি স্তব্ধ হও, কি সুন্দর তুমি! তুমি কি অনুভব করছ না, কি সুন্দর তুমি! অন্ধকার রাত্রিশেষে শুভ্র পর্ব্বতলোকে অকলুষা রক্তাম্বরা উষার মত তোমার আবির্ভাব।

—কি দেখছ, চিন্‌তে পারছ না আমাকে!

সত্যই এ কোন মঞ্জুলা অপরিচিতা, মোহিনী মরীচিকা। বিজন প্রহরে একা বসিয়া উমার কথা ভাবিতে তাহার চোখের সম্মুখে উমার যে রূপ ভাসিয়া উঠিত, তাহার সহিত এ রূপের কত প্রভেদ।

অরুণ হাসিয়া বলিল—ক' পাউণ্ড ওজনে বাড়লে?

—মোটা হয়েছি বুঝি খুব? তুমি যে ওজনে কয়েক পাউণ্ড কমেছ তা দেখতেই পাচ্ছি।

—কল্‌কাতায় আর দার্জ্জিঙের 'ফগ' পাই কোথায়।

—মা অত ক'রে লিখলেন, একবার ত আসতে পারতে।

—ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায় না।

—শোন বি-এ-তে কি কি নেব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। আমার ভারি ইচ্ছে বি-এস্‌সি পড়ি, কিন্তু কোথায় পড়ি?

—এসেই পড়ার কথা। অত প'ড়ে কি হবে?

—তাই বই কি! বাবার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। আমি পড়ব।

—মামী কি বলেন?

—মা 'নিউট্রাল'।

—আচ্ছা, আমিও 'নিউট্রল' রইলুম।

—হুঁ, তোমার কথা কে শোনে! শোন, ইতিহাস খুব শক্ত হবে নাকি?

অরুণের কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। এই লাবণ্যময়ী তরুণীর সহিত কোন তুচ্ছ কথা কহিতে ইচ্ছা করে না।

অরুণ বলিল—দার্জ্জিলিঙের গল্প বল। কি করতে সারাদিন?

—গল্প আর কি। ভাগ্যিস অমলাদিরা গেছলেন। কি সুখে যে লোকেরা দার্জ্জিলিঙ যায়! দিনরাত শীতে হি হি কর, সারাক্ষণ ঝুপঝাপ বিষ্টি, আকাশ ত সারাক্ষণ মুখভার করেই আছেন। একটু রোদ হ'ল, আবার চারিদিক অন্ধকার। তুমি তা হ'লে হিষ্ট্রি নিতে বল।

উমার কথাবার্ত্তায় অরুণ কেমন ব্যথা বোধ করিতে লাগিল। অরুণের মন যেমন পরিণত, তাহার হৃদয়ে প্রেম সদাজাগ্রত, উমার সেরূপ নয়। সে গম্ভীর হইতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু এখনও সে অপরিণতা বালিকা। প্রেমের স্পর্শে কিশোরীর হৃদ্‌পদ্ম মাঝে মাঝে কাঁপিয়া ওঠে, এখনও পাপড়ি মেলিয়া বিকশিত হয় নাই। অরুণ সে-কথা বুঝিতে পারে না। সে ভাবে, উমা নিষ্করুণা। অরুণ কেমন আছে, কি করিয়া ছুটি কাটাইল, কেন এত রোগা হইয়া গিয়াছে, এ সব কথা উমা একবার জিজ্ঞাসাও করিল না। হৃদয়ের কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিবে না, এটা তাহার পোজ্‌।

অরুণ ধীরে ধীরে বলিল—মামীমা কোথায়?

—মা, বোধ হয় রান্নাঘরে। আজ আবার চাকরটার হয়েছে জ্বর। রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া অরুণ স্বর্ণময়ীকে প্রণাম করিল। সাধারণতঃ সে কাহাকেও প্রণাম করে না। কিন্তু আজ অন্তরের উদ্বেলিত আবেগকে এই স্নেহময়ী কল্যাণীর চরণে প্রণামরূপে মুক্তি দিতে চায়।

স্বর্ণময়ী অরুণের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—অরুণ, তোমায় বড় রোগা দেখাচ্ছে বাবা।

অরুণ হাসিয়া বলিল—আমার শরীর যে রোগাই মামী। কিন্তু তোমার শরীর ত তেমন কিছু সারে নি।

—আমার ওখানে গিয়ে বড় সর্দ্দিজ্বর হয়েছিল। চল ওঘরে, আমি দুধটা জ্বাল দিয়েই যাচ্ছি।

—না, এখানে বেশ বসছি।

অরুণ একটি বেতের মোড়া টানিয়া রান্নাঘরের দরজার নিকট বসিল।

—তোমরা আর কিছুদিন থাকতে পারতে; মামাবাবুর বেশ উপকার হয়েছে মনে হ'ল।

—বড় বর্ষা নামল, তার পর সবার কলেজ খুলে গেল।

—এখানেও বর্ষা বড় কম নয়।

—আবার বুঝি বৃষ্টি এল, দরজাটা ভেজিয়ে দাও।

উনান হইতে দুধ নামাইয়া স্বর্ণময়ী ডাল চাপাইলেন। নানা কুশল-প্রশ্ন, পারিবারিক সংবাদ জিজ্ঞাসার পর স্বর্ণময়ী অরুণের একটু কাছে বসিয়া বলিলেন—শোন বাবা, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে চাই।

—কি, উমা বি-এ পড়বে কি না?

—না, ও মেয়ে বি-এ পড়ুক। সে কথা বলছি না। কথাটা শুনে তুমি অবাক হবে, আমার খুব মত নয়। কিন্তু ওঁর বড় ইচ্ছা, অজয়ের শীগগির বিয়ে দেন।

—অজয়ের?

—হাঁ। এখন নয়, বি-এস্‌সিটা পাস করুক, তার পর। ওঁর শরীর দেখছ ত। উনি বলছেন, শীতকালটায় কাজে একবার জয়েন করবেন, দিল্লীতে বড়সাহেবদের সঙ্গে একবার দেখাশোনা করা দরকার। তার পর অজয় পাস করলে একটা কাজে ঢুকিয়ে দেবেন।

—অজয় কি বলে?

নেহাৎ অনিচ্ছুক নয়! উনি বলছেন, আমার অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে হওয়া ভাল। ওঁর শরীরও ত দেখছ বাবা, বেশী দিন কাজ করতে পারবেন না। একবার নামমাত্র 'জয়েন' ক'রে তার পর যা-হয় পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে। অজয়ের শীগগির রোজগারে হওয়া দরকার।

—তা অজয় আগে পাসটা করুক; এত তাড়াতাড়ি কি। দার্জিলিঙে কিছু ঘটেছে নাকি?

—সে আর ব'লো না। এক ফিরিঙ্গি মেয়ের সঙ্গে বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিল। উনি বললেন, ওটা যৌবনের চঞ্চলতা, তোমার ছেলের এবার শীগ্‌গির বিয়ে দাও। তাই ভাবছি।

—তা বেশ ত।

—আর ওর যখন এক জায়গায় বিশেষ ইচ্ছে মনে হচ্ছে।

—তাই নাকি? কে?

—আচ্ছা, প্রতিমার বিষয় ও তোমায় কিছু বলে নি।

—প্রতিমার—না।

—আমাদের ইচ্ছা, প্রতিমার সঙ্গেই ওর বিয়ে দি।

প্রস্তাবটি শুনিয়া অরুণ স্তব্ধ হইয়া বসিল। স্বর্ণময়ী ভাবিয়াছিলেন, অরুণ অতি আনন্দের সহিত এ প্রস্তাব সমর্থন করিবে। তিনি একটু লজ্জিত ভাবে বলিলেন—আমার মনে হয় অজয় ওকে ভালবাসে।

কথাটা শুনিয়া অরুণ চমকিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য! অজয় প্রতিমাকে ভালবাসে, এ-কথা সে কোনদিন ভাবে নাই। সত্যই কি অজয় প্রতিমাকে ভালবাসে?

আর প্রতিমা? প্রতিমা এখন শিশু, ও ভালবাসার কি জানে! অজয়ই বা ভালবাসার কি জানে?

স্বর্ণময়ী ধীরে বলিলেন—ও নিয়ে আর ভেবো না বাবা; আমার মনের ইচ্ছা তোমায় বললুম। তবে এখন ও প্রস্তাব কারুর সঙ্গে আলোচনা ক'রে দরকার নেই। অজয় আগে পাস করুক। এমনই ত পড়ায় যা মন।

অরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল। আবেগের সহিত সে বলিল—না মামী, তুমি ঠিক বলেছ; অজয়ের সঙ্গে প্রতিমার—বেশ হবে, খুব ভাল হবে—বা, আমি এতদিন ভাবি নি, আশ্চয্যি, এদিকে ঠাকুমা ত প্রতিমার বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে গেলেন। ওর শীগ্‌গির বিয়ে দেওয়া দরকার, আর কি, ষোল হ'ল, ওর পড়াশোনায় মন নেই, আর কি হবে প'ড়ে। কাকাকে একবার বলতে হবে।

—না বাবা, এখন কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। অজয় পাসটা করুক।

—তুমি যা বল।

—প্রতিমার মনটাও একবার জানা দরকার।

—ওর আবার মন?

—না, না, তার ইচ্ছেটা জানা দরকার বই কি।

—অজয়ের প্রতি তার টান আছে।

স্বর্ণময়ী রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অরুণ আবার মোড়ায় বসিয়া উনানের আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল।

অজয়ের সহিত প্রতিমার বিবাহ! তাহার বুকটা কেমন খচ্ করিয়া উঠিল। সে অনুভব করিল, প্রতিমাকে সে কি গভীরভাবে ভালবাসে। অজয় কি প্রতিমাকে সুখে রাখিতে পারিবে? প্রতিমা যা আব্‌দারে, যা একগুঁয়ে, সংসারে অনভিজ্ঞা শিশু সে। দু-জনেই কি সরল প্রকৃতির। প্রতিমা মামীর স্নেহ পাইবে। বেশ হইবে।

নানা দিনের তুচ্ছ ঘটনা সব অরুণের মনে পড়িতে লাগিল। আশ্চর্য্য! সে নিজের প্রেমবেদনায় এত নিমগ্ন যে তাহার চক্ষের সম্মুখে দুইটি সরল তরুণ-তরুণীর সহজ কৌতুকভরা প্রেমলীলা চলিতেছে তাহা সে লক্ষ্যই করে নাই। একদিন টুলি বলিয়াছিল বটে, দাদা দেখ, তোমার বন্ধু চিঠি লিখেছেন দার্জ্জিলিং থেকে। চিঠিখানা অরুণ চাহিয়া পড়েও নাই। আজ সকালে টুলির গলায় একটি রঙীন পাথরের মালা ছিল। টুলি বলিয়াছিল, মালাটা বড় সুন্দর নয়! মালাটি কোথা হইতে আসিল, সে-সম্বন্ধে অরুণ কোন প্রশ্ন করে নাই।

অরুণের মনে পড়িল, টুলি প্রায়ই বলিত বটে, দাদা তোমার বন্ধু এসেছিলেন, বাবা! আমার গান না শুনলে যেন তাঁর রাতে ঘুম হয় না। অরুণ যখন বাড়ি থাকিত না, ঠিক সেই সময়টি নির্ব্বাচন করিয়া অজয় কেন প্রায়ই অরুণের বাড়ি যাইত, কারণটি তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

তাহার মা-হারা একটি বোন। কিন্তু, একদিন ত টুলির বিবাহ দিতে হইবে। মামীমার মত শাশুড়ী সে কোথায় পাইবে?

অরুণ আপন মনে বলিয়া উঠিল,—মামী, তুমি টুলিকে—, বলিয়া সে থামিয়া গেল। অরুণ বলিতে চাহিতেছিল, তুমি টুলিকে খুব ভালবাসবে মামী।

রান্নার শব্দে স্বর্ণময়ী অরুণের কোন কথা শুনিতে পান নাই। তিনি বলিলেন—কি বলছ অরুণ?

—বিশেষ কিছু না।

—কি একটা বলছিলে।

—উমা তা হ'লে বি-এ পড়বে?

—হাঁ। ওঁর কিন্তু বড় অমত। ও মেয়ে ত কলেজে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। আমাদের আবার পূজোর পর চলেই যেতে হবে হয়ত।

—তোমরা কি শীগ্‌গির দিল্লীতে যাবে।

—ওঁর শীতকালে গিয়ে আপিসে 'জয়েন' করবার ইচ্ছে।

অরুণ স্বর্ণময়ীর মুখের দিকে চাহিল। রেখাঙ্কিত ললাটে কুঞ্চিত গণ্ডে উনানের আগুনের আভা ঝিকিমিকি করিতেছে। যৌবনে যে তিনি অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। দুই চক্ষে কি স্নেহময় দৃষ্টি।

স্বর্ণময়ী ধীরে বলিলেন—তুমি কি ভাবছ বুঝেছি, অরুণ। অজয়ের আগে উমার বিয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু ওকে কিছুতেই মত করাতে পারলুম না। উনি বি-এ পড়বেন, ওঁর অমলাদিদির মত মাষ্টার হবেন বোধ হয়, স্বাধীন হবেন—ওর ভাগ্যে অনেক দুঃখ আছে তোমায় ব'লে দিলুম।

—কি যে বলছ মামী।

স্বর্ণময়ী অরুণের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ ছলছল করিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন—দেখ অরুণ, তোমার মা নেই। মায়ের স্থান কেউ পূর্ণ করিতে পারে না। তবু, তোমাকে আমি কত স্নেহ করি, তুমি জান। আমরা মেয়েমানুষ পরাধীন, আমাদের সাধ পূর্ণ হয় না।

স্বর্ণময়ীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। চোখ মুছিয়া তিনি রান্নার কাজে মন দিলেন।

অরুণ ধীরে বলিল—মামী, তুমি কোন দুঃখ ক'রো না, তুমি আমায় কত স্নেহ কর জানি।

অরুণের দুই গণ্ড আগুনের আভায় আতপ্ত হইয়া উঠিল। রান্নাঘর বড় গরম বোধ হইতে লাগিল। চুপ করিয়া সে প্রজ্বলিত উনানের দিকে চাহিয়া রহিল। উনানের শিক হইতে অঙ্গার নীচে খসিয়া পড়িতে লাগিল।

টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষারাত্রির আকাশ নিকষ-কৃষ্ণ। রুদ্ধ ক্রন্দনের মত আর্দ্র বাতাস গুমরিয়া উঠিতেছে।

অরুণ অজয়দের বাড়ি হইতে বাহির হইল। ভিজিতে ভিজিতে সে জোরে চলিল। বাড়ি ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। ইচ্ছা হইল, অবিরাম শ্রান্তিহীন পথে চলে ; এ পথ-চলার যেন শেষ না হয়।

গলি পার হইয়া সে বড়রাস্তায় আসিয়া পড়িল। বারিসিক্ত পথ আলোয় ঝিকিমিকি করিতেছে। দোকানে দোকানে আলোকের ঝলমলানি। চারিদিকের সজল অন্ধকার-যবনিকা মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের অগ্নিরেখায় কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই পথের জনস্রোত, আলো-অন্ধকারের ধারা অলীক মায়া, অবাস্তব! কোন মায়াবিনীর সৃষ্টি।

জোরে সে চলিতে লাগিল। ছুটিতে ইচ্ছা হইল। এক চলন্ত ট্রামে সে লাফাইয়া উঠিল। ট্রামের সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া জানলার শার্সী ফেলিয়া দিল। আর্দ্র বাতাসে তপ্ত ললাট শীতল হইল।

পথের দিকে সে চাহিয়া রহিল। ট্রাম-লাইনের লৌহদণ্ড, কালো পাথরগুলি আলোয় ঝিকিমিকি করিতেছে

ট্রাম-ডিপো হইতে অরুণ অজানা অন্ধকার পথে চলিল। দুরন্ত বাসনার মত কোন্ অদম্য গতিশক্তি তাহাকে কেবল সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। দিশাহারা হইয়া সে ভিজিতে ভিজিতে চলিল।

প্রান্তর-ভরা অন্ধকার তরুণী পৃথিবীর আদিম রহস্যের মত। দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী যেন নিদ্রিত দৈত্যপুরীর স্তব্ধ প্রহরীর দল।

অরুণ একটি বৃক্ষের তলায় বসিল। ধীরে সে ভাবিতে চেষ্টা করিল। নানা চিন্তার খণ্ডিত সূত্রগুলিতে মাথায় একটা অদ্ভুত জট পড়িয়া গিয়াছে।

হাঁ, অজয়ের সহিত প্রতিমার বিবাহ দিলে প্রতিমা হয়ত সুখীই হইবে। দুই জনেই শিশুপ্রকৃতির। ঝগড়া হইলেও শীঘ্রই আবার ভাব হইবে। প্রতিমাকে অজয় দুঃখ দিতে পারিবে না।

জীবন কি কেবলমাত্র সুখের জন্য, দুঃখের জন্য নয়? যে গভীর দুঃখ পাইল না, সে জীবনের রহস্য জানিল কি? নারী পুরুষকে জীবনের যে-পথে আহ্বান করে সে ত নিছক সুখের পথ নয়। জীবনের অনাস্বাদিত আনন্দরস পান করিতে হইবে।

উমা কি ভাবে?

উমার কথা ভাবিতে গিয়া অরুণের চিন্তার সূত্র বারবার ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল!

আপন মনে সে হাসিয়া উঠিল। আকাশভরা অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

অরুণ চমকিয়া উঠিল। এক কালো ছায়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অবগুণ্ঠিতা নারীর মত।

অরুণ তীক্ষ্মস্বরে বলিল—কে তুমি?

—আমি তোমার হৃদয়শতদলবাসিনী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

—তুমি মায়াবিনী, মানি না তোমাকে। আমি মানি আমার আত্মাকে ও মানবাত্মাকে।

—তোমার ভাগ্যে অশেষ দুঃখ দেখছি।

—দুঃখকে আমি ভয় করি না। আমার আত্মা বীর পথিক।

—তুমি আমার পূজা কর।

—তুমি অলীক মায়া, দুর্ব্বল ভীরুতা, কালো ছায়া আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। জীবনকে আমি বরণ করেছি, জীবনের সকল আনন্দ সকল বেদনাকে গ্রহণ করলুম। তোমার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করব।

আবেগের সহিত অরুণ দাঁড়াইয়া উঠিল। সে ছায়ামূর্ত্তিও দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল। দেবদারু বৃক্ষগুলির শীর্ষ ছাড়াইয়া অনন্ত আকাশের অন্ধকারে তাহার বিরাট দেহ ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গেল।

এ-কি অপরূপ বিশ্বব্যাপিনী নারীমূর্ত্তি! নিবিড় তিমিরপ্রসারিণী ঘনকৃষ্ণকুন্তলরাশি অনন্ত গগনে পরিব্যাপ্ত; কেশদামে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত তারকার মালা; দীপ্ত নয়নে বিদ্যুদ্দাম ঝলসিয়া নৃত্য করিতেছে; বজ্রগর্জ্জনে রুদ্র-ঝঞ্ঝায় তাহার অট্টহাস্য; সে হাস্যে সৃষ্টি বুঝি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

জীবধাত্রী পৃথিবী তাহার পদতল; সপ্তলোক তাহার বিরাট দেহ; ভূর্লোক ভুবর্লোকে পরিব্যাপ্তা শক্তিরূপিনী। অগ্নি তাঁহার চক্ষু, অন্ধকার তাহার ছায়া, তাহার দক্ষিণ করের স্পর্শে জীবন, বামহস্তের স্পর্শে মৃত্যু, এই মায়া-সৌন্দর্য্য তাহার হাস্য, মহাকাল তাহার গতি।

অরুণের মাথা নত হইয়া আসিল। নিস্তরঙ্গ শান্ত সমুদ্রের মত হৃদয় স্থির হইল।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ধীর স্নিগ্ধ বাতাস। পূর্ব্বপ্রান্তে বৃক্ষরাজির পুঞ্জীভূত অন্ধকারের উপর চন্দ্রোদয় হইল। অতি স্নিগ্ধ তাহার আভা অশ্রুসজল হাস্যের মত।

নিস্তব্ধ গম্ভীর প্রকৃতির কি অপরূপ লাবণ্যমূর্ত্তি! এমন শোভা অরুণ জীবনে কখনও দেখে নাই।

রহস্যঘন দুঃখসঙ্কুল অন্ধকার পথ, তোমাকে আমি ভয় করি না। সুকল্যাণী সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর আনন্দ-হাস্য আমার জীবনের পাথেয়।

প্রথম যৌবনের প্রেম জীবনের মর্ম্মস্থলে নাড়া দেয়। সে প্রেম যদি সহজভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে তাহা হইলে জীবন সরল সুখে ভরিয়া যায়।

কিন্তু সে প্রেম যদি বাধা পায়, ঘূর্ণাবর্ত্ত রচনা করে, তবে তাহার অন্তঃশীলা দুর্নিবার স্রোতে অভাবনীয় ভাঙাগড়ার লীলা আরম্ভ হয়, পদ্মার স্রোত যেমন এক কূল ভাঙিয়া নূতন তীর গড়িয়া তোলে।

প্রেমিকের চির-আন্দোলিত অন্তরে শান্তি নাই। অপূর্ব্ব পুলক, অসহনীয় বেদনা। বিশেষতঃ প্রেমিক যখন কল্পনাবিলাসী আদর্শবাদী যুবক হয়, সে প্রেমাস্পদকে লাভ করিতে চায় না, সে চায় গভীর আত্মোপলব্ধি, আত্মোৎসর্গ করিতে।

কখনও প্রেমের কেন্দ্রাভিকর্ষিণী শক্তিতে সে আত্মস্থ হয়, বিজন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে একাকী সাধকের মত সে গভীর আনন্দে মগ্ন হয়। কখনও প্রেমের কেন্দ্রাতিগ শক্তি তাহাকে ব্যথিত উদাসী করিয়া তোলে, পৃথিবীর সকল দুঃখীর সহিত সমবেদনায় অন্তর ভরিয়া ওঠে, সকল অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করে।

অন্ধভক্ত যেমন দেবীমূর্ত্তির দেবীকে ভুলিয়া বিগ্রহ লইয়া মাতিয়া ওঠে তেমনই প্রেমিক প্রেমাস্পদাকে লাভ করিবার কথা ভুলিয়া যায়, প্রেমাস্পদা তাহার নিকট প্রতীক মাত্র।

অরুণ আপন অন্তরে উমার মানসী মূর্ত্তি যতই সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিল, বাস্তব উমার সহিত তাহার যোগসূত্র ততই শিথিল হইয়া যাইতে লাগিল। উমা যখন দূরে দার্জ্জিলিঙে ছিল, তাহার সঙ্গলাভের জন্য সে কাতর হইয়া উঠিত। এখন উমা নিকটে। সে উমার কথা ভাবে কিন্তু প্রতিদিন উমার সহিত দেখা করিবার জন্য আকুল হয় না। অজয়দের বাড়িতে গেলে, মামীমার সহিত গল্প করে, চন্দ্রার সহিত খুনসুড়ি করিয়া চলিয়া আসে, উমা কোথায়, তাহার খোঁজও লয় না।

উমাই এখন অরুণকে খুঁজিয়া দেখা করে। বাড়িতে অরুণের গলা শুনিলে সে নিজেই ছুটিয়া আসে অথবা চন্দ্রাকে ডাকিতে পাঠায়। অরুণ হয়ত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতেছে, চন্দ্রা পথ আটকায়, বলে, অরুণদা, দিদি ডাকছেন। তাহার মুখে দুষ্টামির হাসি। বিস্ময়ের ভান করিয়া অরুণ বলে, দিদি আছেন নাকি বাড়িতে? বারান্দা হইতে উমার কণ্ঠ শোনা যায়, আছি বইকি, জলজ্যান্ত এখনও রয়েছি, বড় মুস্কিল হ'ল তোমার।

সিঁড়ি দিয়া অরুণকে উঠিয়া আসিতে হয়।

উমা হাসির সুরে বলে, কি বড় উদাস দেখছি, আমাদের আর খোঁজখবরই নাও না। রাগ হ'ল নাকি আমার ওপর?

—হাঁ, রাগ, তবে সেটা অণু পরিমাণে।

—খুব ফাজিল হয়েছ। ব'স চেয়ারে।

—না, বেশীক্ষণ বসব না।

—ব'সই না বাপু একটু।

উমার হাস্যদীপ্ত মুখ দেখিতে যেমন ভাল লাগে, তাহার কৌতুকভরা কণ্ঠস্বর শুনিতে তেমনি বেদনা বোধ হয়।

অরুণ ভাবে, কেন এ অভিনয়! উমা ফ্লার্ট নয়, সে জানে। সে প্রেমের অভিনয় করিবে না। অরুণ ফ্লার্টিং সহ্য করিতে পারে না। প্রেমের অবমাননা! উমার এই সহজ সৌহার্দ্য, তরুণীহৃদয়ের কৌতুকলীলাও সে চায় না। কিন্তু উমা ডাকিলে, ছুটিয়া আসিতে হয়।

অরুণ ধীরে বারান্দার কোণে বেতের চেয়ারে বসে। প্রথমে উমাই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করে, অরুণ দু-চারটি কথায় উত্তর দেয় মাত্র। তার পর তাহার মনে সাড়া পড়িয়া যায়। উমার সকল কথার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করে। সে অনর্গল কথা কহিতে আরম্ভ করে, সাহিত্য, সমাজ, মানবসভ্যতা নানা বিষয়ে বক্তৃতা সুরু করে। উমা প্রতিবাদ করে না, তর্ক করে না, চুপ করিয়া শোনে, শুনিতে শুনিতে ক্লান্তি লাগিলে হাসিয়া ওঠে। তখন অরুণের চেতনা হয়, উমা হয়ত তাহার কথাগুলি পাগলের প্রলাপরূপে উপভোগ করিতেছে।

এখন অরুণ আর মুখচোরা, শান্ত ছেলেটি নাই, সে প্রগল্‌ভ, অকারণে তর্ক জুড়িয়া দেয়।

উমা হাসিয়া বলে, বাবা, অরুণ আজকাল কি বকতেই পার। রাঙা সরু ঠোঁট দুইটির ফাঁকে দাঁতগুলি মুক্তার মত ঝিকিমিকি করিয়া ওঠে।

অরুণ উমার উপর রাগিয়া উঠিতে পারে না, সে একটু বিরক্তির সহিত বলে, না, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে লাভ নেই, তুমি কিছু শুনছ না, বুঝতেও চেষ্টা করছ না।

—মেয়েমানুষের বুদ্ধি, আমরা কি অত বুঝতে পারি?

—দেখ, সব বিষয়ে ঠাট্টা ক'রো না।

—আচ্ছা, তুমি বলছ ডষ্টয়ভস্কি হচ্ছেন টুর্গনিভের চেয়ে বড় লেখক। এখন আমার যদি টুর্গনিভকে বেশী ভাল লাগে, আমি কি করব বল—

—ডষ্টয়ভস্কিকে বোঝবার চেষ্টা কর। যিনি "ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্টে"র মত বই লিখতে পারেন—

—কই, "ইডিয়ট" বইখানা আমায় দিলে না ?

—আমি চাই তুমি নিজের ইচ্ছায় পড়, আমি বল্‌ছি বলে তুমি পড়বে কেন ?

—আহা রাগ কর কেন !

উমার সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক ঝগড়ায় না হইলেও এরূপ একটা কথা-কাটাকাটিতে শেষ হয়। উমা যখন সকরুণ চোখে অরুণের দিকে তাকায় তার পর মৃদু হাসে, গণ্ডদেশ রাঙা হইয়া ওঠে, অরুণ মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার অন্তরের তাপ জুড়াইয়া যায়।

বস্তুতঃ, উমার সহিত এইরূপ কথা-কাটাকাটির পর তাহার বুক হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া যায়। বর্ষণমুক্ত নির্ম্মল আকাশের মত তাহার হৃদয় অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে। অকারণে পথে পথে বহুক্ষণ ঘুরিয়া সে বাড়ি ফেরে।

এ ক্ষণিক শান্তি। অন্তরাকাশ জুড়িয়া আবার কাল মেঘ ঘনাইয়া আসে। শ্রাবণের বর্ষণমুখর রাত্রি নিদ্রাহীন, বেদনাময়।

মাঝে মাঝে অরুণের সন্দেহ জাগে। তাহার এ প্রেম অলীক মায়া। ঊর্ণনাভের মত তাহার তরুণ মন এ কোন্ রঙীন জাল রচনা করিয়া চলিয়াছে। এ জাল ছিন্ন করিয়া সে মুক্ত হইতে চায় কিন্তু বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার মত প্রাণশক্তি বুঝি তাহার নাই। মন্ত্রমুগ্ধের মত এ প্রেম-মায়াজালে জড়িত থাকিতে ভাল লাগে। ইহার বেদনাও সুমধুর। এ যৌবনস্বপ্ন যদি টুটিয়া যায়, তাহার জীবন যে শূন্য, ব্যর্থ, নিরর্থক হইয়া যাইবে।

অরুণের সত্তার এক অত্যাশ্চর্য্যকর বিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। এক

দিকে সে প্রেমস্বপ্নমুগ্ধ ভাবলোকবাসী, আবার সে তর্কবিলাসী, বিশ্লেষণপ্রবণ তীক্ষ্ণধী, আপন বুদ্ধি দিয়া সকল মত বিচার করিতে, যাচাই করিতে চায়।

এ বিচারবুদ্ধি বিপ্লবী। তাহার জীবনের সরল বিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়গুলি ভাঙিয়া যাইতে লাগিল।

ঈশ্বরের সত্যতা সম্বন্ধে অরুণ কোনদিন সন্দেহ করে নাই, একদিন সে বাণেশ্বরের অপেক্ষাও জোর-গলায় বলিল, ঈশ্বর নাই; অন্ততঃ তোমরা যাঁহাকে ঈশ্বর বল তিনি নাই।

দেখা যাইত, ক্লাসে বা কমন্-রুমে বা কলেজের সম্মুখে দেবদারু-বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন পথে দাঁড়াইয়া যে-কোন স্বল্পপরিচিত সহপাঠীর সহিত অরুণ হাত নাড়িয়া তর্ক করিতেছে, আপন মত প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

কাহাকেও বলে, বাঁধা বুলি ছেড়ে দাও, নিজের বুদ্ধি হচ্ছে মাপকাঠি। চিন্তা কর, বিচার কর।

কাহাকেও বলে, কেবলমাত্র সত্যের অনুসন্ধান নয়, সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শাসন, অনুশাসন কিছু মানব না। বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা আমাদের দেশে আজ সবচেয়ে বড় দরকার।

এক দিন সে শিশির সেনকে ডাকিয়া বলিল, আচ্ছা, লেনিন সম্বন্ধে তোমার মত কি?

শিশির সেন বলিল, লেনিন একটা থার্ড-রেট লোক, তবে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার দুর্ভাগ্যকর সম্মিলনের ফলে সে খুব শক্তিলাভ ক'রে নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাল রাখতে পারবে না দেখো।

—আমি বলছি, রাশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবের পর হ'তে মানবইতিহাসের এক নবযুগের আরম্ভ হ'ল। লেনিন সে-যুগের দ্বার খুলে দিলেন। তিনি মহাপুরুষ।

—চেঙ্গিস খাঁর বংশধর যদি মহাপুরুষ হন! তুমি কি কম্যুনিজমে বিশ্বাস কর?

—আমি কোন মতবাদে বিশ্বাস করি না। কোন স্থির মত মানা হচ্ছে সত্যকে গণ্ডীবদ্ধ ক'রে রাখা। ভাবী মানবের ধর্ম্ম কি হবে, বলতে পার?

—দেখ অরুণ, ভাবী যুগের ধর্ম্ম কি হবে তা ভাববার অনেক সময় আছে, কিন্তু পরীক্ষাটা বড় সন্নিকট। বি-এ-তে রেজাল্ট যাতে ভাল হয় সেই চেষ্টা করো। পরীক্ষার পর ওসব বইগুলো প'ড়ো।

—তোমার সারাক্ষণ পরীক্ষার কথা।

অরুণ বিপ্লববাদী হইয়া উঠিল। হয়ত ইহা তাহার প্রেমবিদগ্ধ মনের প্রতিক্রিয়া। বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন দরকার। জনশক্তির কর্তৃত্ব রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে মানবসভ্যতার কল্যাণ নাই।

কেবলমাত্র চিন্তা করিয়া, একটা মত ভাঙিয়া নূতন মত প্রতিষ্ঠা করিয়া সে শান্তি পায় না। বাণেশ্বরের মত কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা করিয়া আনন্দ হয় না। হৃদয় যে প্রেমতৃষিত।

কখনও সে হরিসাধনের দলে জুটিয়া সেবার কাজে লাগে। উৎসাহের সহিত নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়াইতে যায়। মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষপীড়িত বা বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামে গ্রামে গিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের দলে কাজ করে। সেবার কাজ বেশীদিন ভাল লাগে না। বর্ত্তমান মানব-সভ্যতাকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। কার্ল মার্কসের ক্যাপিটল্, কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের রোড্স টু ফ্রিডম্, লেনিনের

ষ্টেট্ এণ্ড রেভল্যুশন, সোসিয়ালিজমের নানা প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ ধর্ম্মগ্রন্থের মত পাঠ করে, আবার বিচার করিতে বসে। ইহারা যা লিখিয়াছেন তাহা কি সত্য? কোন্ পথে মানবের কল্যাণ? এই সংগ্রাম, বিপ্লব ভাল লাগে না। ইচ্ছা করে সমস্ত জীবন প্রেমে সেবায় সৌন্দর্য্যে সুন্দর ফুলের মত, গানের মত বিকশিত করিয়া কোন দেবীর চরণে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিয়া দেয়।

কোথায় সে দেবী?

জীবন কি কেবল প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা, সত্যের জন্য শক্তির জন্য সংগ্রাম, অজানা দুর্গম পথে এগিয়ে চলা?

সমস্ত দিন অরুণ অশান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। কলেজে যায়, সকল ক্লাসে যোগ দেয় না। হোষ্টেলে, নানা বন্ধুর বাড়িতে, নানা আড্ডায় ঘুরিয়া রাত্রে শ্রান্ত হইয়া বাড়ি ফেরে। তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া দক্ষিণমুখী বারান্দায় বা ছাদের ছোট ঘরটিতে আলো জ্বালাইয়া বসে।

রাত্রে তাহার আর এক নূতন জীবন আরম্ভ হয়। দিনের অরুণের সহিত রাত্রের অরুণের যেন কোন যোগ নাই। প্রেমস্বপ্নমুগ্ধ কবি যুবকটি জাগিয়া ওঠে। সে তর্ক করে না, সোসিয়ালিজমের গ্রন্থ পড়ে না। ব্রাউনিঙের কাব্যগ্রন্থ, ডষ্টয়ভস্কির উপন্যাস, রাস্কিনের মডার্ণ পেণ্টারস্ খুলিয়া বসে। শেলী পড়িতে ভাল লাগে না। ব্রাউনিং তাহার প্রিয়তম কবি।

রাত্রি গভীর হয়। জীর্ণ পরিত্যক্ত উদ্যানের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মায়া চারিদিকে ঘনাইয়া আসে। সূর্য্যালোকের যবনিকা সরিয়া গিয়া অনন্তাকাশের নক্ষত্রলোক উদ্ভাসিত। এই ক্ষুদ্র পৃথিবী যে অসীম শূন্যে ঘূর্ণায়মান লক্ষ লক্ষ সূর্য্য তারকার সহিত একই সূত্রে যুক্ত, একই ছন্দে চালিত, সে রহস্য প্রকাশিত হইয়া যায়।

সুগভীর স্তব্ধতা, নিস্তরঙ্গ সুপ্ত নদীজলের মত। নিশীথাকাশের নীচে দাঁড়াইয়া অরুণ সে স্তব্ধতা অশান্ত অন্তরে অনুভব করিতে চায়, হৃদয়ের পাত্রে সে স্তব্ধতার সুধারস কানায় কানায় ভরিয়া লইতে চায়। অমনি কোথায় চঞ্চলতা জাগে, শ্যামল তৃণ হইতে আকাশের তারায় তারায় বিদ্যুতের চমকের মত প্রাণের শিহরণ!

কোথাও একটু স্তব্ধতা নাই। পৃথিবীর ধূলিকণা হইতে নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী পর্য্যন্ত কত পদধ্বনি, অবিশ্রাম এগিয়ে চলার শব্দ। মাটির তলে অঙ্কুরগুলি প্রকাশের কামনায় কাঁপিতেছে, গাছে গাছে ফুলগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবার বেদনায় দুলিতেছে, নীড়ে নীড়ে পাখীগুলি ভোরের আলোর আশায় সচকিত হইয়া উঠিতেছে, আকাশের তারাগুলি অন্ধকারে কাহার অভিসারে ধাবমান, এই জগদ্ব্যাপী প্রাণস্রোত অরুণের রক্তধারায় প্রবাহিত, পথিক-বিশ্বের প্রগতির ছন্দে তাহারও বক্ষের রক্ত দুলিয়া ওঠে।

রাত্রির অন্ধকারে দাঁড়াইয়া অরুণ গভীর শান্তি লাভ করে।

৩৪

অতি পুরাতন দীঘিকা, এখন মজিয়া গিয়া ও পানায় ভর্ত্তি হইয়া ক্ষুদ্র পুষ্করিণী হইয়া গিয়াছে। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে যে রাজবল্লভ চৌধুরী এই দীঘির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ এখন কেহ আই-সি-এস্, কেহ ব্যারিষ্টার, খ্যাতনামা ডাক্তার, কেহ বা গরীব কেরাণী। দীর্ঘিকাতীরে অবস্থিত তাঁহার বৃহৎ ভগ্ন-প্রাসাদের সংস্কার করিবার কিন্তু কেহ নাই। যে বৃদ্ধা বিধবা এই ভগ্ন অট্টালিকার এক কোণে বাস করিতেন, দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে; এখন ভগ্ন শিবমন্দিরে প্রতি সন্ধ্যায় আর প্রদীপও জ্বলে না। প্রাসাদের মধ্যে সাপ, শেয়াল, বাদুড় নানা জন্তুর বাস। গ্রামের লোকেরা এই তৃণলতা-বেষ্টিত ভগ্নস্তূপে প্রবেশ করিতে সাহস করে না। তবে, গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণীগুলিতে জলাভাব হয়, সকলে চৌধুরী-পুকুরে জল লইতে আসে। কোন সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদের গুণে ইহার জল কখনও শুকায় না।

বড় রাস্তা হইতে কিছু দূরে, গ্রাম হইতে সুদূরে অতি নিরালা স্থানে পুষ্করিণীটি। পূর্ব্বতীরে অতি প্রাচীন এক অশ্বত্থ বৃক্ষ চারিদিকে শাখা-প্রশাখা মেলিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার গভীর ছায়াতলে এক ভাঙা ঘাট।

অশ্বত্থ বৃক্ষের গুঁড়ির তলদেশ হইতে মোটা শিকড়গুলি মাটি ভেদ করিয়া তৃষিত কৃষ্ণ সর্পদলের মত জলাশয়ের দিকে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নামিয়া গিয়াছে।

মোটর-গাড়ীর রাগ্ গাছের গুঁড়ির পার্শ্বে পুষ্করিণীর তীরে বিছাইয়া দিয়া অরুণ উমাকে বলিল—ব'স।

উমা মধুর হাসিয়া উঠিল। হৃদয়াবেগে তাহার অধর আরক্ত। স্কুল হইতে পলাতকা ছোট মেয়ের মত সে চঞ্চলা ; নাচের ভঙ্গীতে চলিয়া সে বলিল, বা, কি চমৎকার, রোমান্টিক জায়গা, বসব কি! এতক্ষণ ত মোটরে ব'সে এলুম। চল চারিদিকে ঘুরে আসি, বাড়িটায় ঢুকতে ইচ্ছে করছে, কেউ নেই নিশ্চয়।

বহুক্ষণ একটানা মোটর-গাড়ী চালাইয়া অরুণ শ্রান্ত। সে বলিল, না, না, এসব পুরনো বাড়িতে বড় সাপ আছে।

উমা হাসিয়া উঠিল, কি ভয় তোমার! কি স্থির জল দেখ, আহা কি সুন্দর ছায়া পড়েছে গাছগুলোর, ওই নারিকেল গাছটার!

—মনে হয় যেন জলের তলে কোন সুন্দর সবুজের দেশ আছে।

—ঠিক বলেছ, রূপকথার সেই পুষ্করিণীর মত ; সাপের মণি হাতে ক'রে ডুব দিলে দু-ধারে জল সরে যাবে, পৌঁছাব কোন্ অপরূপা রাজ-কন্যার দেশে—চল ওদিকে একটু ঘুরে আসি।

উমা, 'ঘুরে আসি' বলিল বটে, কিন্তু রাগ্‌টিতে বসিয়া ঘাসের ওপর পা ছড়াইয়া দিল। অদূরে মোটর-গাড়ীর দিকে অরুণ অগ্রসর হওয়াতে উমা আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল, বা, কোথায় যাচ্ছ, যেও না, ব'স।

—খিদে পায় নি? কেকগুলো নিয়ে আসি।

—তুমি আবার কবি? এমন সুন্দর শোভা, একটু স্থির হয়ে ব'সে উপভোগ করবে, তা নয়, কেক্ খাব—আচ্ছা নিয়ে এস শীগ্‌গির।

প্রশান্ত পুষ্করিণী কানায় কানায় ভরা। শরৎ-মধ্যাহ্নের স্বচ্ছ আলোক স্থির জলে দর্পণের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। নির্ম্মল আকাশের নীলিমা, শান্ত মেঘস্তূপের শুভ্রতা, ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরুশ্রেণী, কত বিচিত্র বর্ণের

প্রতিবিম্ব। বৃক্ষে তৃণে লতাজালে সবুজের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে দিগ্বধূদের শ্যামল অঞ্চল লুণ্ঠিত। দূরে স্বর্ণশীর্ষ ধান্যক্ষেত্রের হরিতশ্যাম পট আলোকে ঝলমল। চারিদিক মায়াময়, নিঃশব্দ।

উমা মুগ্ধ হইয়া শরতের শোভা দেখিতেছিল। সে চমকিয়া চাহিল, অরুণ নাই। তাহার ভয় হইল, বুক দুলিয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া চেঁচাইল—অরুণ, কোথায়—কোথায় তুমি ?

উমার কাতর কণ্ঠস্বরে অরুণ ভীতভাবে ছুটিয়া আসিল—কি, কি হয়েছে ?

উমা উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল—কিচ্ছু না। শোন, কি সুন্দর, প্রতিধ্বনি হ'ল, ওই ভাঙা বাড়ি থেকে প্রতিধ্বনি আসছে—শোন—

উমা এবার দীপ্তকণ্ঠে চেঁচাইল—অরুণ।

ভাঙা বাড়ি হইতে প্রতিধ্বনি উত্তর করিল—অ—রু—ণ !

উমার প্রদীপ্ত আননের দিকে অরুণ মুগ্ধনেত্রে চাহিল। এই মধ্যাহ্ন-আলোকপ্লাবনে জলে স্থলে আকাশে যে মায়া পরিব্যাপ্ত তাহাই বুঝি উমার মধ্যে মূর্তিমতী হইয়া উঠিতে চায়।

—বা, আবার কোথায় যাচ্ছ ?

—গাড়ীর দরজাটা বন্ধ ক'রে আসি।

—না, না, ব'স। ডালমুটটা ওখানে রেখ না, এক্ষুণি পিঁপড়ে খাবে।

—কেক্‌গুলো ধর।

—এইখানে বসি এস, বেশ জলের কাছে। পুকুরটাতে নিশ্চয় অনেক মাছ আছে, কেক্ দিলেই এক্ষুণি আসবে দেখ না।

ভাঙাঘাটের শেওলা-ধরা সিঁড়ির ছোট ইটগুলির উপর দুই জনে পাশাপাশি বসিল।

—আচ্ছা, মাকে কি ব'লে এলে ?

—বলে এসেছি, আমরা একটু মার্কেটে যাচ্ছি।

—বেশ মার্কেটিং করছ, নয়!

—ভয় নেই, ব'লে এসেছি, আমাদের ফিরতে দেরি হ'তে পারে, বইয়ের দোকানে যেতে হবে, একটা বায়স্কোপও দেখে আসতে পারি।

—তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যাক্। কই, কোন মাছ আসছে না ত।

—জলের অত কাছে যেও না, সিঁড়ি বড় পেছল্—

—চুপ, শোন, কি সুন্দর ডাক, কি পাখী বল ত?

দক্ষিণের আম্র খর্জ্জুরবন হইতে একটী পাখীর আকুল কণ্ঠস্বরে স্তব্ধ বনভূমি সচকিত হইয়া উঠিল। উড়িতে উড়িতে একটি পাখী ধানক্ষেতের দিকে চলিয়া গেল। আবার চারিদিক্ নিস্তব্ধ।

—পা গেছল পিছলে, আর একটু হ'লে পড়তে জলে; উঠে এস লক্ষ্মীটি।

"ওরে সাবধানী পথিক বারেক পথ ভুলে মর ফিরে—" উমা কলহাস্যে গান গাহিয়া উঠিল। চঞ্চলপদে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের গুঁড়ি ঠেস দিয়া বসিল। ভাঙা ঘাটের উপর বসিয়া অরুণ মুগ্ধভাবে এ অপূর্ব্ব অজানা উমার দিকে চাহিয়া রহিল।

ঘটনাটি এইরূপ: ভাঙা মোটর-গাড়ীটি সারিয়া আসাতে অরুণ সেইটি লইয়া অজয়দের বাড়ি সকালে হাজির হইয়াছিল। গাড়ী দেখিয়া উমা বলিয়াছিল, মা মার্কেটে যাবে, অনেক জিনিষ কেনবার রয়েছে। স্বর্ণময়ী বলিয়াছিলেন, তুই যা অরুণকে নিয়ে, আমার হাতে অনেক কাজ; অরুণ তুমি আর বাড়ি ফিরো না, এইখানে খেয়ে যাও।

দুই জনে তাড়াতাড়ি খাইয়া মোটর-গাড়ীতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গেল, সামান্য খাবার জিনিষ ছাড়া বিশেষ কিছুই কিনিল না।

মার্কেট হইতে বাহির হইয়া অরুণ বলিয়াছিল, চল কোথাও ঘুরে আসা যাক্। উমা বলিয়াছিল, আউটিং করবার মত দিন বটে, কোথায় যাবে? অরুণ হাসিয়া বলিয়াছিল, নিরুদ্দেশ-যাত্রা।

তাহাদের বেশী দূর যাইবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অরুণ যখন ষ্টিয়ারিং হুইল ধরিয়া বসিল, পার্শ্ববর্ত্তিনী উমার হাস্যের ছন্দে চক্ষের চাহনিতে আতপ্ত স্পর্শে তাহার দেহ-মনে গতির মাদকতা লাগিয়া গেল। বালীগঞ্জ পার হইয়া গড়িয়াহাটা রোড ধরিয়া সে মোটরকার ছুটাইয়া দিল মাইলের পর মাইল। উমা বলিয়াছিল, আজ বড় সুন্দর মোটর চালাচ্ছ, কিন্তু কোথায় চলেছ?

Last drive together! Who knows but the world may end to-night?

—আচ্ছা, কবিতা আওড়াতে হবে না, পেট্রল আছে ত?

শরতের আলোভরা অজানা পথ দিয়া বহুক্ষণ মোটর-গাড়ী চালাইয়া কয়েকটি গ্রাম পার হইয়া, তাহারা এই প্রাচীন ভগ্ন প্রাসাদ ও পুষ্করিণীর সম্মুখে আসিয়া থামিয়াছে।

.

গান শেষ করিয়া উমা বলিল, ক'টা বাজল বল ত?

—সৌভাগ্যক্রমে সঙ্গে ঘড়ি নেই, আর গাড়ীর ঘড়িটাও বন্ধ।

—বেশ দেরি যখন হয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যাক্। চারিদিক্ কি নিঝুম, মনে হয় যেন এখানে সময়ের চলা থেমে গেছে। আচ্ছা, অরুণ তোমার কবিতা পড়ে শোনালে না?

—শোনাব।

—আর কবে শোনাবে, যদি আজ সঙ্গে আনতে বেশ হ'ত। এমনি জায়গায় ব'সে কবিতা পড়তে হয়।

—তোমরা কি এ মাসের শেষে সত্যিই দিল্লী যাচ্ছ?

—এখন পর্য্যন্ত ত তাই ঠিক। আমি মাকে বলছি, আমি বোর্ডিঙে থাকব, তা কিছুতেই রাজী নন।

অরুণ চুপ করিয়া জলের ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

উমা হাসিয়া বলিল, একটা ঢিল দাও ত, আমি আর উঠতে পাচ্ছি না, বেশ আরামে বসেছি।

—ঢিল কোথায়, দেখছি না, কি করবে?

—জলে ছুঁড়ব, আচ্ছা, একটা কেক দাও।

উমা একটি কেক্ লইয়া পুষ্করিণীর শুব্ধ জলের মধ্যভাগে ছুঁড়িল। স্থির জল কাঁপিয়া উঠিল, একটি ক্ষুদ্র জলতরঙ্গ বৃত্তাকারে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া তীরে আসিয়া আঘাত করিল, গাছের ছায়াগুলি কাঁপিতে লাগিল।

—দেখ, অরুণ, কি সুন্দর দেখায়; ছোটবেলায় আমরা ভা'-কলসীর টুকরো নিয়ে খেলতুম, জলের ওপর ব্যাঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে যেত।

—জলটি ছিল শান্ত, স্থির, আয়নার মত, তুমি দিলে কাঁপিয়ে, গুলিয়ে, শান্তি বুঝি তোমার সয় না।

—ঠিকই ত, আমরা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবার জন্যেই ত জন্মেছি। শান্তি নয়, জীবন চাই।

—শোন, তোমায় একটা কথা বলতে চাই—

—দেখ, অরুণ, এখানে আর বক্তৃতা সুরু ক'রো না, দিনটি বড় সুন্দর, বড় ভাল লাগ্ছে, বেশ আরামে বসেছি কিন্তু, কি বল—

—না, কিছু না।

—ওই ত তোমার দোষ, এতটুকুতেই রেগে যাও, বলো। আমি এখন সব শুনতে রাজী আছি। এমন দিনে যত অসম্ভব কথা শুনতে ইচ্ছে করে, অদ্ভুত কল্পনা—

উচ্ছ্বসিত হইয়া উমা গাহিয়া উঠিল—"এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়—"

এক লাইন গাহিয়া সে থামিয়া গেল,—ও, এটা ত বর্ষা নয়, তবে বৃষ্টি আসতে পারে, ওদিকে সাদা মেঘগুলো কেমন কালো হয়ে যাচ্চে দেখ।

প্রাচীন অশ্বত্থ গাছে ঠেস দিয়া উমা অর্দ্ধশায়িতভাবে পা ছড়াইয়া বসিয়া, ঘনকৃষ্ণ ঈষৎ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ কালো গুঁড়ির সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে, রক্তকরবী-বর্ণের শাড়ীর জরির আঁচল গাঢ় সবুজ সিল্কের ব্লাউস হইতে খসিয়া তৃণভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিবার পর তাহার মুখে যে কাঞ্চনদীপ্তি ছিল তাহা ম্লান হইয়া গিয়াছিল, আজ শরতের শ্যামলশ্রীর মত পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ মুখের গণ্ডে কপোলে রক্তিম লাবণ্যোচ্ছ্বাস নিপুণ শিল্পীর তুলির টানের মত। অপরূপ তাহার চোখের চাহনি। দীর্ঘ অক্ষিপক্ষ্মের নীচের চক্ষুতারকাদ্বয় হইতে স্বপ্নময় দীপ্তি মরকতমণির জ্যোতির মত। ওই চোখের দিকে চাহিয়া বুঝি অসাধ্য সাধন করা যায়।

উমা হাসিয়া উঠিল, শুভ্র মুক্তার মত দাঁতগুলি ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল।

—কি, বল কিছু, চুপ করে রইলে যে।

—কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে।

—হা-হা, তবু একটা মনের কথা বললে—কিন্তু তুমি কি বলতে যাচ্ছিলে,—সুন্দর—মানে আমি সুন্দর নই, তবে এই সুন্দর দিনে সবই সুন্দর ঠেক্‌ছে।

—সবেতেই তোমার পরিহাস।

—আচ্ছা, জীবনটা কি একটা পরিহাস নয়। জীবন সম্বন্ধে সিরিয়াস্‌লি ভাবতে বসলে আমি ত তার কোন অর্থ খুঁজে পাই না। কেন এত দুঃখ?

—আমরা জীবনের কতটুকু জানি, কতটুকুই বা বুঝি।

—হয়ত কোন এক গভীর অর্থ আছে, আমাদের সকল দুঃখ হয়ত একদিন সার্থক হবে। কি উদ্দেশ্য কি সার্থকতা তা আগে জানতে পারলে জীবনের দুঃখ সহজ হয়ে আসে না কি?

—জীবন সম্বন্ধে তুমি কি সত্যই ভাব?

—তুমি কি ভাব, জীবনে তুমিই দুঃখ পাও, আর কেউ পায় না? তোমার পাল্লায় পড়ে আমিও দার্শনিক হয়ে উঠেছি দেখছি।

—আমি জানি তুমি সুখী নও—তোমাকে যদি জীবনে সুখী করতে পারতুম—ভেবে দেখেছ কি, দুঃখের দুটো রূপ আছে, একটা বাহিরের জীবনের, সংসারের দুঃখ, সে দুঃখ তুচ্ছ, কিন্তু আর একটা দুঃখ অন্তরের, আত্মার বেদনার, সে হচ্ছে আপনাকে প্রকাশের বেদনা, হৃদয়ের বেদনা, সেইখানে যদি স্পর্শ করতে না পারি, সেই বেদনা যদি দূর করতে না পারি—থাক্‌ আজ বক্তৃতা দেব না, এই প্রসন্ন সুন্দর দিনের নৈর্মল্য, শান্তি অন্তরে ভরে নিই।

—তোমার মত আমিও ভাবতে চেষ্টা করি। আমার মনে হয় এক জায়গায় আমরা বড় একা, সেখানে কেউ সঙ্গী হ'তে পারে না। প্রত্যেককে নিজ জীবনের দুঃখ একাই বহন করতে হবে। কি জানি, জীবনের এ-সব প্রশ্নের কি উত্তর?

—জীবনের প্রশ্নের উত্তর জীবনের বেদনা আনন্দের অনুভূতির মধ্যে হয়ত পাওয়া যাবে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না।

-- ঠিক বলেছ। দেখ দেখ কি সুন্দর পাখী, কি পাখী ?

—মাছরাঙা মনে হচ্ছে।

—খুব কবি ! পাখীদের নাম লেখ, একটাও চেন না। চল, কবিত্ব করা গেল, দর্শন-চর্চ্চা হ'ল। এখন ক'টা বাজল ?

—আর একটু ব'স।

সূর্য্য পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িল। বৃক্ষপত্রান্তরাল হইতে কয়েকটি স্বর্ণরশ্মি উমার কেশে কপোলে কণ্ঠের স্বর্ণহারে ঝিকিমিকি করিতেছে ; কয়েকটি পীতপত্র শাড়ির অঞ্চলে ঝরিয়া পড়িল। আম্রবন বাতাসে মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল। আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লীলা।

অরুণ বিমুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এ যেন রূপকথার মায়াপুরী।

সহসা ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি আসিল। ছুটিয়া মোটর-গাড়ীতে আশ্রয় লইতে হইল।

গাড়ীতে দুইজনে বসিল ঘেঁষাঘেঁষি। বারিবর্ষণের মধ্যে অরুণ মোটরকার ছুটাইয়া দিল।

ধীরে বৃষ্টি থামিয়া গেল। বারিস্নাত প্রকৃতির হরিৎ-শ্যাম চিত্রপট অলৌকিক আলোকে সমুজ্জ্বল।

ফিরিবার পথে উমা প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে দু-এক লাইন গান গাহিতে লাগিল। অরুণ দু-একটি কথা বলিল মাত্র। শরতের ভরানদীর মত তাহার অন্তর কোন আনন্দরসে কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

৩৫

এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শরৎ-অপরাহ্নের সূর্য্যালোক ভিজে বারান্দার রেলিঙে ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। উমার ছোট ঘরের দরজার খয়ের-রঙের পর্দ্দাটি সরানো। বারান্দার কোণে কাপড়ের ট্রাঙ্ক, বইয়ের বাক্স, স্যুটকেস, নানা জিনিস প্যাক্ করিয়া জড়ো করা।

ছোট ঘরটি অগোছাল। শূন্য আলমারীর একটি ডালা খোলা, বাতাসে নড়িয়া উঠিতেছে। টেবিলের উপর কতকগুলি বই ও শাড়ী। পূর্ব্বের জানালায় সিল্কের শাড়ীর নীল পর্দ্দাটি খুলিয়া পড়িয়াছে। খোলা জানালা দিয়া আমগাছের চিকন পাতাগুলি দেখা যাইতেছে।

চেয়ার হইতে কতকগুলি খাতা, ছবি, সাবানের বাক্স সরাইয়া তক্তাপোষের উপর রাখিয়া, উমা অরুণকে কহিল, ব'স।

কণ্ঠে একটু হাসির সুর আনিয়া অরুণ বলিল, বা, বসব কি, তোমার এখন কিছুই গোছান হয় নি, কি হেল্‌প করব বলো।

উমা গম্ভীরভাবে বলিল, তোমায় কিছু হেল্‌প করতে হবে না, লক্ষ্মিটি, ব'স দেখি চুপ ক'রে।

তক্তাপোষের জিনিষগুলি একপাশে ঠেলিয়া দিয়া, বসিয়া, অরুণ বলিল, তা হ'লে তুমিও বস; সারাদিন যা খেটেছ।

উমা একটু বিরক্তির স্বরে বলিল, আচ্ছা, চেয়ারটা খালি করলুম কিসের জন্য!

অরুণ মিনতির সুরে বলিল, তুমি ব'স চেয়ারটায়।

উমা শ্রান্ত। অরুণের অনুরোধও সে আজ রাখিতে চায়। ধীরে সে চেয়ারে বসিল। ম্লান হাসিয়া বলিল, তারপর?

—তারপর আর কি, সেই চিরপুরাতন কাহিনী।

—কাহিনীটা কি?

—রাজকন্যা চল্লেন অচিন দেশে।

—সে দেশে যেতে ত কাহারও বারণ নেই।

—কিন্তু পক্ষীরাজ ঘোড়ার পা খোঁড়া হয়ে গেছে যে।

—ঠাট্টা রাখ। খ্রীষ্টমাসের সময় দিল্লীতে এস। খুব ঠাণ্ডা হবে বটে, কিন্তু ভাল লাগবে।

—আমদের পরীক্ষার কথাটা ভুলেই যাচ্ছ? এ দু-বছর যা পড়েছি জানই ত।

—পড়ে ত উল্টে যাচ্ছ, অত সাধতে পারি না।

—অাচ্ছা যাব। উঠো না, কোথায় যাচ্ছ? একটু ব'স।

—বসলে চলবে কেন, কত জিনিষ যে প্যাক্ করতে হবে, এমন tired লাগছে, আচ্ছা বসি।

—জিনিষ ত প্রায় সব বাঁধাই হয়ে গেছে। কেন তুমি এমন পালিয়ে বেড়াচ্ছ, এ কদিন তোমার একটুও দেখা পাইনি—

—তাতে কি আসে যায়।

অরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল।

—ব'স, দাঁড়িও না, তুমি জান না, আমি কি ক্লান্ত। তুমি জান না, আমার কি খারাপ লাগছে। মাকে এত ক'রে বল্লাম, আমি থাকি কলকাতায়, কলেজের বোর্ডিংএ বেশ থাকব, পড়ব, কিছুতেই রাজী হলেন না।

উমার ক্লান্ত করুণ মুখের দিকে চাহিয়া অরুণ চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

—বল কিছু, চুপ ক'রে বসে থেক না। ভাল লাগে না আমার।

—মেসোমশাইকে ফেলে বোডিংএ থাকা কি তোমার উচিত হবে।

—উচিত—উচিত—সারাক্ষণ উচিত, খালি কর্ত্তব্য ক'রে যাও—শুধু পরের প্রতি কর্ত্তব্য, আর আমার নিজের প্রতি বুঝি কর্ত্তব্য নেই—

—দিল্লীতেও ত তুমি পড়াশোনা করতে পারবে।

—পড়াশোনা করতে কে চায়, আমি ছেড়ে দেব পড়াশোনা।

—উমা, যাবার আগে এত মন খারাপ ক'রো না, তুমি জান—

—চুপ কর অরুণ, ভাল লাগে না আমার।

—তুমি একটু শোও, একটু বিশ্রাম কর, অথবা চল, গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবে, গাড়ীটা রয়েছে।

—আমি কোথাও যেতে চাই না, তুমি ব'স। শোন, সত্যিই আমি তোমাকে দেখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তোমার নিমন্ত্রণ ছিল, আর খাবার টেবিলে একবার গেলাম না। কেন জান, আমার কেমন কান্না পাচ্ছে। আমার ভয় হয়, হঠাৎ আমি হয়ত কেঁদে ফেলব। এটা আমার মনের অবসাদ জানি। কিন্তু সবার সামনে সত্যি যদি কেঁদে ফেলি, সবাই কি ভাববে বল ত। শোন, তোমার সঙ্গে হিসাব-নিকাশ ত করা হয় নি।

—কিসের হিসেব?

—না, তোমায় কি কি কিনতে দিয়েছিলাম, দাম ত দিই নি।

—ভারী ত জিনিষ।

—না, কত টাকা পাবে? হিসেব করেছ?

—হিসেব করি নি, আর এখন করতেও পারছি না।

—করেও বিশেষ লাভ হ'ত না, আমার হাতে কিছুই টাকা নেই

তুমি আরও সব কি জিনিষ এনেছ, এক গাদা বই, রোমাঁ রোলার জন্ ক্রিস্টোফার আমি আন্তে বলি নি।

—ওটা আমার উপহার।

—আর বাকী জিনিষের দামগুলি?

—ভয় নেই, তোমায় দিতে হবে না, Book of Friendshipএ ওটা জমা রইল।

—অর্থাৎ আমার নামে খরচ ত।

—এ বইতে জমা ও খরচের মধ্যে প্রভেদ নেই।

—বড় মজার হিসেবের খাতা ত। যাক্ একদিন ত হিসেব করতে হবে।

—আজ সে কথা নাই ভাবলে।

—যতদিন ক্রেডিট পাওয়া যায়, মন্দ কি!

বাহিরে সন্ধ্যার ম্লান আলো! আমগাছের পিছনে চাঁদ উঠিল। ক্রমান্ধকারময় গৃহে উমার রহস্যময়ী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া অরুণের চোখে জল ভরিয়া আসিল।

পূজার পূর্ব্বেই উমারা কলিকাতা ছাড়িয়া দিল্লী চলিয়া গেল। কেবলমাত্র উমার সহিত নয়, মামীমা, চন্দ্রা, অজয়, রায়-পরিবারের সকলের সহিত অরুণের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছিল যে তাহাদের ছাড়িয়া জীবন যাপন করা সে কল্পনা করিতে পারিত না। উমারা যত দিন চলিয়া যায় নাই, তাহাদের কলিকাতা-ত্যাগের কথা সে মনের এক কোণে ঠেলিয়া রাখিয়া দিত, ভাবিত, শেষ পর্য্যন্ত হয়ত যাওয়া হইবে না, হয়ত হেমবাবুর আবার অসুখ করিবে অথবা গবর্ণমেণ্ট হইতে হুকুম আসিবে, খ্রীষ্টমাসের পর কাজে যোগ দিতে হইবে।

উমারা সত্যই চলিয়া গেল।

কিন্তু তাহাদের বিরহকাতরতায় জীবন যতখানি শূন্য, পৃথিবী যতখানি অন্ধকার হইয়া উঠিবে ভাবিয়াছিল, তেমন কিছু হইল না। স্বীয় মানসিক অবস্থা দেখিয়া অরুণ বিস্মিত, একটু লজ্জিত হইল। আকাশ তেমনই নীল, সূর্য্যালোক তেমনই উজ্জ্বল, মানবজীবন তেমনই আনন্দময় রহিয়াছে।

অরুণ অনুভব করিল, তাহার হৃদয় যেন 'অত্যন্ত বেদনা-সহিষ্ণু, নির্ম্মম হইয়া গিয়াছে। নরম লোহা পুড়াইয়া পিটিয়া যেমন তীক্ষ্ণ সুদৃঢ় ইস্পাত তৈয়ারী হয়, তেমনই তাহার হৃদয়কে আঘাতের পর আঘাত দিয়া কে যেন কঠোর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এ কঠোরতা জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ, বিদ্বেষ নয়। সে জীবনকে আরও গভীরভাবে বুঝিতে, সত্যদৃষ্টিতে' দেখিতে চায়।

কখনও সে আনমনা হইয়া উমাদের বাড়ির পথে চলিয়া যায়, শূন্য বাড়ির দিকে চাহিয়া থাকে, বুকে একটা ব্যথা খচ্‌ করিয়া বাজে। কখনও বা বই পড়িতে পড়িতে বা পথে চলিতে চলিতে সে ভাবে উমা এখন কি করিতেছে, উমাও কি এখন তাহার কথা ভাবিতেছে। অন্তর উদাস হইয়া ওঠে।

এ বেদনা জ্বালাময় নয়, স্বপ্নমধুর।

এ বেদনায় সত্তার নবজন্ম হয়। বাস্তববাদী বিশ্লেষণ-কুশল নাস্তিক তার্কিক অরুণকে পিছনের অন্ধকারে ঠেলিয়া দিয়া নিত্যকালের কল্প-লোকবাসী কবি অরুণ অগ্রসর হইয়া আসিল। উমা তাহার হৃদয়ে বেদনা দিয়াছে। উমা তাহার জীবনের কল্যাণী শক্তি।

বেদনার অপূর্ব্ব রহস্যকে অরুণ অনুভব করিল। অশ্রুঘন দুঃখের রহস্যালোকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। পৃথিবীর সকল দুঃখীর সহিত সমবেদনায় অন্তর ভরিয়া উঠিল। এক বৎসর পূর্ব্বে অরুণ দেহ-মনে নবজাগ্রত যৌবনের যে সহজ উল্লাস অনুভব করিত সে নিছক আনন্দময় অনুভূতি আর হয় না, শরতের জ্যোৎস্নাশুভ্র রাত্রে যৌবনের মত্ততা লাগে বটে, সে মত্ততা বসন্তের রক্তিম উচ্ছ্বাস নয়, হেমন্তের অশ্রুঘন কুজ্ঝটিকাময়।

তাহার দ্বৈত-জীবন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রতিদিনের-জানা কলেজে-পড়া সহজ অরুণ ইউরোপের ইতিহাস, শেক্সপীয়ারের ম্যাক্‌বেথ মুখস্থ করে, প্রতিমাকে লইয়া বেড়াইতে যায়, বাণেশ্বরের সহিত তর্ক করে, জয়ন্তকে সাংসারিক পরামর্শ দেয়, বন্ধুদের লইয়া দল বাঁধিয়া পিক্‌নিক্‌ করিতে বাহির হয়। সহসা এক অজানা অরুণ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। পূর্ব্বে সে ছিল প্রেমিক, কবি, উদাসী, ভাববিলাসী। এখন সে ভাবে, আমি দুঃখের সাধক। জীবনে দুঃখের অর্থ, সার্থকতা কে

বলিতে পারে? বন্ধুরা দেখে, হঠাৎ অরুণ অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে। তাহার প্রফুল্ল সুন্দর মুখ ব্যথিত করুণ।

অরুণের মস্তিষ্কে বিভিন্ন নদীস্রোতের মত দুইটি ধারা প্রবাহিত হইয়া চলে। প্রতিদিনের সহজ স্বাভাবিক অনুভূতিগুলির পাশ দিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়া প্রেমবিহ্বল সত্যানুসন্ধিৎসু আত্মার চিন্তাধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায়। চিন্তাস্রোতের ঘূর্ণাবর্তে সে মাঝে মাঝে দিশাহারা হইয়া ওঠে।

কেন এ জীবন? কেন এ সংগ্রাম? কেন এত দুঃখ?

চলিতে চলিতে সে পথের কোন মোড়ে থামিয়া যায়। ট্রাম, মোটর গাড়ী, গরুরগাড়ী, জনস্রোত, এই জীবনধারা তাহার নিকট ভোজবাজীর মত অলীক মনে হয়। যেন ইহার পিছনে আর একটা জীবন প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। সেই অদৃশ্য বিকাশমান প্রাণশক্তিকে সে দেখিতে চায়। যখন সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিত তখন জীবনের অর্থ সহজেই খুঁজিয়া পাইত। মায়ের হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে ভিড়ে মাকে হারাইয়া ফেলিলে, অজানা পথে শিশু যেমন অসহায় ভাবে দিশাহারা ঘুরিয়া কাঁদিয়া বেড়ায় তেমনি অরুণের পথহারা আত্মা কাঁদিয়া ওঠে। অন্ধকার অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করে, বোবা আকাশ কোন উত্তর দেয় না।

আকাশ হইতে উত্তর পায় না বটে, কিন্তু নীলিমার অপরূপ লাবণ্যে অন্তর স্নিগ্ধ হয়। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যরূপ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া যায়। প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম ছিল বলিয়া অরুণ বাঁচিয়া গেল, নহিলে হয়ত সে পাগল হইয়া যাইত।

শুধু প্রকৃতির রূপদর্শন নয়, প্রকৃতির স্পর্শ অনুভব করা চাই। বৃষ্টির দিনে সে ভিজিতে ভিজিতে পথে চলে; প্রখর রৌদ্রে হাঁটিয়া কলিকাতা

হইতে বাহির হইয়া মুক্ত ধান্যক্ষেত্রের পার্শ্বে গিয়া বসে। জ্যোৎস্নারাত্রে ছাদের উপর অনাবৃত দেহে শুইয়া থাকে। প্রকৃতি তাহার অতি নিকট অতি প্রিয় হইয়া উঠিল।

শীতের রাত্রি কুহেলিকাময়। চাঁদের আলো কুজ্ঝটিকার মধ্যে মিশিয়া গিয়া চারিদিকে অস্পষ্টতা, আবছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। স্তব্ধ, সুশীতল, মায়াময় রাত্রি।

ডিনারের সময় অত্যধিক মদ্যপানের ফলে শিবপ্রসাদ অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন। মধ্যরাত্রে অত্যন্ত জলপিপাসায় ঘুম ভাঙিয়া গেল। এক গেলাস ঠাণ্ডা জল তাড়াতাড়ি পান করিয়া তিনি ঘরের সম্মুখের বারান্দায় বাহির হইলেন। শীত করিতে লাগিল। কিন্তু ড্রেসিং-গাউনটা খুঁজিয়া পরিবার উৎসাহ নাই।

কুজ্ঝটিকাআচ্ছন্ন নিশীথিনী অবগুণ্ঠিতা নারীর মত। আইয়োনিক থামগুলি রাত্রির শুভ্রতায় মিশিয়া গিয়াছে। বারান্দার ইজিচেয়ারে শিবপ্রসাদ শুইয়া পড়িলেন।

চোখে স্বপ্ন ঘনাইয়া আসিল। অতীত জীবনের সুমধুর স্মৃতি স্বপ্নরূপে আসিল।

শিবপ্রসাদের মনে হইল, এ রাত্রি সুইজারল্যাণ্ডের তুষারশুভ্র শীতের রাত্রি। পান্সিয়ঁর বারান্দায়-সেজলঙে তিনি শুইয়া আছেন। পৃথিবীভরা শুভ্র তুষার-বন্যার উপর স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালার মত নীলাকাশ হইতে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছে। তুষারসমাচ্ছন্ন নিদ্রিত পাহাড় বন মাঠ গ্রামের উপর জ্যোৎস্নার অপরূপ লাবণ্য। এ স্বপ্নপুরী!

আচ্ছা ষ্টেলা কোথায় গেল! ষ্টেলা!

শিবপ্রসাদ চেঁচাইয়া ডাকিলেন—ষ্টেলা ডিয়ার!

নিশীথিনী যেন শিহরিয়া উঠিল, মৃদু বাতাসে গাছের পাতাগুলি কাঁপিয়া চাঁদের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল। শিবপ্রসাদ দেখিতে লাগিলেন, কি সুন্দর বরফ পড়িতেছে, সাদা ফুলের পাপড়ির ঝর্ণাধারার মত, পেঁজা তুলার মত ধীরে ধীরে বরফ পড়িতেছে। যেন কোন গোপনচারী নিঃশব্দচরণে আসিতেছে, আসিতেছে। শুভ্রবসনা সুন্দরীর স্বপ্নশীতল অঞ্চল গীর্জ্জার তোরণে, সালে-গুলির ত্রিকোণ-ছাদে, ঢেউ-খেলান মাঠের উপর, প্যাইনবনের মাথায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।

আচ্ছা, হৈলা গেল কোথায়? হৈলা!

বিবাহের পর শিবপ্রসাদ হৈলাকে লইয়া সুইজারল্যাণ্ডে শীতকাল কাটাইয়াছিলেন।

হৈলা কি এত রাত্রে স্কি করিতে গেল?

হৈলা!

শিবপ্রসাদ দেখিলেন, মোটা থামের আড়াল হইতে হৈলা বাহির হইয়া আসিল, ঘনকৃষ্ণ ফার্-ওভারকোটে দেহ আবৃত, প্রস্ফুটিত, রক্ত-গোলাপের মত মুখখানি।

হৈলা বলিল, চল, স্লেজ যে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘোড়ার গলার ঘণ্টার মৃদুধ্বনি দূর হইতে ভাসিয়া আসিল।

হৈলা তাঁহার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চল।

শিবপ্রসাদ শিহরিয়া উঠিলেন। ইজিচেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পা যেন অবশ! আবার বসিয়া পড়িলেন। হৈলা তাঁহার পাশে বসিল।

দুই জনে স্লেজে করিয়া পাশাপাশি চলিয়াছেন। শুভ্র স্বপ্নভরা পথ। তুষারাবৃত ঘুমন্ত গ্রাম ছাড়াইয়া স্লেজ নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। কখনও পাইনবনের রহস্যঘন স্তব্ধতা, কখনও তুষারাবৃত মুক্ত প্রান্তরের শুভ্র অনির্ব্বচনীয়তা, কখনও নিদ্রিত গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ। স্লেজ

ছুটিয়া চলিয়াছে। পাইনগাছের পাতাগুলি হইতে বরফ ঝরিয়া পড়িতেছে।

মাইলের পর মাইল স্তব্ধ শুভ্র পথ। কোথায় পথ কিছুই বোঝা যায় না। হেলা চুপ করিয়া শিবপ্রসাদের পাশে বসিয়া।

সম্মুখে এক বৃহৎ খাদ। চতুর্দিকে অকলুষ শ্বেতবর্ণের অসীম বিস্তারের মধ্যে ঘনকালো গভীর খাদ অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে।

স্লেজ্ গাড়ী ওই খাদের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ কি! খাদের প্রায় কিনারায় আসিয়া পৌছিল। এবার যে খাদের অন্ধকার গর্তে অতলে ডুবিয়া যাইবে। ঘোড়াগুলি উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। এই অনন্ত শুভ্রতার মধ্যে কালো খাদ বুঝি তাহাদের মোহিনীর মত মন ভুলাইয়াছে। খাদের উপর ঘোড়া দুইটি লাফাইয়া পড়িল।

হেলা!

শিবপ্রসাদ আর্তনাদ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন, তারপর ইজিচেয়ারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙিল না।

ভোর রাতে অরুণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বড় শীত করিতে লাগিল। জানালার দিকে চাহিয়া দেখিল, চারিদিক স্বপ্নময় অবাস্তব। বড় সুন্দর কুজ্ঝটিকা। কলিকাতায় এরূপ কুয়াশা বড় হয় না।

বিছানা হইতে উঠিয়া সে জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কুয়াশায় গাছগুলি কি সুন্দর আবছায়া দেখাইতেছে। ইংলণ্ডের শীতের প্রভাতের মত হইবে।

সে বারান্দায় বাহির হইল। বাগানের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল।

এ কি! কাকা বারান্দায় ইজিচেয়ারে ঘুমাইতেছেন! নিদ্রিত মুখখানি কি শান্ত। হয়ত অত্যধিক মদ্যপানে রাত্রে অত্যন্ত গরম বোধ

হইয়াছে। একটি কম্বল আনিয়া অরুণ শিবপ্রসাদের দেহের উপর বিছাইয়া দিল। বাগানের গাছগুলির দিকে চাহিয়া রহিল। শীত করিতে লাগিল। বিছানাতে গিয়া শুইয়া পড়িল।

কুয়াশা তখনও সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই।

প্রতিমা ঘরে ছুটিয়া আসিল উন্মাদিনীর মত।

—দাদা! দাদা!

অরুণ জাগিয়া চমকিয়া চাহিল।

—দাদা! সর্ব্বনাশ হয়েছে আমাদের!

অরুণ লাফাইয়া উঠিল।

—কি হয়েছে, কি পাগলের মত বকছিস—কি সুন্দর কুয়াশা হয়েছিল—

—দাদা! কাকা! কাকা!—

প্রতিমা আর বলিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল।

অরুণ শিবপ্রসাদের ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

বৃহৎ খাটের ওপর শিবপ্রসাদের মৃতদেহ। মাথার নিকট ডাক্তার বসু ও পায়ের নিকট চকু খানসামা দাঁড়াইয়া মূক পুত্তলীর মত।

অরুণকে দেখিয়া ডাক্তার বসু হাতের ষ্টেথিস্‌কোপটা পকেটে রাখিলেন, চাপা গলায় বলিলেন—হার্ট ফেলিওর!

উদ্‌ভ্রান্তের মত অরুণ একবার ডাক্তার বসুর মুখের দিকে, একবার শিবপ্রসাদের দীর্ঘ স্থির দেহের দিকে চাহিল। ঘরেতে যেন তার দম আটকাইয়া আসিল। নিমেষের মধ্যে সে বুঝিল, তাহার কাকা আর নাই।

ছুটিয়া সে বারান্দায় গেল। ভোররাত্রে যে ইজিচেয়ারে সে কাকাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছে, সে চেয়ার শূন্য। সত্যই, তবে কাকা নাই।

বিমূঢ়ের মত সে কাকার ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িল। প্রতিমার ক্রন্দনধ্বনি, ঠাকুমার মর্মভেদী আর্তনাদ তাহার কানে আসিল। কিন্তু, আশ্চর্য, তাহার চোখে জল আসিল না; রাত্রিজাগরণের পর যেমন চোখ জ্বালা করে, সেইরূপ তাহার দুই চোখ জ্বলিতেছে।

সেখানে রহিল, সে কাকার ইজিচেয়ারে বসিয়া। একবার দাঁড়াইয়া উঠিল, আবার বসিয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্তে সে যেন কত বড় হইয়া গিয়াছে। এই পরিবারে কাকার স্থান তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

সূর্যের আলো শাণিত খড়্গের মত কুয়াশাকে খান্ খান্ করিয়া কাটিতেছে। প্রভাতের আলোর দিকে চাহিয়া এবার তাহার চোখে জল আসিল।

শিবপ্রসাদের মৃতদেহ দাহ করিয়া অরুণ যখন বাড়ি ফিরিল, তখন শীতসন্ধ্যার ধূম্রঘন অন্ধকার কলিকাতার পথে ঘনাইয়া আসিয়াছে। ঘোষ-বংশের বৃহৎ প্রাচীন বাড়িটি অরুণের চোখে বড় পুরাতন, ভগ্ন, মলিন মনে হইল!

ম্লানালোকিত স্তব্ধ বাড়িতে অরুণ নিঃশব্দে প্রবেশ করিল।

প্রতিমা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ছুটিয়া আসিল,—দাদা!

এতক্ষণ সে বারান্দার কোণে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল।

প্রতিমার ম্লানমুখের দিকে চাহিয়া অরুণ বলিল, খেয়েছিস কিছু, টুলি?

—হ্যাঁ দাদা, আমি খেয়েছি, তুমি চল ওপরে—

প্রতিমা আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অরুণের নগ্নপদ, শ্বেতবস্ত্র, উত্তরীয় দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল—দাদা! তাহার আর্তনাদ বৃহৎ অন্ধকার প্রাঙ্গণে মুখর হইয়া উঠিল।

অরুণ প্রতিমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

—কাঁদিস্ নে টুলি, তুই কাঁদিস্ নে—তাহ'লে—

অরুণের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। দুইজনে নীরবে হাত ধরাধরি করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল।

তাহারা পর্ব্বতের আড়ালে ছিল, সে পর্ব্বতের আশ্রয় ভাঙিয়া গিয়াছে, সংসারের ঝড়ের মধ্যে স্নেহের বোনটিকে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

শিবপ্রসাদের শূন্য ঘরে প্রদীপ জ্বালাইয়া আসিয়া, ঠাকুমা বলিলেন—অরুণ এলি বাবা!

ঠাকুমার চোখে জল নাই, কৃশ মুখ দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। অরুণের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া মনে পড়িল, তাঁহার প্রথম পুত্রের মৃত্যুর কথা। সেও যেন বেশী দিন নয়। বৎসরগুলি কি শীঘ্র কাটিয়া গিয়াছে। বুকটা অসহনীয় বেদনায় মোচড় দিয়া উঠিল। ঠোঁট দুইটি কাঁপিতে লাগিল। কান্নার বেগ দমন করিয়া ঠাকুমা যেন একটু তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, আর দেরি করিস নে, খাবি আয়! টুলিও তোর জন্যে ভাল ক'রে কিছু খায় নি।

অশৌচের দিনগুলি একটির পর একটি কাটিয়া যাইতে লাগিল। সকলে ভাবিয়াছিল অরুণ বুঝি ভাঙিয়া পড়িবে, তাহার যেরূপ ভাবপ্রবণ স্বভাব।

কোথা হইতে যে অরুণের মনে দৃঢ় শক্তি আসিল অরুণ তাহা দেখিয়া নিজেই অবাক হইয়া গেল। এই ভাববিলাসী কল্পলোকবাসীর মধ্যে যে এমন শোকসহিষ্ণু দৃঢ়চেতা শান্ত মানুষটি লুকাইয়াছিল, তাহা কেহ ভাবিতে পারে নাই।

কাকাকে অরুণ গভীরভাবে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। তাছাড়া গত দুই বৎসরে সাহিত্য, শিল্প, অক্সফোর্ডের জীবন, ইউরোপের সভ্যতা নানা সমস্যা আলোচনা, গল্পের মধ্যে কাকার সহিত তাহার মানসিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। বন্ধুরা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়া দেখিল, অরুণ যে কোন গভীর শোক পাইয়াছে, কথায় ব্যবহারে তাহার কোন চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে সে উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসিয়া ওঠে, নানা

রসিকতা করে, অশৌচ অবস্থার পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কেহ ভাবিল, অরুণ হৃদয়হীন। কেহ বলিল, এটা তার পোজ্। প্রতিমাও অবাক হইয়া যাইত। সে বুঝিত, এ তাহার সরল স্বাভাবিক দাদা নয়। ভীতিকরুণ নয়নে সে অরুণের দিকে চাহিয়া বলিত, দাদা, অত প'ড়ো না।

—ঠিক বলেছিস্, কি হবে এত পড়ে, পাস হয়ে যাব কোন রকমে, তুই একটা গান গা' ত।

অরুণ প্রতিমাকে কোন হাল্কা সুরের' হাল্কা গান গাহিতে বলিত। মৃত্যুশোকপীড়িত বাড়িতে সে ধরণের গান গাওয়া সামাজিকপ্রথাবিরুদ্ধ। প্রতিমা গুন-গুন করিয়া গাহিত, চেঁচাইয়া গাহিতে সাহস হইত না। অরুণকে দেখিয়া তাহার কেমন ভয় করিত। ভাবিত, দাদার কাঁদা দরকার; তাহার মত দাদা যদি মাঝে মাঝে কাঁদে! মাঝে মাঝে সে দাদার সম্মুখে কাঁদিয়া ফেলিত। প্রথম প্রথম অরুণ তাহাকে কাঁদিতে দেখিলে আদর করিত, বলিত, কাঁদিস্‌নে টুলি; কিন্তু এখন একবার প্রতিমার দিকে করুণভাবে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়। প্রতিমা এখন লুকাইয়া কাঁদে।

নিজ সত্তার এ পরিবর্ত্তন অরুণ অনুভব করিত; তাহার হৃদয় যেন বরফের মত জমিয়া গিয়াছে, বুকটা বেশ ঠাণ্ডা লাগে, এই ত শান্তি। অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে চিকিৎসক যেমন রোগীকে ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা সংজ্ঞাহীন করিয়া দেন, তেমনই কে যেন তাহার হৃদয়কে অসাড় করিয়া দিয়াছে। কোন শোক, কোন বেদনা তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। শুধু হৃদয় নয়, তাহার মস্তিষ্কের রক্ত-চলাচলও ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। বি-এ পরীক্ষা সন্নিকট। অরুণ পাঠ্যপুস্তকগুলি পাশে লইয়া ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া বারান্দায় বসিয়া থাকে,

পুস্তকগুলি পড়িতে চেষ্টা করে, কিন্তু মাথায় কিছু যেন ঢুকিতে চায় না। পাঠ বার বার ভুলিয়া যায়।

কেবলমাত্র হৃদয়ের অসাড়তা নয়, গভীর আলস্য! কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি ব্যতীত অরুণ আর কিছু করিতে চাহে না। কিন্তু কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি অতি নিষ্ঠার সহিত করে।

উমা দুইখানি চিঠি দিয়াছে, উত্তর দিতে হইবে। চিঠি লিখিতে কুঁড়েমি লাগে। বস্তুতঃ কিছু লিখিতে ভাল লাগে না। কিন্তু বন্ধুরা আসিলে অনর্গল বাজে কথা কহিতে তাহার অত্যন্ত উৎসাহ। কলিকাতার নানা মুখরোচক সংবাদগুলি তাহার প্রতিদিন শোনা চাই। সে অবিশ্রান্ত কথা কহিয়া যায়, তাহার শ্রান্তি নাই।

বন্ধুরা বোঝে, এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় অরুণ কথা কহিয়া যাইতেছে, ইহাতে অরুণের শান্তি নাই। কিন্তু একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে তাহার ভাল লাগে না, সে কিছু ভাবিতে চাহে না। বন্ধুরা যখন না থাকে, তখন সে প্রতিমাকে, ঠাকুরমাকে বা সরকারমশাইকে বা মোটর চালককে ডাকিয়া গল্প করিতে বসে।

কিন্তু এত গল্প করিয়াও তাহার মন হাল্কা হয় না। কারণ মন খুলিয়া সে কাহারও সঙ্গে কথা বলে না।

অরুণ ভাবে, যদি মামীমা কলিকাতায় থাকিতেন! মামীমা থাকিলে, এত লোক ডাকিয়া এত বাজে কথা কহিতে হইত না। এই বুদ্ধিমতী পরমস্নেহশীলা নারীর নিকট সে চিরদিনই জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনার কথা বলিয়াছে; কত তর্ক করিয়াছে, আলোচনা করিয়াছে, মনে দুর্ব্বলতা আসিলে শক্তি পাইয়াছে। আজ এ দুঃখের দিনে তিনি দূরে। দিদির সঙ্গে অনেক কথা হয় বটে, কিন্তু দিদি তাহার মন ঠিক বুঝিতে পারেন না।

রাত্রে খাওয়ার পর দক্ষিণের বড় বারান্দায় বসিয়া অরুণ উমাকে চিঠি লিখিতে বসিল। 'উমা', কথাটি লিখিয়া সে উমার অনুপম সুন্দর মুখ কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল। কল্পনার চক্ষে সেমুখ ভাসিয়া উঠিল না। অতি অস্পষ্ট আবছায়া, যেন কোন স্বপ্নে-দেখা ভুলিয়া-যাওয়া মুখ। উমার মুখ সে ভুলিয়া গিয়াছে!

অরুণ একটি সিগারেট ধরাইল। এখন সে ভয়ঙ্কর সিগারেট খায়।

চিঠির কাগজটি সে ছিঁড়িয়া ফেলিল। বারান্দায় খানিকক্ষণ পায়চারি করিল। অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটি ফেলিয়া আর একটি নূতন সিগারেট ধরাইল।

মাঘ মাসের শেষে বসন্তের মৃদু বাতাস বহিতেছে। নারিকেল বৃক্ষগুলির আড়ালে চতুর্দ্দশীর চন্দ্র।

হয়ত সে আর উমাকে ভালবাসে না। হয়ত তাহাদের প্রেম প্রথম যৌবনের রঙীন স্বপ্ন, যৌবনের অলীক স্বপ্ন, সে স্বপ্ন বুঝি টুটিয়া গিয়াছে।

শ্রান্ত হইয়া অরুণ চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সে ভাবিতে চায় না। কলেজের কোন পাঠ্যপুস্তক আনিয়া পড়িবে স্থির করিল। কিন্তু ঘরে গিয়া বই খুঁজিয়া আনিবার শক্তিও বুঝি তাহার নাই।

আর একটি সিগারেট ধরাইল। আর একটি চিঠির কাগজ লইয়া সে মামীমাকে চিঠি লিখিতে বসিল।

লিখিতে লিখিতে অরুণ ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। প্রস্ফুটিত জুঁইফুলের মত শুভ্র স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারায় বারান্দা ভরিয়া গিয়াছে। লিখিবার টেবিলে চেয়ারে, চোখে মুখে চন্দ্রালোকের বন্যা। স্তব্ধ নিশীথিনী তরুমর্ম্মরে শিহরিয়া উঠিতেছে; স্বচ্ছ নীল স্ফটিকের মত নীলাকাশে কয়েকটি লঘু শুভ্রমেঘ...

তাহাদের মধ্যে চন্দ্র স্বপ্নতরীর মত ভাসিয়া চলিয়াছে। জোয়ারের পদ্মার মত জ্যোৎস্না চারিদিকে থম্‌থম্‌ করিতেছে।

অরুণ শিহরিয়া জাগিয়া উঠিল। শুভ্র চন্দ্রের দিকে সে চাহিতে পারিল না। চাঁদের আলো গাছের সরু লম্বা কচি পাতাগুলিতে চিকিমিকি করিতেছে ; গাছের পাতাগুলির দিকে সে মুগ্ধনয়নে চাহিল।

বুকে একটা ব্যথা খচ্‌ করিয়া বাজে। দেহের রক্তচলাচল আর মৃদু স্তিমিত নয়, বড় দ্রুত।

জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া অরুণের কান্না আসিল। ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল, মায়ের কোলে মুখ গুঁজিয়া ছোট শিশু যেমন করিয়া কাঁদে।

অরুণ বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। বরফের মত জমাট হৃদয় এবার গলিয়া আসিল।

অশ্রুসিক্ত নয়নের সম্মুখে উমার মুখ সহসা ভাসিয়া উঠিল।

তাহার হৃদয় বড় হাল্কা বোধ হইল। ইচ্ছা করিল গান গাহিয়া ওঠে। অথবা চীৎকার করিয়া সবাইকে জাগাইয়া তোলে, বলে, দেখ, দেখ, এ কি সুন্দরী রাত্রি, এ কি লাবণ্যে পরিপূর্ণ বিশ্বসংসার।

বহুক্ষণ সে বারান্দায় পায়চারি করিল, তার পর জ্যোৎস্নার আলোয় ইজিচেয়ার টানিয়া শুইয়া পড়িল।

বহুদিন পরে অরুণ শান্তিতে ঘুমাইল।

৩৯

শ্রাদ্ধ নির্ব্বিঘ্নে চুকিয়া গেল। অরুণের ইচ্ছা ছিল বেশ জাঁকজমকের সহিত শ্রাদ্ধ করে। ঠাকুমা তাহা করিতে দিলেন না। সরকারমশাই জানাইলেন তহবিল অধিক নাই।

অর্থ সম্বন্ধে অরুণকে কোনদিন ভাবিতে হয় নাই। যখন যা টাকার দরকার হইয়াছে, সরকার-মহাশয়ের নিকট চাহিলেই পাইয়াছে। শিবপ্রসাদের খরচে হাত ছিল, অরুণকে অর্থ দিবার সম্বন্ধে তিনি কখনও কৃপণতা করেন নাই।

অর্থের যে অনটন হইতে পারে, খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা দরকার হইতে পারে, এ-সব কথা অরুণ কোনদিন ভাবে নাই। ব্যারিষ্টার মিষ্টার এ-সি-সেনের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাহার নূতন সাংসারিক অভিজ্ঞতা হইল।

মিষ্টার সেন শিবপ্রসাদের সহপাঠি ও বন্ধু। তাঁহারা এক সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়াছেন, এক সঙ্গে লিন্‌কন্‌স্ ইন্‌সে ডিনার খাইয়াছেন। হাইকোর্টে তাঁহার খুব ভাল প্র্যাক্‌টিস্।

শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, মিষ্টার সেন অরুণকে চিঠি লিখিলেন তাঁহার সহিত দেখা করিতে। কারণ তিনি শিবপ্রসাদের উইলের এগ্‌জি-কিউটর।

বালীগঞ্জের নানা অজানা গলি ঘুরিয়া অরুণ যখন মিষ্টার সেনের বাড়ি আসিয়া পৌছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দরোয়ান তাহাকে এক বৃহৎ ঘরে বসাইল। মোটা মোটা ল' রিপোর্টস্ ও আইনের

পুস্তকপূর্ণ সিলিং-উঁচু আলমারির সারিতে ঘরটি ভরা, কোথাও একটু দেওয়াল দেখা যায় না। অরুণ অবাক হইয়া চাহিল, পৃথিবীতে এত আইনের পুস্তক আছে! আইনকে যতদূর সম্ভব জটিল করিয়া তুলিবার আশ্চর্য্যকর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে একটি মুসলমান বেহারা অরুণকে আর একটি ঘরে লইয়া গেল। সে ঘরটিও লাল নীল নানা বর্ণের চামড়া-বাঁধানো মোটা মোটা পুস্তকে পূর্ণ। মধ্যে একটি বড় টেবিল। তাহার একদিকে রিভলভিং চেয়ারে মিষ্টার সেন বসিয়া আছেন, ঘরে প্রবেশ করিয়া অরুণ তাঁহাকে দেখিতেই পায় নাই।

—ঘোষ, তুমি আধঘণ্টা লেট।

গম্ভীর শব্দে একটু চমকিয়া অরুণ মিষ্টার সেনকে দেখিতে পাইল। শ্যামবর্ণ, দাড়ি-গোঁফ-কামানো মুখে যেমন বুদ্ধির দীপ্তি তেমনি ঔদ্ধত্য ও কর্ত্তৃত্বের ভাব; খাঁড়ার মত উঁচু নাকে মোটা কাঁচকড়ার চশমা। চওড়া কপাল চক্ চক্ করিতেছে।

অরুণ নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেল। লজ্জিত হইয়া বলিল, বাড়িটা খুঁজতে দেরি হয়ে গেল।

মিষ্টার সেন দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বসিয়া থাকিলে তাঁহাকে যত লম্বা মনে হইতেছিল, দাঁড়াইলে তত লম্বা মনে হয় না।

হ্যাণ্ড-শেক্ করিবার জন্য মিষ্টার সেন হাত বাড়াইয়া দিলেন। অরুণ যন্ত্রচালিতের মত তাঁহার হাত ধরিল। ঠাণ্ডা হাত কিন্তু নরম।

—ব'স, ওই চেয়ারে।

দুই জনে মুখোমুখি বসিলে, মিষ্টার সেন বলিলেন, শিবু আমার বিশেষ বন্ধু ছিল, তার মৃত্যুতে আমি সত্যিই বড় দুঃখিত হয়েছি। শ্রাদ্ধে

যেতে পারিনি ব'লে আমায় ক্ষমা করবে, সেদিন একটা বড় কেসের কন্‌সাল্‌টেশ্যন্‌ পড়ে গেল।

—আপনার কথা আমি কাকার মুখে শুনেছি।

—কাজের কথাগুলি বলে নি। আমি তোমাকে বেশী সময় দিতে পারব না। তোমার কাকা তোমাদের বাড়িটা মর্টগেজ দিয়ে গেছেন, জান বোধ হয়।

অরুণ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, মর্টগেজ? মর্টগেজ মানে কি? আমাদের বাড়ি মর্টগেজ?

সে ধীরে বলিল—মর্টগেজ? না, আমরা কিছুই জানি না।

—মর্টগেজ মানে বোঝ নিশ্চয়।

—মর্টগেজ। হ্যাঁ, তবে আইনে যদি বিশেষ কোন অর্থ থাকে—

মিষ্টার্ সেন ডানদিকের পুস্তকের র‍্যাক হইতে একটি মোটা বই টানিয়া লইলেন। সেটা না খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, তুমি কি পড়?

—এ বৎসর বি-এ পরীক্ষা দেব।

—ও, ল পড় না। আচ্ছা, বন্ধক বোঝ ত, লোকে সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করে।

ঠিক না বুঝিতে পারিলেও অরুণ বলিল, হ্যাঁ।

—বেশ। তোমার কাকা তোমাদের বাড়ি বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করেছেন, এক মাড়োয়ারীর কাছ থেকে।

—আমাদের বাড়ি? সমস্ত বাড়ি!

—না, সমস্ত বাড়ি নয়, বাড়ীতে তাঁর অংশ বন্ধক দিয়েছেন; তোমার অংশ ঠিক আছে।

—এখন আমাদের কি করতে হবে?

—মাড়োয়ারী এবার টাকার তাগাদা করবে, বোধ হয় নালিশও করবে। তাছাড়া তোমার কাকার অনেক দেনা আছে।

—সে দেনা আমরা শোধ করব।

—আইনতঃ সব দেনা তোমাদের শুধতে হবে না।

—না, কাকা যদি কারুর কাছে ঋণ ক'রে গিয়ে থাকেন, সে টাকা আমাদের শোধ দেওয়া উচিত।

—আচ্ছা কি উচিত, সে আলোচনা পরে, হবে, আমি এখন তোমাকে তোমাদের বিষয়-সম্পত্তির অবস্থা সম্বন্ধে জানাতে চাই। তুমি বোধ হয় কিছুই জান না।

—না আমি কিছুই জানি না।

—আজ দেরি করে এলে, আচ্ছা, আসছে রবিবার বিকেলে ঠিক সাড়ে চারটার সময় এস, আমার সঙ্গে চা খাবে, আমার স্ত্রীও তোমার সম্বন্ধে ইণ্টারেষ্টেড, তাঁর সঙ্গেও আলাপ হবে। দেরি ক'রো না।

—না, দেরি হবে না। কিন্তু বাড়ি কি আমাদের বেচতে হবে?

—না, সমস্ত বাড়ি বোধ হয় বেচতে হবে না, তবে খানিকটা বেচতে হবে। তোমাদের ক্যাস টাকা কত আছে জান?

—আমি জানি না।

—আমার ধারণা, খুব বেশী নেই। বাড়ির পাশের খানিকটা জমি বেচলে বোধ হয় হবে। আচ্ছা, আজ গুড-নাইট্।

মিষ্টার সেনের সহিত হ্যাণ্ড-শেক্ করিয়া আইন পুস্তক-ভরা ঘরগুলি পার হইয়া অরুণ যখন পথে আসিয়া পড়িল, তাহার মাথা টলিতে লাগিল।

তাহাদের এই প্রাচীন পিতৃপুরুষের প্রিয় বাড়ি বেচিতে হইবে? কাকা এ কি কাণ্ড করিয়া গিয়াছেন?

যদি বেচিতে হয়, ঠাকুমা তাহা হইলে বাঁচিবেন না। সরকার-মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হবে। ঠাকুমা বা টুলিকে এখন কোন কথা বলা হইবে না। আগামী রবিবার শীঘ্র আসিতে হইবে। মিষ্টার সেনকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে, বাড়ি বেচা হইবে না। তিনি এত বড় ব্যারিষ্টার, নিশ্চয় কোন উপায় করিয়া দিবেন।

নানা বৈষয়িক ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অরুণ চলিল।

একবার সে চমকিয়া চাহিল,—তিন বৎসর পূর্ব্বে সোনার স্বপ্ন-প্রাসাদ খুঁজিতে বোধ হয় সে এই পথগুলিতেই ঘুরিয়াছে। সে "স্বপ্ন-প্রাসাদ" সে কি কোনদিন খুঁজিয়া পাইবে না?

৪০

বি-এ পরীক্ষা হইয়া গেল। অরুণের পরীক্ষা ভালই হইল। পরীক্ষার পূর্ব্বের মাস সে ভয়ঙ্কর পড়িয়াছে। ভাল করিয়া পরীক্ষায় পাসের জন্য নয়, সংসারের নানা চিন্তা এড়াইবার জন্য, দুঃখ ভুলিয়া থাকিবার জন্য, পাঠ্য পুস্তক ছিল তাহার আশ্রয়।

পরীক্ষার পর অরুণের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিল। নানা চিন্তা মাথায় ভিড় করিয়া আসে। সব সময়ে কেমন ভয় করে। স্বাস্থ্যও ভাঙিয়া গিয়াছে। ফার্ষ্ট ইয়ারে তাহার যেরূপ ন্যারভার্স ব্রেকডাউন্ হইয়াছিল, বর্ত্তমান দেহ-মনের এ ভাঙন তাহার চেয়ে গুরুতর। তখন অনন্ত নীল সমুদ্রের সঙ্গলাভ করিয়া সে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। আর ছিল মল্লিকা মল্লিক।

মল্লিকা! সে এখন কোথায়, কত বড় হইয়াছে, কে জানে, হয়ত তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ওইরূপ একটি প্রাণের খুশীভরা হাস্যকৌতুকময়ীর সঙ্গ পাইলে বাঁচিয়া থাকার উদ্দাম উল্লাসে আবার মাতিয়া উঠিতে পারে।

মামীমা সিমলা হইতে লিখিলেন, অরুণ তোমার চিঠি প'ড়ে মন বড়ই খারাপ হ'ল, তুমি ভয়ানক 'ব্রুড' করছ, তার পর পরীক্ষার খাটুনিতে তোমার শরীর খারাপ হয়েছে। তুমি কিছু দিনের জন্য সিমলায় এস, উমাকেও নিয়ে আসবে। তোমার একটা চেঞ্জ বিশেষ দরকার।

চন্দ্রা লিখিল, অরুণদা, সিমলা কি চমৎকার জায়গা! তুমি শীগ্‌গীর এস, উমাদিকে আনতে ভুল না। দাদার খুব ইচ্ছে। তুমি না এলে সত্যি ভয়ঙ্কর রাগ করব, আর এলে যে কি ভয়ঙ্কর খুশী হব, তা তোমায় জানাতে পাচ্ছি না। তোমার জন্যে আমার বড় মন খারাপ।

অরুণ মামীমাকে চিঠির উত্তরে লিখিল, ঠাকুমাকে ফেলে আমি এ সময় যেতে পারব না। কলকাতায় ভয়ানক গরম পড়েছে বলে আমার কেমন ক্লান্তি লাগে, আমার শরীর কিছু খারাপ নয়। বর্ষা আরম্ভ হ'লেই আর কষ্ট হবে না।

না যাইবার আসল কারণ অরুণ লিখিল না। অরুণের কেমন ভয় করে, তাহারা এ বাড়ি ছাড়িয়া গেলে, হয়ত পাওনাদারেরা এ বাড়ি আসিয়া দখল করিবে, হয়ত এ বাড়ি বিক্রি হইয়া যাইবে। এ বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে তাহার কেমন ভয় হয়।

শিবপ্রসাদের মৃত্যুর পর অশৌচাবস্থায় অরুণের দেহ-মন যেমন নিস্তেজ প্রাণহীন হইয়া গিয়াছিল, সেরূপ অবস্থা হইলে হয়ত ভাল হইত। কিন্তু পরীক্ষার জন্য অত্যধিক পাঠের ফলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। মন স্থির, শান্ত থাকিতে চায় না, সে সর্ব্বক্ষণ ভাবিতেছে। নানা চিন্তার ছিন্নসূত্রের জালে মাথায় জট পাকাইয়া ওঠে। সমস্তক্ষণ একটা মানসিক চাঞ্চল্য, উদ্বেগ। স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না, বন্ধুদের সহিত গল্প করিতেও মন বসে না।

সকল বিষয়ে তাহার ভয় করে।

একদিন প্রতিমার সামান্য একটু জ্বর হইল। অরুণ তিন জন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল।

যদি প্রতিমার কোন ভারী অসুখ হয়, যদি প্রতিমা মরিয়া যায়! প্রতিমার মৃত্যুর কথা কল্পনা করিতে সে শিহরিয়া ওঠে। মাথা যেন ঘুরিতে থাকে।

কিন্তু অসম্ভব নয় ত। এই জ্বর টাইফয়েড হইতে পারে। মৃত্যু নির্ম্মম, মৃত্যু ত বিচার করে না, বিবেচনা করে না।

অরুণ স্তব্ধ হইয়া বসে। প্রতিমার মৃত্যুর কথা সে ভাবিতে পারে না।

অরুণ অনুভব করে, সে একা, বড় একা। জীবনের পথ একা-চলার পথ। প্রতি আত্মা সঙ্গীহীন, একাকী, আপন দুঃখের ভার বহন করিয়া চলিয়াছে। জীবনের মর্ম্মস্থলে যে বেদনা, সে বেদনা একাকী সহ্য করিতে হইবে, বন্ধুরা সাহায্য করিতে পারে না, সান্ত্বনা দিতে পারে না।

কোন সকালে সে চাকরদের ডাকিয়া হৈ চৈ করিয়া বাড়ি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। কাকার লাইব্রেরী, একতলার পুরাতন লাইব্রেরীর প্রাচীন বইগুলি ঝাড়িতে সাজাইতে আরম্ভ করে। দ্বিপ্রহরে গ্রীষ্মের তাপে সে শ্রান্ত হইয়া পড়ে। খাওয়ার পর বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুইয়া থাকে। বাহিরে রৌদ্র খাঁ খাঁ করে। গ্রীষ্মের মধ্যাকাশের এ প্রখর দীপ্তি বড় ভাল লাগে। গাছের পাতাগুলি ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া বাতাসে দোলে যেন সমুদ্রের তরঙ্গগুলির উপর সূর্য্যালোক নাচিতেছে। বাগানের গাছগুলিকে দেখিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া যায়। হয়ত এ বাগান বেচিয়া দিতে হইবে। এই সুন্দর পুরাতন গাছগুলি কাটিয়া কোন মারোয়াড়ী বাড়ি করিবে। হয়ত এখানে চালের কল বা তেলের কল বসিবে। সারাক্ষণ ঘড়ঘড় শব্দ হইবে। সেই শব্দে ঘোষ-বংশের আদিপুরুষগণ চমকিয়া শিহরিয়া উঠিবেন।

ক্লান্ত হইয়া অরুণ ঘুমাইয়া পড়ে। দুপুরে অনেক সময় তাহার ঘুম হয় কিন্তু রাত্রে তাহার ঘুম হয় না।

শয়নগৃহে মায়ের বৃহৎ খাটে সে রাত্রে শুইতে পারে না। ঘরের ভেতর কেমন যেন দম আটকাইয়া আসে। পঙ্খের কাজ-করা পুরাতন বিবর্ণ দেওয়ালের উপর নিদ্রাহীন নয়নের সম্মুখে নানা ছায়ামূর্ত্তি নাচিয়া ভাসিয়া যায়। মনের যে গোপন গৃহে তাহার বিশ বৎসরের জীবনের নানা স্মৃতি সঞ্চিত হইয়াছে, সেই রহস্যময় অন্ধকার ঘরের দ্বার খুলিয়া যায়, লীলাচঞ্চলা কিশোরীদের মত কাহারা যেন নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া আসে। কত টুক্‌রো হাসি, ছড়ানো কথা, অপরূপ ঘটনা, অসামান্য কণ্ঠস্বর। কোন শরৎ-প্রভাতে উমা কি সুন্দর চাহিয়াছিল; সমুদ্রতীরে তারার আলোয় মল্লিকা বলিয়াছিল, মল্লিকা মল্লিক যে হৃদয়হীনা নয়, সেই কথা তোমায় জানিয়ে গেলুম; এক গভীর রাতে কাকা অক্সফোর্ডে নৌকা-বাওয়ার কি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছিলেন; পদ্মার একটি শাখা-নদী দিয়া একবার তাহারা বজরা করিয়া সাত দিন চলিয়াছিল, মা কি সুন্দর ইলিশ মাছ রাঁধিয়াছিলেন, আশ্বিনমাসের ভরানদীর দিগন্তব্যাপী শান্ত জলরাশিতে সূর্য্যের আলো চন্দ্রের আলো ঝলমল করিত, সে যেন এক মায়াপুরী। কিন্তু এই রঙীন মধুর নৃত্যময়ী মূর্ত্তিগুলি যে নিমিষে মিলাইয়া যায়, তাহাদের পিছনে আসে ঘন কালো ছায়ামূর্ত্তি, দুরন্ত দানব-বালকদের মত। নানা চিন্তা, ভয়, অর্থহীন ভাবনা।

অরুণ আর ঘরে থাকিতে পারে না। দক্ষিণের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুইয়া পড়ে। তারাভরা স্নিগ্ধনীল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। বাগানের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করে। খোলা আকাশের দিকে চাহিয়া মন শান্ত হয়। মনের যে ভাবনাগুলি

ঘরের দেওয়ালে মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া মরিতেছিল, তাহারা মুক্তাকাশে ছাড়া পাইয়া নীল দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়া যায়।

অরুণ সেজন্য আর ঘরে শোয় না, বারান্দায় একটি ছোট তক্তাপোষে শুইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। রাত্রির তারাভরা মুক্তাকাশ না দেখিলে তাহার চোখে ঘুম আসে না।

গভীর রাত্রে অরুণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। পাণ্ডুর আকাশে ম্লান জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জাগিয়া দেখিল, ঝড়ের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, রুদ্রের ডমরুধ্বনির মত জলভরা ঘনকৃষ্ণ-মেঘদলের গুরু গুরু শব্দ, প্রণয়চঞ্চলা রূপালী নাগিনীদের মত বিদ্যুতের ঝিলকি, কালো মেঘের পাশে নীলাকাশ জ্বলজ্বল করিতেছে; কালো মেঘস্তূপের মধ্যে চন্দ্র বার বার হারাইয়া যাইতেছে, পদ্মার তুফানে ছোট নৌকার মত।

স্তব্ধ গভীর রাত্রে ঝড় আসিতেছে! অরুণ লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। চারিদিক নিদ্রিত, নিঝুম; মাঝে মাঝে মেঘগর্জ্জন। বহুদিন পরে অরুণ অন্তরে জীবনের সহজ উল্লাস অনুভব করিল।

বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল, পথের ধূলা উড়াইয়া গাছগুলি দোলাইয়া নিদ্রিত নগর কাঁপাইয়া ঝড় আসিল।

বৃষ্টির অবিরাম আকুল-ধারা! কি স্নিগ্ধ কি কল্লোলময় বারিবর্ষণ!

অরুণের দেহের শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোত উদ্দাম হইয়া উঠিল। বৃষ্টি-পড়ার সহিত তাহার দেহের রক্তচলাচলের কোন নিগূঢ় গভীর যোগ আছে। হৃদয় নাচিয়া উঠে। যুগে যুগে জন্মে জন্মে এই মাটির পৃথিবীতে সে বার বার বর্ষার বারিধারা আকণ্ঠ পান করিয়াছে;

আনন্দময় নব নব প্রাণের অভিব্যক্তিপথের বাঁকে বাঁকে, উদ্ভিদ্‌জন্ম জীবজন্মের স্তরে স্তরে পৃথিবীর নীলাকাশ হইতে জলধারায় স্নাত হইয়া পল্লবিত, মঞ্জুরিত, হিল্লোলিত, উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া অরুণ বাগানে নামিয়া গেল। বাগানে ভিজিয়া সুখ হইল না। গেট খুলিয়া পথে বাহির হইয়া গেল।

পথ জনহীন, কিন্তু ঝঞ্চার আকুল বারিধারা সমস্ত পথ ভরিয়া তুলিয়াছে! অরুণ আপনাকে আর একাকী অনুভব করিল না, ঝড়কে তাহার একা-পথ-চলার সাথী পাইল। ঝঞ্চার সঙ্গলাভ করিয়া সে উল্লসিত অন্তরে পথের পর পথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইতেই স্বর্ণময়ী অরুণকে চিঠি লিখিলেন, অজয় ও প্রতিমার বিবাহের দিন ঠিক করিতে। অজয় খুব ভাল পাশ না করিলেও ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় তাহার একটি চাকরি পাইবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। মাহিনা এখন অধিক নয় বটে, তবে ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষাগুলি পাশ করিতে পারিলে, উন্নতি হইবে।

অরুণ ইতিহাসে ফাষ্ট ক্লাস পাইল। সে কি করিয়া যে ফাষ্ট ক্লাস পাইল, ভাবিয়া সে অবাক হইল।

কাকার মৃত্যুর পরেই এত শীঘ্র প্রতিমার বিবাহ দেওয়া অরুণের ইচ্ছা ছিল না। স্বর্ণময়ীও আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু হেমবাবু বিশেষ তাগাদা দিতে লাগিলেন। একদিন তিনি স্বর্ণময়ীকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন—তোমার ছেলের যদি এখন বিয়ে না দাও তাহলে—

স্বর্ণময়ী বাধা দিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, তোমায় আর বলতে হবে না, আমি যতশীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা করছি। হেমবাবুর প্রথম যৌবনের দু-একটি কীর্ত্তি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

প্রতিমাও বিবাহে বিশেষ উৎসাহিতা। এ বৎসর তাহাকে আর পরীক্ষা দিতে হয় না।

নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। অরুণ যেরূপ ধূমধাম করিবে ভাবিয়াছিল, সেরূপ কিছু করিতে পারিল না।

প্রথমতঃ, ক্যাস-টাকা অধিক নাই। তা ছাড়া স্বর্ণময়ী অধিক আয়োজন করিতে দিলেন না। অরুণ তাহার মাতার সুন্দর পুরাতন

স্বর্ণালঙ্কার দিয়া প্রতিমাকে সাজাইয়া দিল। প্রতিমা প্রথমে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল, বা, দাদা, এসব তোমার বউয়ের জন্য ; আমি তিনটির বেশী কিছুতেই নেব না, একটি হাতের, একটি কাণের আর একটি গলার। কিন্তু শেষে, সে অরুণের ভাবী বধূর জন্য তিনখানি গহনা রখিয়া, বাকী সবগুলিই পরিল।

হাসিয়া বলিল, আচ্ছা দাদা, তুমি যা জেদ করছ, আমি এখন নিচ্ছি, কিন্তু তোমার বউ এলে, আধাআধি ভাগ করে দিয়ে দেব।

সালঙ্কৃতা সুসজ্জিতা প্রতিমার দিকে চাহিয়া অরুণের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, এ কনক প্রতিমা যেমন সুন্দর তেমনি করুণ। হায়, আজ যদি মা থাকিতেন!

ঠাকুমা আড়ালে চোখ মোছেন, অরুণ বুকে একটা ব্যথা চাপিয়া হাসে।

অজয় একদিন আড়ালে প্রতিমাকে বলিয়াছিল, গয়নাগুলি বাপু বড় পুরানো প্যাটার্ণের!

প্রতিমা তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিল, তুমি চুপ করো, তুমি গয়নার কি বোঝ! আর এখন পুরাতন প্যাটার্ণ পরাইত ফ্যাসান। লোকে বলে, কোথায় অজন্তা কোথায় ইলোরার ছবি দেখে সব গয়না গড়ায়।

বিবাহের দিন পর্য্যন্ত প্রতিমা বেশ হাসি-খুসি ভাবে কাটাইল। কিন্তু পরদিন সে বড় গম্ভীর হইয়া গেল। আর শ্বশুরবাড়ী যাইবার পূর্ব্বে সে কি কান্না! কোন বারণ, লজ্জা মানিল না। অরুণকে জড়াইয়া ছোট শিশুর মত সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অরুণও আপনাকে দমন করিতে পারিল না, তাহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

—আর কাঁদিস্‌নে টুলি, মুখখানা কি করলি ব'লত, সব চন্দনরেখা মুছে গেল—চল্‌—

—আমি যাব না দাদা, কেন তুমি আমায় বিয়ে দিলে, আমি রা দু'জনে বেশ ছিলুম।

—চুপ কর, মুখটা মুছিয়ে দি চল—ও-রকম কান্নাভরা মুখ নিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলে লোকে বলবে কি—তোরা মডার্ণ মেয়ে—

—হতে চাই না মডার্ণ—দাদা!

—ওরে আর আধঘণ্টা পরে বারবেলা পড়বে, সেখানে আবার তোকে বরণ করবে—

—দাদা! তুমি কি করে থাকবে একলা!

—ঠাকুমা রইলেন।

—তুমিও চলো! দাদা! আর একবার চলো তোমার ঘরে মায়ের ফটো দেখে আসি।

গাঁটছড়া আবার খুলিতে হইল। অজয় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অরুণ লজ্জিত হইয়া বলিল, একটু শান্ত ক'রে আনছি ভাই।

—তুমি ভারি দুষ্টু দাদা, এত শীগ্‌গীর আমার বিয়ে দিলে কেন।

এ যেন সাত বছরের আবদারে মেয়ে!

ছেলেবেলায় প্রতিমা একবার এরূপ কাঁদিয়াছিল। মায়ের মৃত্যুর কিছু পরেই হইবে। তাহারা দুইজনে এক ঘরে শুইত। হঠাৎ মধ্যরাত্রে অরুণের ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখিল, প্রতিমা বিছানায় বসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে, বেশী চেঁচাইয়া কাঁদিতে পারিতেছে না, পাছে পাশের ঘরে বাবার ঘুম ভাঙিয়া যায়। অরুণ একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কাঁদছিস্‌ কেন টুলি? ক্রন্দনকম্পিত, কণ্ঠে অভিমানের সহিত প্রতিমা বলিয়াছিল—মা অন্ধকারে ভয় পায় না বুঝি!

তারপর অরুণকে জড়াইয়া ধরিয়া সে কি কান্না! আশ্চর্য্য, অরুণও তাহার সহিত কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে দুইজনে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

মাতার বৃহৎ অয়েল-পেন্টিংয়ের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিতে ছেলেবেলার এই ঘটনাটি অরুণের মনে পড়িয়া গেল। অরুণ ধীরে বলিল, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বেশী কান্নাকাটি করিস্ না টুলি।

—না দাদা, এই চোখ মুছলুম ব্যস্! দাদা, আমাকে কিন্তু মায়ের এই অয়েল পেন্টিংয়ের একটি কপি করিয়ে দিতে হবে।

বৌ-ভাতের রাতে প্রতিমা বড় সুন্দর গান গাহিয়াছিল। সে গান শুনিয়া অরুণ নিশ্চিন্ত হইল। প্রতিমা সুখী হইয়াছে। তাহার কণ্ঠে এক নূতন আনন্দের সুর স্বপ্নের রেশ লাগিয়াছে।

বিদায়ের সময় প্রতিমা আর কাঁদিল না। এই কয়দিনে সে বদলাইয়া গিয়াছে, একটা অপূর্ব্ব আলোক তাহার মুখে জল-জল করিয়া ওঠে। হাসিমুখে সে বলিল, দাদা, তুমি এবার একটা বিয়ে কর।

৪২

সমস্ত দিন অবিশ্রাম টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হইয়াছে; অপরাহ্ণে আকাশ সহসা মেঘমুক্ত হইয়া অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বৃষ্টি ধৌত নীলিমা সদ্যস্নাতা তরুণীর আননের দীপ্ত মায়ার মত। পশ্চিম গগনের ধূসর মেঘস্তূপের মধ্যে সূর্য্যাস্তের বর্ণোৎসব।

পশ্চিমমুখী বারান্দায় ইজিচেয়ারে অরুণ দেহ এলাইয়া বসিল। কদম্ববৃক্ষের দীর্ঘ পত্রগুলিতে আলো ঝিকিমিকি করিতেছে, শাখা প্রশাখাগুলির মধ্য দিয়া পশ্চিমাকাশের রক্তিমা যেন সবুজ পটে ইমপ্রেসনিষ্ট-শিল্পীর তুলির রক্তবর্ণের ছোপ।

রঙিন পটে একটি ছায়া-মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। শাড়ীর খস্‌খস্ শব্দে অরুণ চমকিয়া চাহিল, সম্মুখে এক তরুণীর কালো ছায়া, তাহার পেছনে সন্ধ্যাকাশ গলিত তপ্ত স্বর্ণের মত জলজল করিতেছে। মুখখানি অস্পষ্ট কিন্তু চারিদিকে যেন দিব্যজ্যোতি।

বিস্মিত হইয়া অরুণ বলিল—কে?

বালি-খসা আইয়োনিক থামে ঠেস দিয়া ভিজা রেলিংএ হাত রাখিয়া উমা বলিল—বা, চিনতে পারছ না?

অরুণ কণ্ঠের স্বরে চিনিল, আবেগের সহিত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—ও, তুমি? তুমি!

হাসিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়া উঠিল,—তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শান্ত সুদূর—

হাত নাড়িয়া চুড়ির ঝঙ্কারে উমা বলিল—থাক্, খুব কবিত্ব হয়েছে, চিনতেই ত পারছিলে না।

লজ্জিত হইয়া অরুণ বলিল.—বস, টুলি এসেছে?

—না, আমি একা, তুমি বস, আমি এ দিকে বসছি।

—না তুমি এই চেয়ারটায় বস, এখানে না বসলে সন্ধ্যাটা যে কি সুন্দর, তা বুঝতে পারবে না।

—সন্ধ্যার শোভা দেখতে আসিনি, সে-ত বাড়ীর ছাদ থেকে আরও ভাল দেখা যেত।

—না, না, তুমি এই চেয়ারে বস।

—কি জেদী ছেলে।

অরুণ যে চেয়ারে বসিয়াছিল উমাকে সেই চেয়ারে বসিতে হইল অরুণ একটি ছোট চেয়ার আনিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া উমার সম্মুখে বসিল। উমার মুখে চোখে রেশমী শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে রাঙা আলোর বন্যা। বস্তুতঃ, উমাকে সূর্য্যাস্ত দেখাইবার জন্য নয়, চুনী-পান্না-গলানো স্বপ্নময় আলোয় উমাকে দেখিবার জন্যই অরুণ তাহাকে পশ্চিমমুখী করিয়া বসাইল। তাহার দেহের রক্ত ঝিলমিল করিয়া উঠিল। সত্যই এ কোন অপরিচিতা মায়াবিনী!

—তারপর, হঠাৎ মনে পড়ল?

—কাল যাওনি কেন, তোমার বোনত ভেবে অস্থির। আমি বল্লুম, অসুখ হয়নি, কবিত্ব হচ্ছে।

—যাই নি বলে এলে ত। চা খাবে?

—না, এই মাত্র খেয়ে আসছি, তা ছাড়া আমাকেই ত করতে হবে।

—তা বটে, টুলি নেই. তা তোমার হাতের এক কাপ চা না হয় খেতুম।

—একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়ী গেলেই সেটা জুটতো। তোমার ব্যাপারটা কি, বলত ?

—আজ সারাদিন কি বিষ্টি !

—তা নয়। হঠাৎ এত রোগী-সেবা আরম্ভ হয়েছে কেন ?

—রোগী নয়, রোগিণী। তাই বল, এইজন্যে আসা !

—তা তুমি যা কাণ্ড করছ !

—কাণ্ড কি, স্ক্যাণ্ডাল্ ত এখনও কিছু করি নি।

—স্ক্যাণ্ডাল্ ত ভাল ছিল। কাল সারাদিন ওখানে ছিলে, শুনলুম।

—রিপোর্ট ঠিক আছে।

—রাখতে হয় বই কি। শোন, ব্যাপার কি ? প্রেম ?

—প্রেম কি এতই সহজ, এতই সুলভ ?

—কি জানি বাপু আমি প্রেমের কিছু বুঝি না। আমার হৃদয়টা বোধ হয় কঠোর—

—অথবা এখনও জাগে নি।

—আর জেগে দরকার নেই, এম্নিই যথেষ্ট জ্বালা !

উমার দীপ্ত নয়নের দিকে অরুণ চাহিল। চক্ষুতারকার জ্যোতি যেন বিরহিণীর অন্ধকারগৃহদ্বারে দীপশিখা। মুখে সে যাহাই বলুক, কৃষ্ণ আয়তনয়নে কোন অনাগত অতিথির প্রতীক্ষা !

অরুণ হাসিয়া উঠিল।

—শোন, হাসি নয়, সিরিয়স্লি বল্‌ছি, মেয়েটির ত টি বি হয়েছে শুন্‌লুম।

—ডাক্তার তাই বলে গেছেন।

—শুনেছি, তোমার মায়ের ওই রোগে মৃত্যু হয়।

—আর আমার খুব বিশ্বাস বাবারও তাই হয়েছিল।

—তবে ?

—তবে কি ? আমার কোন ভয় নেই।

উমা গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিল।

অরুণ ভাবিতে লাগিল, উমা চলিয়া গেলেই জয়ন্তদের বাড়ী যাইতে হইবে। জয়ন্তের মাসতুতো বড় বোন দুর্গার যক্ষা হইয়াছে, রায় দিয়া ডাক্তার যেদিন ভিজিটের চার টাকা পকেটে পুরিয়া চলিয়া গেলেন, বাড়ীতে কান্না পড়িয়া গেল। তাহাদের দুর্ব্বলতা ও অসহায়তা দেখিয়া অরুণ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; সে জয়ন্তকে বলিয়াছিল, তোমার বোনের সমস্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করছি, কিন্তু তোমাদের কারও চোখে যদি একটু জল কোনদিন দেখি, তাহলে আমি আর এ বাড়ীতে আসব না বলে দিচ্ছি। জয়ন্ত বলিয়াছিল—ভাই, ডাক্তার যে বলে গেল। অরুণ বলিয়াছিল, ডাক্তার যাই বলুন, এত সহজে হাল ছাড়লে চল্‌বে না। ইহার পূর্ব্বে অরুণ কোনদিন জয়ন্তের বাড়ীর ভিতর যায় নাই। সেদিন দুর্গার রোগশয্যার পার্শ্বে গিয়া বলিয়াছিল, কোন ভয় নেই তোমার, তুমি সেরে যাবে।

অরুণ ভাবিতে লাগিল, আজ দিনটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল, দুর্গার জ্বর নিশ্চয় অধিক হয় নাই।

উমা বলিল,—আচ্ছা, আমি মাকে গিয়ে সব কথা বল্‌ছি।

—মামীমা সব জানেন। বৃষ্টিটা ধরলে দুর্গাকে কোথায় চেঞ্জে পাঠান যায় সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ হয়েছে।

—কি জানি বাপু আমি কিছু বুঝি না।

—শোন উমা, তুমি ভুল বুঝোনা। দুর্গার ওপর আমার কেমন স্নেহ—'সিমপ্যাথি' বল্লে ঠিক বোঝায়—অবশ্য ওর অসুখ হওয়ার

পর থেকেই—কেমন মায়া লাগে—মেয়েটির অনেক গুণ আর খুব বুদ্ধি, যদি ভাল করে লেখাপড়া করতে পারত—

—দেখতে সুন্দর ?

—সুন্দরী যাকে বলে তা নয়, কিন্তু এমন একটা চার্ম আছে, একটি বিশেষ মনের পরিচয় পাওয়া যায়—

—আমি একদিন দেখতে যাব ?

—বেশত !

—আচ্ছা ওদের সঙ্গেত তোমার অনেক দিনের আলাপ। অসুখ হ'ল, তবে টান হ'ল।

—কি জানি, বোধ হয় আমার মনটা একটু মরবিড, অসুস্থতার প্রতি একটা বেদনাময় সহানুভূতি হয়, মনটা জেগে ওঠে। বিশেষতঃ এ রকম দীর্ঘকাল-স্থায়ী অসুখ, মৃত্যুর পরওয়ানা পেয়েও রোগী দমে না, এখানে মানুষের আত্মার এক অপূর্ব্ব রূপ দেখতে পাই, সংগ্রাম করে চলেছে, শুধু বেঁচে থাকবার জন্য নয়, আপনাকে নব নব রূপে বিকশিত করবার জন্যে—তোমায় ঠিক বোঝাতে পারছি না।

—আচ্ছা, একদিন যাব দেখতে। হাওয়াটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

—গরম হচ্ছে চল ছাদে যাবে ?

—মন্দ হয় না গেলে।

সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। পশ্চিমাকাশের রক্তিম মায়া অন্ধকারে বিলীন।

অরুণ ও উমা ছাদে গিয়া বসিল। মল্লিকদের বাগানের পুষ্পিত বৃক্ষগুলির অন্তরালে চতুর্দ্দশীর চন্দ্র উঠিল।

উমা বলিল—বা, আমরা ত বেশ চুপচাপ বসে আছি, আহা চাঁদটা কি সুন্দর দেখ !

—কি একটা কথা তোমায় বলব, ভেবে রেখেছিলুম, মনে পড়ছে না।

—ছাই কথা।

—আচ্ছা, তোমার মৎলবটা কি বলত ?

—মৎলব আবার কি ? তোমার মত অত ভাবতে পারি না, রোগীর সেবাও করতে পারি না।

—মামীমা বড় দুঃখ করছিলেন। তুমি বলেছ, তুমি বিয়ে করবে না। একটি খুব ভাল সম্বন্ধ এসেছিল।

—দেখ, অরুণ, চুপ। My life is my own.

—তুমি লাইফের কি জান, কি বোঝ ? পরে অনুতাপ করবে।

—তুমিই বা লাইফের কি জানো ?

—জীবনের সকল রহস্য জানাবো, তাহার গভীরতম আনন্দ ও বেদনা, এই আমার সাধনা।

—আমি বাপু অত বড় বড় কথা জানি না। I want to see life for myself.

—একা হয় না, সঙ্গী চাই, বন্ধু চাই, প্রেমিক চাই।

—ওই শেষেরটি বাদ।

—এখন বাদ বলছ, কিন্তু একদিন দেখবে, জীবনে যে প্রেম অনুভব করল না—

—'লভ' বল।

—সবেতেই তোমার ঠাট্টা।

—কিছু মনে কোরোনা। বেশ লাগছে, বাতাস বড় মিষ্টি, সন্ধ্যাটা বড় সুন্দর, চাঁদটা চমৎকার। মনটা কেমন খুলে যাচ্ছে। মন খুলেই বলি, প্রেম না হলে জীবন পূর্ণ হয় না, খুব মানি। কিন্তু কেউ যখন

ভালবাসার কথা বলে, আমার কেমন হাসি পায়। মনে হয় moon shine.

—এদিকে প্রেমের গল্প উপন্যাস পড়তে ত পাগল।

—ঠিক বলেছ, উপন্যাস, কল্পনা, ভাবতে বেশ লাগে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সত্যি ত নয়। আসল কথা, ভালবাসা যে কি, তুমিও জান না, আমিও জানি না।

—দেখ, সে রকম ভাবলে, সবই ত কল্পনা, সকল অনুভূতিই—

—তুমি কি ভাবছ, আমি জানি। তোমার অনুভূতির সত্যকে আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সে সত্য কতখানি বাস্তব আর কতখানি কবি-হৃদয়ের তরুণ কল্পনার রঙীন সৃষ্টি—কবিই'ত বলেছেন—আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—

—এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা বৃথা, কারণ তোমার অনুভূতির সঙ্গে আমার অনুভূতির কোন মিল নেই।

—আমার কি মনে হয় জানো, ভালবাসার সম্পর্কের চেয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হচ্ছে বড়, সত্যিকার। ভালবাসায় খানিকটা মোহ আছে, কামনার লালসা আছে। অর্থাৎ যে ভালবাসে, সে তার নিজের সুখ স্বার্থের জন্য ভালবাসে।

—আর দুঃখও ভোগ করে কম নয়।

—হয়ত দুঃখও ভোগ করে। কিন্তু সে-তার নিজের সৃষ্টি করা দুঃখ, সুখভোগ হচ্ছে না বলে, বাসনা পূর্ণ হচ্ছে না বলে দুঃখ। কিন্তু বন্ধুত্বে স্বার্থ নেই, দাবী নেই, এ অহৈতুকী।

—অহৈতুকী প্রেম।

—আচ্ছা তাই হল। 'প্রেম' কথাটা তোমার চাই-ই।

—তুমি যেমন 'কমরেড' কথাটি পছন্দ কর।

—অল রাইট কমরেড।

নির্ম্মল নীলাকাশে চন্দ্রালোকের বন্যা। চারিদিক্ থম্ থম্ করিতেছে। বাতাসে প্রাচীন উদ্যান আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছে। দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; অনুভব করিল সময়ের স্রোত যেন বহিয়া চলিয়াছে শরতের নদীর মত, শান্ত, পরিপূর্ণ।

উমা বলিয়া উঠিল, বা বেশ চুপচাপ বসে আছি, রাত বোধ হয় অনেক হয়েছে। ওঠ, আমরা সোমবার যাচ্ছি জানো। কাল তোমাকে বার্থ বুক ক'রতে হবে।

—সোমবার যাওয়া ঠিক হ'ল?

—আচ্ছা, তুমিও চলনা আমাদের সঙ্গে? বা, বেশ হবে, তুমিও চলো।

আবেগের সহিত উমা আনন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি।

—ঠাকুমা?

—তিনিও যাবেন। সবাই বেশ দিল্লীতে থাকবো।

—এম্, এ, পড়া?

—ভারি ত পড়ছ। ল' কলেজ ত ছেড়ে দিয়েছ শুনলুম। বেশ হবে, আমি বলছি গিয়ে মাকে।

—সে হয় না উমা।

—কেন হয় না?

—কেন? কেমন করে তোমায় বোঝাব?

—তোমার সবেতে হেঁয়ালি, ওই জন্যেই ত' রাগ ধরে।

—আচ্ছা, পূজার ছুটি হলেই আসবে দিল্লীতে।

—যাব, তবে ছুটি হলেই যাব কিনা বলতে পারছি না

—আচ্ছা, এখন চলত। মা নিশ্চয় ভাবছেন।

—চলো, নীচের বাগানটা একটু ঘুরে যাবে।

—আবার বাগান? বাগানটার কিন্তু কোন অযত্ন করোনা।

—বাগান কি আর এসে দেখতে পাবে। আসছে মাসে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

—আহা! বিক্রি করতে হবে? পুকুর?

—পুকুর সুদ্ধু।

—চলো। পুকুরটার জন্যে কান্না পাচ্ছে।

জ্যোৎস্নালোকে দুইজনে বহুক্ষণ পুকুরের ধারে ভাঙা ঘাটে বসিয়া রহিল। মাঝে মাঝে দু-চারিটি কথা।

বর্ষার ধারাপূর্ণ পুষ্করিণীর জলে জ্যোৎস্নালোকের বন্যার মত তাহাদের অন্তর ছলছলিয়া উঠিল।

৪৩

বর্ষার রাত্রির আকাশে ছিন্ন কৃষ্ণমেঘদলের আনাগোনার অন্ত নাই। নবমীর চন্দ্র এই চঞ্চল মেঘরাজ্যে ঝঞ্ঝার সমুদ্রে রূপালী তরীর মত বার বার ডুবিতেছে, উঠিতেছে, পথ হারাইতেছে।

ঊর্দ্ধে আকাশে বায়ুস্রোত প্রবল কিন্তু নিম্নে ধরণীতে একটুও বাতাস নাই। গাছগুলি কালো ছায়ার মত স্থির দাঁড়াইয়া।

বিছানায় শুইয়া অরুণের ঘুম আসে না। চোখ জ্বালা করে, মাথা দপ্ দপ্ করে। পঙ্কের কাজ-ওঠা প্রাচীন বিবর্ণ দেওয়ালে চাঁদের পাণ্ডুর আলো মাঝে মাঝে ঝিকিমিকি করিয়া ওঠে। কালো ছায়ামূর্ত্তির দল নাচিতে নাচিতে চলিয়া যায়।

ঘুম আসে না। মায়ের পুরাতন কারুকার্য্যময় কালো বৃহৎ খাটের এক পাশ হইতে অপর পাশে সে গড়াইয়া যায়, বার-বার পাশ বদল করে। ঘুম আসে না।

অরুণ-ব্যথিত হৃদয়ে প্রার্থনা করে, ঘুম দাও, বিধাতা ঘুম দাও। দাতার বৃহৎ অয়েল-পেন্টিংয়ের দিকে করুণ নয়নে চাহিয়া থাকে। চোখ বুজিয়া স্থির হইয়া শোয়, ঘুম আসে না।

পুরাতন ফ্রেঞ্চ ঘড়িটি আবার বিকল, বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাত বোধ হয় দুইটা হইবে। চারিদিক গভীর স্তব্ধ, প্রাণহীন।

তপ্ত শয্যা ত্যাগ করিয়া অরুণ ওঠে। কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া খায়। ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইয়া কিছুক্ষণ ইজিচেয়ারে চুপ করিয়া বসে। ঘড়িগুলি দেখে। সব ঘড়িই বন্ধ। তাহার মাথায় ঘড়ির

চাকার মত চিন্তার ধারা কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিতেছে। এই চিন্তার ঘূর্ণাবর্ত্ত যে কিছুতেই থামে না। সে কিছু ভাবিতে চায় না। দম-দেওয়া কলের চাকার মত চিন্তাগুলি মাথায় এমন ঘোরে কেন?

বিদায়বেলার উমার কথাগুলি অরুণের মাথায় সমুদ্রগামী পাখীর ঝাঁকের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

ষ্টেশনে গাড়ী ছাড়িবার সময় উমা বলিয়াছিল, au revoir, অরুণ বলিয়াছিল, গুড্‌ বাই।

উমা সেণ্টিমেণ্টকে ঘৃণা করে। ভালবাসাকে ব্যঙ্গ করে।

উমা বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখিতে চায়, কমরেড হইতে চায়।

কিন্তু অরুণ চায় প্রেম, অরুণ চায় প্রেমিকা, অরুণ খোঁজে লীলা-সঙ্গিনী। যে-প্রেম দেহমনকে সুধারসে স্নিগ্ধ করিবে, যে-প্রেম সকল কামনা অন্তরের সকল তৃষা মিটাইয়া দিবে।

আলো নিবাইয়া অরুণ ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। চেষ্টা করিলেই ঘুমান যায় না। ইচ্ছা করিলেই ভোলা যায় না; চিন্তার স্রোত ত নিজের ইচ্ছায় থামান যায় না। সে যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তির হস্তের ক্রীড়নক। সে শক্তি তাহার দেহ মনে এত বেদনা দিয়া কি অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে চায়?

অরুণ ঘর হইতে বাহির হইয়া চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। যেন একটা ভূতের বাড়ি। অন্ধকারময় প্রাঙ্গণ রহস্যময় নয়, ভীতিপ্রদও নয়, প্রাণহীন অন্ধ বিবরের মত।

ধীরে সে প্রতিমার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘর তালাবন্ধ, ভিতরে কি মৃদু শব্দ হইতেছে, বোধ হয় ইঁদুরের দল ঘুরিতেছে। যাইবার পূর্ব্বে এইখানে দাঁড়াইয়া প্রতিমা কাঁদিয়াছিল! ধীরে সে বারান্দায় বাহির হইয়া গেল।

বাড়ির পূর্ব্বাংশে চাহিয়া তাহার চোখ জ্বলিতে লাগিল। পূর্ব্ব-পুরুষদের প্রাচীন প্রিয় উদ্যান আর নাই। শিবপ্রসাদের সকল ঋণ শোধ করিবার জন্য বাগান ও পুকুর বেচিয়া দিতে হইয়াছে। ব্যারিষ্টার সেন বলিয়াছিলেন, কেবলমাত্র বাড়ির বাগানের অংশ বেচিলেই মর্টগেজের দেনা শোধ হইতে পারে। অরুণ কিন্তু মৃত কাকার সকল দেনাই শোধ করিয়া দিতে চায়। সেজন্য পুকুরের অংশও বেচিতে হইল।

এখন বাগানে আর বৃহৎ প্রাচীন বৃক্ষগুলি নাই ; নূতন বাড়ি তৈরি হইতেছে, ভারার বাঁশগুলি সঙ্গীনের মত আকাশের দিকে উঁচু হইয়া আছে।

বোধ হয় উমার কথাই সত্য। হয়ত সে শুধু যৌবন-বেদনায় কবিমনের কল্পনায় রঙীন স্বপ্নজাল রচনা করিয়া ভাবিয়াছে, এই প্রেম, এই সত্য।

সে স্বপ্নজাল ছিন্ন হউক। রাত্রির সজল অন্ধকারে মিলাইয়া যাক্।

ষ্টেশনে বিদায়ের সময় সে ত উমাকে বলিতে চাহিয়াছিল, The play is finished, বিদায়!

কিন্তু উমার মনে ব্যথা দিয়া সে কোন কথা বলিতে পারিল না। কেন বলিতে পারে না?

অন্ধকার গলির দিকে চাহিয়া অরুণ ভাবিতে লাগিল, উমা, তুমি যদি কোনদিন জীবনে কাউকে ভালবাস, তখন তুমি বুঝতে পারবে, তুমি আমার হৃদয়ে কি গভীর বেদনা দিয়েছ। সে বেদনার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, সে বেদনায় আমি ধন্য, সে বেদনা আমাকে নবজীবনের দ্বারে পৌঁছে দিল।

অরুণ আপন মনে হাসিয়া উঠিল, সত্যই সে বড় সেন্টিমেণ্টাল।

অরুণ আর বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। শিবপ্রসাদ যে-গৃহে শয়ন করিতেন সে গৃহে আলো জ্বালাইয়া প্রবেশ করিল।

তাহার গা কেমন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। নিঃশব্দে সে ঘরে পায়চারি করিতে লাগিল। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত শিবপ্রসাদ এইরূপভাবে ঘরে বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

ধীরে অরুণ ড্রেসিং টেবিলের সংলগ্ন কাবার্ড খুলিল। একটি বড় মদের বোতল ও গেলাস রহিয়াছে। একবার সে ঘরের চারিদিকে চাহিল। বাড়িখানি নিঝুম, ঘরের আলো দপ্ দপ্ করিতেছে।

দক্ষিণ-ফ্রান্সের দ্রাক্ষারসপূর্ণ রঙীন মদ কাচের গেলাসে কানায় কানায় ঢালিয়া অরুণ কয়েক চুমুকে মদ খাইতে লাগিল। গলা জ্বলিতে লাগিল বটে, কিন্তু বুকের ব্যথা যেন কিছু কমিয়া আসিল।

আর এক গেলাস মদ ঢালিবে ভাবিল। কোথায় যেন খস্ খস্ শব্দ হইল। বুঝি কাকা চিরপরিচিত চেকের ড্রেসিংগাউন গায়ে জড়াইয়া বারান্দা হইতে ঘরে প্রবেশ করিবেন। অরুণ তাড়াতাড়ি কাবার্ড বন্ধ করিয়া দিল। ঘরের আলো নিবাইল না। অন্ধকারে যাইতে তাহার কেমন ভয় করিতেছে।

চঞ্চলপদে সে বিছানায় গিয়া শুইল। এইবার বোধ হয় চোখে ঘুম আসিবে।

এলার্ম ঘড়িটা সহসা বাজিয়া থামিয়া গেল। উষার আকাশ অন্ধকার করিয়া ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অরুণের একবার ইচ্ছা হইল, বৃষ্টিতে গিয়া ভিজিয়া আসে। কিন্তু বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার মত শক্তি যেন তাহার নাই।

ধীরে সে চোখ বুঝিল। কোন সুখস্বপ্নের মায়া তাহার চোখে ভরিয়া আসিল না। চোখ দুইটি জ্বালা করিতেছে। প্রথম যৌবন-স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে।

ঠাকুমা তখন সকল শূন্য ঘরের দরজায় দরজায় জলছড়া দিতেছেন।

পূজার ছুটিতে অরুণ দিল্লী গেল না। হৃদয়াবেগের ঘূর্ণাবর্ত্তে আর দিশাহারা হইতে চায় না। কাহাকে ভালবাসিল, কে ভালবাসিল না, এ সকল প্রশ্ন, জীবনের দ্বন্দ্ব, হৃদয়ের সকল ভয় ভাবনা কামনা, আবর্জ্জনা-রাশির মত সে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চায়। শরতের নির্ম্মলতম নীলগগনের প্রশান্তির জন্য সে তৃষিত।

অরুণ ভাবে, সে যদি মধ্যযুগের ইয়োরোপে জন্মগ্রহণ করিত, কোন মনষ্টারিতে গিয়া জ্ঞানের সাধনা করিত, যদি বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে জন্মিত কোন বিহারে যাইয়া সত্যের সন্ধান করিত। ধর্ম্মের জন্য পুণ্যের জন্য যাইত না, কারণ সে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে না। সত্য কি, সে জানিতে চায়।

মাতৃহারা বালক অন্ধকার রাত্রে একা বিছানাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে, মাকে খোঁজে, খুঁজিয়া পায় না, প্রথমে কাঁদিয়া ওঠে, তারপর মনে পড়িয়া যায়, মা নাই, মা চলিয়া গেছে, তখন সে গম্ভীর মুখে উঠিয়া বসে, আর কাঁদে না, অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে, একা ঘরে থাকিতে ভয় করে, ক্ষুব্ধ নীরব বেদনায় সে ঘর হইতে বাহির হইয়া মুক্ত আকাশের নীচে তারার আলোয় দাঁড়ায়, লক্ষ লক্ষ যোজন দূরের তারাগুলিকে তাহার সাথী বলিয়া কল্পনা করে, ভাবে, মা আছে ওই তারালোকে।

অরুণের মনের অবস্থাও এইরূপ।

প্রথমে অরুণ হরিসাধনের সহিত বাহির হইল উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত

[illegible]লিতে সেবার কাজ করিবার জন্য। গ্রামবাসীদের অসহায়তা, [illegible]রুণ দারিদ্র্য, নিজ স্বার্থরক্ষা ও কর্ম্মশক্তির অভাব দেখিয়া সে [illegible]জিত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বৎসরের পর বৎসর এই নির্জ্জীব [illegible]গ্য কৃষকগণ প্রকৃতির সকল আক্রমণ, পৃথিবীর সকল অত্যাচার [illegible]র নতমুখে নীরবে সহ্য করিয়া চলিয়াছে। কেন তাহারা [illegible]কারের চেষ্টা করে না, বিদ্রোহ করে না!

অরুণের মন অশান্ত হইয়া উঠিল,—'এই সব মূঢ় মূক মুখে দিতে হবে ভাষা—।' হরিসাধন বলিল, অরুণ তুমি সেবা করতে এসেছ, [illegible] প্রচার করতে নয়। একবার অরুণের পেটের অসুখ হওয়াতে, [illegible]সাধন তাহাকে জোর করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল।

[illegible]লিকাতায় যেন দম আটকাইয়া আসে। শূন্য জীর্ণ বাড়ীটি বুকের [illegible] চাপিয়া ধরে! নগরীর জনকল্লোল জীবনধারা অর্থহীন, উন্মত্ত, [illegible] মনে।

অরুণ স্থির করিল, বাংলার সত্যিকার রূপ দেখিবে, হাঁটিয়া সে, নদীয়া, বর্দ্ধমান, কয়েকটি জেলা ঘুরিবে। সন্ন্যাসীমামা যদি থাকিতেন তাহার সহিত দেশভ্রমণে বাহির হইত।

[illegible]কুমা তাহাকে কিছুতেই একা যাইতে দিলেন না। উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে তাহার বাহির হওয়া হইল না।

[illegible]নে সময় বাণেশ্বর তাহাকে তাহার মাসীমার পল্লীগ্রামে আসিয়া থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। বলিল, এস আমার সঙ্গে, মৎস্য ধরিবে [illegible] সুখে।

দুই সপ্তাহ হইল অরুণ এই নিভৃত নির্জ্জন পল্লীগ্রামে আসিয়া গভীর [illegible] পাইয়াছে। অতি প্রাচীন গ্রাম, পদ্মার একটি শাখা নদীর তীরে, [illegible]য়ে ষ্টেশন হইতে দূরে বলিয়া পুরাতন গ্রাম্যজীবনধারা এখনও

নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহিত। অরুণ এখানে সেবকরূপে বিপ্লবপ্রচারক সোশ্যালিষ্টরূপে আসে নাই, আসিয়াছে শ্রান্ত ক্লিষ্ট প্রাণ লইয়া শান্তিকামী কবিরূপে।

শরতের আলো-ভরা উদার আকাশের তলে আপকধান্যভারনম্র দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রগুলির মধ্যে প্রাচীন ক্ষুদ্র গ্রামের বিচিত্র রূপময় জীবনধারা ধ্যানী রূপকারের স্নিগ্ধ নির্ম্মল ছবির স্রোতের মত অরুণের সম্মুখে বহিয়া যায়; ক্ষুদ্র কামনার জ্বর আর থাকে না, বাসনার জ্বালা দূর হইয়া যায়।

পূর্ব্বাচলের শিখর-চূড়ায় উষা যখন মেঘে মেঘে সোনা ছড়াইয়া চলে, গ্রামখানি জাগিয়া উঠে। প্রভাতে সূর্য্যের প্রসন্ন আলোকে চারিদিকে কাজের সাড়া পড়িয়া যায়। সে কাজে উদ্বেগ নেই, মত্ত গতি নেই। বধূরা কাঁখে কলসী ধরিয়া নদীতে জল আনিতে চলে; মাঝি নৌকায় পাল তুলিয়া দেয়; মাথার ওপর জাল ঘুরাইয়া জেলে মাছ ধরে; শাক-পাতা-ভরা ঝুড়ি মাথায় চাষার মেয়ে হাটে যায়; কলুর ঘরে চোখ-বাঁধা বলদগুলি ঘানি ঘোরায়; খড়-বোঝাই গরুর গাড়ি মন্থর গতিতে চলে; ভট্টাচার্য্যদের চণ্ডীমণ্ডপে দাবার আড্ডা বসে; বুড়ো চাকর কেষ্টা বার বার কল্‌কে ধরায়; কুমোরের চাকের সম্মুখে ছোট মেয়েরা ভিড় করে; গরুর পাল ধূলি উড়াইয়া চলে।

মধ্যাহ্নের প্রহরগুলি স্তব্ধ গম্ভীর। শূন্য ঘাটের ধারে প্রাচীন বটগাছের পাতাগুলি আলোকে ঝিলমিল করে, শতবৎসরের সমাহিত প্রাণের রূপ নদীজলে প্রতিফলিত হয়; কাশশুভ্র কূলে বকের দল ঘুরিয়া বেড়ায়; মাছরাঙা চুপ করিয়া বাঁশগাছে বসে; আকাশ হইতে আলোক বন্যা উপ্‌ছে-পড়া ঘটের জলস্রোতের মত ধরিত্রীর হিরণ্য-অঞ্চলে ঝলমল করে

চারিদিকের এই শান্ত জ্যোতির্ময় অস্তিত্বের ধারার মধ্যে অরুণ কেবলমাত্র ধ্যানী দ্রষ্টারূপে থাকিতে পারে না, তাহার সত্তা কোন্ গভীরতায় ডুবিয়া যায়। রাত্রির তিমিরপুঞ্জে গ্রামখানি যখন ঘুমাইয়া পড়ে, তারাজ্বলা অন্ধকারে সে আপনার মধ্যে আত্মস্থ হইয়া বসে। তাহার রক্তে যে ঝঞ্ঝার আহ্বান, বিপ্লবের সুর রহিয়াছে তারা স্তব্ধলীন হয়, আগুনের জ্বালা প্রদীপের শিখার মত স্নিগ্ধ হইয়া আসে। প্রবহমান নিঃশ্বাসের কলরোলে নিশীথের স্তব্ধতায় অরুণ দেহে মনে অনুভব করে পৃথিবী। নাড়ীতে নাড়ীতে যে প্রাণরস প্রবাহিত, সহজ সৌন্দর্য্যে বিকশিত সবুজ আনন্দে প্রস্ফুটিত, সেই প্রাণরসধারা তাহারও সত্তায় রূপ ধরিতে চায়। বৎসরে বৎসরে এই যে মৃত্তিকা তৃণে পুষ্পে শস্যে সৌন্দর্য্যময়ী, জীবধাত্রী, জীবপালিনী, কল্যাণী, তেমনি সহজ ছন্দে জীবনকে প্রেমে আশায় বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে।

বাণেশ্বরের আট বছরের মাসতুতো বোন কমলা মাছের টোপ ফেলি করিতে করিতে বলিল,—বা অরুণদা, খুব মাছ ধরছেন ত, আপনার ঘটা ডুবল খেয়াল আছে, কেন এমন মিছিমিছি মাছ ধরা বাপু।

অদূরে বাণেশ্বরও ছিপ হাতে বসিয়া। সে বলিয়া উঠিল,—তাই কোন মাছ এ দিকে আসছে না।

পুষ্করিণী কানায় কানায় ভরা, স্থির জল মধ্যাহ্নালোক দীপ্ত, দর্পণের মত অরুণ ও বাণেশ্বর বহুক্ষণ মাছ ধরিতে বসিয়াছে। অরুণের মাছ ধরার কিছুই মন নাই, সে দেখিতেছে, পুকুরের জলে কি সুন্দর ছায়া পড়িয়াছে, বাঁশবন, আমবন, নারিকেল বৃক্ষ, বুড়ো বটগাছের ছায়ায় তীরের জল মরকতসবুজ, তাহার পাশে কয়েকটি পদ্ম ফুটিয়া, মধ্যাহ্নের

জলে আকাশের নীলিমা, চলন্ত মেঘরাশির শুভ্রতা ঝলমল করিতেছে; এই স্বপ্নময় রঙীণ চিত্রপট ছিপ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে চায় না। ফাত্নাঁ বার বার ডুবিতেছে, কিন্তু সে মুগ্ধ হইয়া আলোর রঙের ঝলমলানি দেখিতেছে।

বাণেশ্বর বলিল,—না, এ ঘাটে আর মাছ নেই, আমি দেখি ওদিকের ঘাটে।

অরুণ জল হইতে ছিপ তুলিয়া লইয়া বলিল,—না না, তুমি বস, মাছ ধর, আমি আর ধরব না।

ছিপ রাখিয়া অরুণ দূরে এক আমগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসিল কবিতা লিখতে।

হাতে কবিতার খাতা তুলিয়া লইল, কিন্তু কিছুই লিখিল না; দিগ্বলয়ে সোনার ধানক্ষেতের ঝিলিমিলির দিকে চাহিয়া রহিল।

চারিদিক নিঝুম। এ আলো-ভরা গভীর নৈঃশব্দে অরুণ শুনিতে পায়, অশরীরী কাহারা জলে স্থলে সোনার নূপুর বাজাইয়া কবিতার ছন্দে অবিশ্রাম চলিয়াছে। কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যমায়াপট নয়, মানব অন্তরের কত স্বপ্ন, আশা, বেদনা, আনন্দানুভূতি, ছন্দোবদ্ধ বাণী চায়; কত কথা অরুণের চারিদিকে ভিড় করিয়া আসে, লিখিতে কিন্তু ইচ্ছা করে না, ভাবময়ী মূর্ত্তি গড়িবার উৎসাহ নাই, এ আলোর দিকে চাহিয়া কল্পনা করিতে স্বপ্নজাল বুনিতে ভাল লাগে। মহান সুরছন্দিত এই ভাব-জগতে অরুণ নিমগ্ন হইয়া যায়। এতদিন সে ভাব হইতে বস্তুর জগতে আসিতে গিয়া বার বার আঘাত পাইয়াছে, এখন সে বস্তু হইতে ভাব-জগতে চলিল, সুকঠিন বস্তুপুঞ্জ ছন্দে সুরে ভাবময়ী সূক্ষ্মজাল হইয়া কাঁপে, বুঝি একটু আঘাতে ছিঁড়িয়া যাইবে। ঊর্ণনাভ যেমন আপনার রসে আপনার চারিদিকে জাল রচনা করে, তেমনি সে সুকঠোর বাস্তব জগৎ

হইতে সে বস্তকীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া আপন অন্তরের রঙে রাঙাইয়া গানের সুরে বাঁধিয়া আপনার চারিদিকে আর এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবে।

লিখিতে আলস্যবোধ হয়। কত ভাব কত কথা মনের আকাশে শরতের মেঘের মত ভাসিয়া চলে।

কি সুন্দরী এই পৃথিবী, এ অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী, প্রতিদিন ইহার নব নব রূপ, বৎসরে বৎসরে ইহার সৌন্দর্য্য প্রিয়তর মধুরতর হইয়া আসে। প্রতি বসন্ত গত বসন্ত অপেক্ষা নিবিড় আনন্দে মত্ত করিয়া তোলে। ইহার নবনবসৌন্দর্য্যপ্রকাশিনী চির অম্লানরূপে ভালবাসা গভীরতর হয়।

এ সৌন্দর্য্যময়ী কল্যাণী। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ফলে ফুলে সোনার ফসলে আপনাকে অবিশ্রাম দান করিয়া চলিয়াছে, অফুরন্ত ইহার ভাণ্ডার। মহেঞ্জোদারোর যুগে এই বঙ্গভূমিতে কাহারা ছিল? তখনও এমনি শরতে সোনার ধানে চারিদিক ভরিয়া যাইত! মহাভারতের যুগে এ দেশে কাহারা বাস করিত, শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ্জুনকে গীতা শোনাইয়াছিলেন? কত জাতি, কত ধর্ম্ম, কত রাজ্যের উত্থান পতন। মাটির গ্রাম্যপথে অরুণ মানবেতিহাসে নব নব বিজয়ী সৈনিকদের অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিতে পায়। তাহারা গ্রাম পোড়াইয়াছে, রক্তের নদী বহাইয়াছে, নব সভ্যতার আগুন জ্বালাইয়াছে; তাহার পার্শ্বে ধরণীর অম্লান হাস্যের মত স্বর্ণশীর্ষ শস্যক্ষেত্র বৎসরে বৎসরে জাগিয়া উঠিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে আবার উমার কথা মনে পড়িয়া যায়; যেন স্বপ্নে দেখা মানসীর সুমধুর স্মৃতি। এ স্মৃতি বুঝি চিরসঙ্গিনী। মধ্যদিনের বিরহ বেদনার মায়ায় করুণ হইয়া ওঠে। অরুণ আপনি মনে বলে,

উষা, তুমিও কি ভাবো, শরতের আলো-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে রাতের তারাজ্বলা অন্ধকারের স্তব্ধতায়, তুমিও কি ভাবো আমার মত? তুমি যদি তা ভাবতে তা' হলে আকাশের এই অসীমতায়, ধরণীর পুষ্পিত শোভায়, সোনার দিগবলয়ে সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তে বিচ্ছুরিত রশ্মিছটায় আমাদের সকল ভাবনা বেদনা হয়ত মিলিয়ে যেত

গভীর রাত। জানলা দিয়া দেখা যায় শিবমন্দিরের পাশে নারিকেল বৃক্ষগুলির মাথায় সপ্তর্ষির জাগরণ। মাটির দেওয়ালে জ্যোৎস্নার আলো ঝক্‌মক্‌ করে।

অরুণ ধীরে বিছানা হইতে উঠিল, মাটির অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল; সকলে নিদ্রিত, চতুর্দ্দিকে গভীর নীরবতা। তুলসী মঞ্চের পাশ দিয়া গোয়ালঘর ছাড়াইয়া ধানের গোলাগুলির মধ্যে আসিল। চারিদিকে স্বপ্নময় আবছায়া, পাণ্ডুর জ্যোৎস্না।

গোলা-ঘরের ধার দিয়া পুকুরে যাবার পথ পার হইয়া শিবমন্দিরের পাশ দিয়া গ্রামের আঁকা-বাঁকা রাস্তায় আসিয়া পড়িল। শান্ত, সুষুপ্ত গ্রাম। কোথাও একটি প্রদীপও জ্বলিতেছে না। সর্পিল পথে জ্যোৎস্নার আলো-ছায়া।

বটতলা ছাড়াইয়া চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্ত দিয়া ভট্টাচার্য্যপাড়া অতিক্রম করিয়া ঘোষপাড়ার মধ্য দিয়া, বুথতলা বামে রাখিয়া শিবমন্দিরের সম্মুখ দিয়া হাটের পথ ছাড়াইয়া অরুণ আবেগের সহিত চলিতে লাগিল। পাড়ার পর পাড়া পার হইয়া সে গ্রামের শেষে খোলা পথে দিগন্ত বিস্তৃত আকাশের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। জনহীন পথ। কোথাও একটা